অদৃশ্য সাম্রাজ্য

বিশ্বশাসনের নীলনকশা

প্রথম খণ্ড

শামীম হোসাইন

অদৃশ্য সাম্রাজ্য

বিশ্বশাসনের নীলনকশা

প্রথম খণ্ড

শামীম হোসাইন

মাকতাবাতুন নূর

আয়েশা মরিয়ম
পার্টনার, লিঙ্গুইস্টিক প্লট অপ্টিমাইজার,
এরোনটিক্যাল মেজর
ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি

নাবিল মূসা
এডিটর, লিঙ্গুইস্টিক প্লট অপ্টিমাইজার,
এরোনটিক্যাল মেজর
ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি

ইসরাত জাহান পপি
পার্টনার, ন্যারেটিভ অ্যানালিস্ট,
প্লট অপ্টিমাইজার
ইস্তাম্বুল আইদীন ইউনিভার্সিটি

সাইয়েদ বায়েজিদ সারোয়ার
পার্টনার, ন্যারেটিভ অ্যানালিস্ট,
মার্কেটিং ম্যানেজার
ঢাকা ইউনিভার্সিটি (এলএল.বি)

মেহেরুন্নেছা টুম্পা
পার্টনার, ন্যারেটিভ অ্যানালিস্ট,
প্লট অপ্টিমাইজার
ঢাকা ইউনিভার্সিটি

সাইয়েদ মুরতাজা বাকের
পার্টনার, ন্যারেটিভ অ্যানালিস্ট,
মার্কেটিং ম্যানেজার
জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটি

শারমিন সায়েমা হৃদী
ডকুমেন্টস্ সিকিউরিটি ম্যানেজার,
ডিজিটাল ফোরট্রেসার
ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি

তানভীর আহমেদ রাসেল
সাইলেন্ট পার্টনার
গ্রাউন্ড অপারেটর, বে সিস্টেম

টেরেজা প্রোখাজকোভা
সাইলেন্ট কন্ট্রিবিউটর
ওস্ট্রাভা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি
চেক রিপাবলিক

Telegram: @owlsorg

https://t.me/+nK0FgJD8ukxhZTI1

সতর্কীকরণ

প্রদত্ত সকল নথি শুধুমাত্র সকলের জন্য বিনামূল্যে ও সহজলভ্য ভাবে পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি। অনুমোদন হীন পুনর্বিতরণ, পুনঃআপলোড, বাণিজ্যিক ব্যবহার বা মুদ্রণ সম্পূর্ণরূপে এবং কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। অতএব পাঠকদের প্রতি বিনীত নিবেদন আমাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতি সম্মাননার খাতিরে বর্ণিত কাজ-গুলো এখান থেকে পিডিএফ সংগ্রহ করা-কালীন বাস্তবতায় রূপ দেওয়ার মনোবাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন।

আমাদের কোন কার্যক্রম লেখকের আর্থিক ক্ষতির কারণ হোক তা অবশ্যই কাম্য নয়। তাছাড়াও বইগুলোর মধ্যে প্রমোশনাল ওয়াটারমার্ক এবং পিডিএফে'র জায়গায় জায়গায় ইচ্ছা করলেই আমরা নিজেদের চ্যানেলের নাম ও ওয়েবলিংক উদ্ভটভাবে ব্যবহার করতে পারতাম, তবে তা থেকে বিরত থাকার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো বইগুলোর সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের সম্মান ও পাঠকের রুচির স্বতন্ত্র খেয়ালকে প্রাধান্য দেয়া। অতএব, আমাদের এই সরলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গ্রাহক যেন বইগুলোয় ব্যবহৃত কপিরাইট ক্লেইম মুছে পুনঃব্যবহারের চেষ্টা না করে থাকেন তার বিনীত অনুরোধ রইলো। আবারো ধন্যবাদ।

Query: nabillmusa13@daum.net

অদৃশ্য সাম্রাজ্য [১ম খণ্ড]

শামীম হোসাইন

....

প্রকাশক ———————

মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন

প্রকাশনায় ———————

মাকতাবাতুন নূর

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৬২৯-৬৭৩৭১৮, ০১৯৭১-৯৬০০৭১

জুমাদাল উলা ১৪৪৭ হিজরী, নভেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী

ISBN : 978-984-99725-7-0

অনলাইন পরিবেশক ———————

www.rokomari.com
facebook.com/nurbookshop
www.seanpublication.com
www.niyamahshop.com
www.wafilife.com
facebook/naafiun.com
www.raiyaanshop.com
www.khidmahshop.com

মূল্য	**স্বত্ব**
৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

Odrisso Samrajjo, By Shamim Hossain , Published by Maktabatun Nur.

Price: Tk. 750.00 US$ 15.00

উৎসর্গ

শিশু অবস্থায় আমার দুটি হাত ধরে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে যিনি হাঁটতে শিখিয়েছেন, বারংবার অহেতুক প্রশ্ন করে যেতাম, কখনও বিরক্ত না হয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন হাসিমুখে। খেলাধুলার প্রতি কখনোই তেমন আগ্রহ ছিল না। তারপরও তিনি প্রচলিত সকল খেলার উপকরণ খরিদ করে এনে দিতেন, খেলতে বলতেন। কারও দারস্থ যেন না হতে হয়– এজন্য যা দরকার তা চাওয়ার আগেই প্রদান করতেন। কষ্ট নামক শব্দ যিনি কখনও স্পর্শ করতে দেননি। জীবনের অসংখ্য বসন্ত পেরিয়ে এসেছি– আজও চায়ের খরচটা পর্যন্ত যিনি দিয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে আমার উচ্চারিত প্রথম শব্দ– **'আব্বু'**, যিনি আমার প্রথম শিক্ষক, প্রথম অভিভাবক, প্রথম আশ্রয়, প্রথম সুপারহিরো।

এই **গ্রন্থখানা উৎসর্গ** করছি সেই প্রিয় মানুষকে–

আমার **পিতাশ্রীকে।**

'রাব্বে কারীম'-এর সমীপে, **পিতাশ্রীর** জন্য দোয়া দরখাস্ত।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	১৯
লেখকের কথা	২১
ভূমিকা	২৩
গগনতে ডাক দেয়া	২৭
অদৃশ্য সাম্রাজ্যের রক্তলিপি	৩০
রক্তিম সুদের বীজ	৩৭
পাঁচ পুত্র, পাঁচ অস্ত্র	৩৯
পাঁচ আঙুলে ইউরোপ- পঞ্চশক্তির সমবায় ৪০	
গোপন সমঝোতা ও চিঠির কারিগরি:	৪২
ঋণ যখন অস্ত্র	৪২
ঋণের সিংহাসন	৪৩
সুদ: আধুনিক দাসত্বের হাতিয়ার	৪৪
স্বরবর্ণ	৪৫
তিন রাজত্ব, এক ছায়া: আমেরিকা, সৌদি, ভ্যাটিকান। এই পৃথিবীর তিন শক্তিধর অক্ষ ৪৬	
তিন রাজত্ব, এক ছায়া	**৪৭**
১. আমেরিকা: সামরিক আগ্রাসনের হাতিয়ার:৪৭	
২. ভ্যাটিকান: ধর্ম ও রহস্যের রাজনীতি	৪৭
৩. সৌদি আরব: তেল, ইসলাম ও মানসিক উপনিবেশ ৪৮	
৪. এক পরিচালকের ছায়া: আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এলিট ৪৮	
মুখোশের অন্তরালে এক মুখ	৪৯
সৌদি-ভ্যাটিকান সম্পর্ক: গোপনীয়তা ও কূটনৈতিক বোঝাপড়া ৫৪	
ঘটনার ধারাবিবরণ	৫৪

বিষয় | **পৃষ্ঠা**

আমেরিকা: মোড়লের ভূমিকায় একাধিক মাস্ক ৫৬
ব্যঞ্জনবর্ণ ৫৬

'টাইটানিক' আসলেই টাইটানিক ছিল না কি 'অলিম্পিক' ছিল? ৫৯
শুরুটা ছিল গর্বে গরিমায়, শেষটা শুধুই কান্না আর কুয়াশা ৫৯
অদম্য বিশ্বাস আর অপূর্ব নির্মাণ ৫৯
যাত্রা শুরু: উৎসবমুখর শুরু, অনিশ্চিত শেষ ৬০
১৪ই এপ্রিল: মৃত্যুর দূতের আগমন ৬১
সংঘর্ষ: শান্তির সমুদ্রে নেমে এলো মৃত্যু ৬১
অভিশাপ? দুর্ঘটনা? না কি পরিকল্পিত ধোঁকা? ৬২
ফেডারেল রিজার্ভ' প্রতিষ্ঠার সাথে টাইটানিক ডুবির সম্পর্ক? ৬৩
১ম স্তর: টাইটানিক (বা অলিম্পিক) ধ্বংসের ছায়া পরিকল্পনা ৬৩
২য় স্তর: ফেডারেল রিজার্ভ ও জায়োনিস্ট (Zionist) নীলনকশা ৬৪
৩য় স্তর: গভীর ষড়যন্ত্র: পর্দার আড়ালে যাদের নাম খুব কম আলোচিত হয় ৬৪
'টাইটানিক পরিকল্পনা'-এর মূল কুশীলব ৬৪
Jacob Schiff-এর সোভিয়েত বিপ্লবে ভূমিকা: ৬৫
টাইটানিক: ডোবা এক জাহাজ, না কি দাফন এক বিরোধী শক্তির? ৬৫
- প্রথম দৃশ্য: সমুদ্রের নীল শবদেহ ৬৫

চেহারার আড়ালে সত্তার লুকোচুরি ৬৫
দাসের স্বপ্ন ও শাসকের ব্যাংক:
(The Federal Reserve & The Hidden Masters) ৬৭
Kuhn, Loeb & Co. এবং Jacob Schiff ৬৮
Paul Warburg: একজন জার্মান, যিনি আমেরিকার অর্থনৈতিক
মস্তিষ্ক লিখে দিলেন ৬৯
Jekyll Island Meeting: ষড়যন্ত্রের গোপন জন্মভূমি: ৬৯
কে নিয়ন্ত্রণ করে Fed? ৬৯
ফেডারেলের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলো: ৭১
গঠন ও কাঠামো ৭১
মূল কার্যাবলি ও দায়িত্ব ৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্থনীতিতে প্রভাব	৭২
ফেডারেল রিজার্ভ গোপন কাঠামো	৭৩
১. ফেডারেল রিজার্ভ কী আসলেই 'সরকারি'?	৭৪
২. গোপন কাঠামো ও 'Shadow Banking' সিস্টেম:	৭৪
৩. রথচাইল্ড পরিবার ও ইতিহাসের ছায়া	৭৫
৪. Wall Street: ফেডের ছায়া সরকার?	৭৫
৫. বিতর্ক ও সমালোচনা:	৭৫
ফেডারেল রিজার্ভ ও বিশ্ব আধিপত্য	**৭৭**
১. ডলারের বিশ্বায়ন ও আধিপত্যের জন্ম	৭৭
২. আর্থিক উপনিবেশ: বিশ্বব্যবস্থায় ফেডের নিয়ন্ত্রণ	৭৭
৩. ফেডারেল রিজার্ভ ও ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য	৭৮
৪. ফেডারেল রিজার্ভ বনাম সার্বভৌমত্ব	৭৯
৫. ফেড কার পক্ষে কাজ করে?	৭৯
ইসরায়েল, রথচাইল্ড ও আধুনিক ব্যাংকিং সাম্রাজ্য	৭৯
ইসরায়েল: একটি আর্থ-রাজনৈতিক প্রকল্প	৮০
অদৃশ্য বন্ধন	৮০
ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও Rothschild ছায়া:	৮১
ব্যাকরণ: কেন ফিলিস্তিনই?	৮১
মিথ্যা ঘোষণায় জমি-ক্রয়	৮৩
লাল পারমিট	৮৩
হার্জল এবং তার আকর্ষণীয় অফার	৮৪
সন্ধিবিচ্ছেদ	**৯১**
ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের পতন ও পুনর্জন্ম- এক অর্থনৈতিক বিপ্লব	৯৪
চতুর্থ ব্যারন রথচাইল্ড: জ্যাকব- যার ছায়া আজও গাঢ়:	৯৪
জায়োনবাদ ও ফিলিস্তিন সংকট- 'দানব ও দেবতার দ্বন্দ্ব'?	৯৫
বর্ণমালা: অদৃশ্য ভাষার দৃশ্য রাজনীতি!	৯৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

কারক ১০০
নিয়ন্ত্রণের কারক, পরিচয়ের বিভক্তি ১০০
ধ্বনি, বর্ণ ও বাগ্‌যন্ত্র- শব্দের সুরে শয়তানের সূচনা ১০১
অধিকরণ ১১৩
কে কার পুতুল? ১১৪
যৌগিক বাচ্য ১১৬
বিধেয় পদ ১১৭
এ কেমন আধুনিক দাসত্ব? ১১৮
সংখ্যাবাচক পদ ১২০
রথসচাইল্ড ব্যাংকিং-ব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান ১২৮
৪র্থ ব্যারন রথসচাইল্ড ১৩০
সংখ্যার ছোঁয়া– ৬৬৬] ১৩১
৬৬৬ সংখ্যার প্রতীকী ভাঙন ১৩৪
দাজ্জালের “একদিন = একবছর": প্যাক্স ব্রিটানিকা ১৩৪
দাজ্জালের "একদিন = একমাস": প্যাক্স আমেরিকানা ১৩৫
দাজ্জালের "একদিন = এক সপ্তাহ": প্যাক্স জুদাইকা ১৩৬

১৩ পরিবারের অস্তিত্ব এবং তাদের গোপন প্রভাব-প্রতিপত্তি ১৩৯
অলিম্পিয়াস- আলেক্সান্ডারের মায়ের প্রভাব ১৫১
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও চার্লস-মরিস দে তাল্লেরান্ড: ১৫১
ইয়েলু চুকাই- চেঙ্গিস খানের প্রাজ্ঞ উপদেষ্টা ১৫১
এডিথ উইলসন- আমেরিকার ‘প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট’ বিতর্ক ১৫২
নারী-নেতৃত্বাধীন সমাজব্যবস্থা ১৫২
রথচাইল্ড পরিবার, সিসিল রোহডস ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৫২
মোহাম্মদ বিন সালমানের ‘ভিশন ২০৩০’ এবং তথাকথিত সংস্কার
ডিপ স্টেট কী? ১৫৩

আধুনিক ডিপ স্টেটের শাসন: বিশ্বের দেশগুলো ১৫৮
ডিপ স্টেটের শক্তি ও প্রভাব ১৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুপ্ত সরকারের অন্ধকার অধ্যায়- ষড়যন্ত্রের পর্দার আড়ালে	১৬০
ডিপ স্টেট: একটি অদৃশ্য শক্তির উত্থান	১৬৪
ইয়াজুজ-মাজুজ	**১৬৮**
ইতিহাস থেকে আজকের প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যতের হুমকি	১৬৮
কোরআনের বর্ণনায় যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ	১৬৮
ইয়াজুজ-মাজুজ- বর্তমান কালের আতঙ্ক	১৬৮
সূরা কাহাফ ও ফিতনা— চার ঘটনার চারটি বিপ্লবী শিক্ষা	১৬৯
ঘুমের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং Reticular Activating System	১৭৪
১. RAS কীভাবে কাজ করে?	১৭৪
২. ঘুম ভাঙার জন্য শব্দ ও আলোর গুরুত্ব	১৭৫
গুহাবাসীদের ঘটনাটি আমরা দুই দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি	১৭৫
১. গুহার অন্ধকার ও আলো নিয়ন্ত্রণ	১৭৫
২. কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেওয়া	১৭৫
দ্বিতীয় ঘটনা—ধনীর আত্মঘাতী অহংকার ও গরিবের ঈমানের সৌন্দর্য	১৭৮
তৃতীয় ঘটনা—বাহ্যিক জ্ঞানের ফাঁদে ফেলে অন্তর্জ্ঞান ভুলে যাওয়ার ট্র্যাজেডি	১৮০
দুই সমুদ্রের মাঝখানে– চেতনাগত না বাস্তব জ্ঞানসন্ধান	১৮৫
তিনটি ঘটনার বিশ্লেষণ: বাহ্যিক অন্যায়, অভ্যন্তরীণ হিকমাহ	১৮৭
সূরা কাহাফের চতুর্থ ঘটনা	**১৯০**
"যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ"	**১৯০**
ফিতনার ভবিষ্যৎবাণী- যুদ্ধ, রক্ত ও আগুন	১৯০
ইয়াজুজ ও মাজুজ- কোরআন, হাদীস ও বাস্তবতা	১৯২
যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ– যুগের দুই শিংয়ের প্রতীক	১৯২
ইতিহাস ও বাস্তবের মেলবন্ধন	১৯২
কোরআনের বর্ণনায় ইয়াজুজ-মাজুজ	১৯৩
বাইবেলের ইয়াজুজ-মাজুজ দাবী ও কোরআনের সমালোচনা	১৯৩
ইয়াজুজ ও মাজুজ- পরিচিতি ও অতীত অবস্থান:	১৯৪
যুলকারনাইন এবং যুগের বর্ণনা	১৯৪
রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সত্যতা যাচাইয়ের পটভূমি	১৯৪

বিষয় **পৃষ্ঠা**

যুলকারনাইনের ভ্রমণ ও মানবতার প্রতি মনোভাব ১৯৫
যুগের পরিবর্তন ও আধুনিক যুগ ১৯৫
অন্তর্দৃষ্টি ১৯৫
ঈমানভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা ও তার বাস্তবতা ১৯৬
আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ১৯৬
ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসীদের প্রতি সহানুভূতি ১৯৭
যুলকারনাইনের ক্ষমতার ব্যবহার- নৈতিকতা বনাম শাসন ১৯৭
ঈমানভিত্তিক ক্ষমতার ব্যবহার ও মানবাধিকার ১৯৮
আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার বিপরীত ১৯৮

ইয়াজুজ ও মাজুজ- পরিচিতি ও ক্ষমতার প্রকৃতি ১৯৯
ইয়াজুজ মাজুজের ক্ষমতা ও প্রভাব ১৯৯
ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম পবিত্রভূমির মোহ: এক রহস্যপুঞ্জি ইতিহাস ২০২
যুলকারনাইনের দুই যুগ এবং আধুনিক দুনিয়ার ফিতনার ব্যাকরণ ২০৪
যুলকারনাইনের ক্ষমতার দ্বিতীয় প্রয়োগ ২০৬
আধুনিক বিশ্বের আয়নায় এই দৃষ্টান্ত ২০৭
ক্ষমতার ভিত্তি: ঈমান, ন্যায়নীতি ও যুগের বিপর্যয় ২০৭

আসন্ন তারকা-যুদ্ধ (STAR-WAR) ও পরমাণু বিনাশের পূর্বাভাস: ২১১
কিছু গবেষণা থেকে পাওয়া: ২১৩
যুলকারনাইনের বাঁধ অস্তিত্ব ২১৪
ইসরায়িলীয় প্রসারিত গ্রন্থ ২১৪
ইয়াজুজ ও মাজুজ– আধুনিক বিশ্বের প্রতিচ্ছবি ২১৫
শায়খ ইমরান নযর হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গি ২১৫
প্রথাগত আলেমদের আপত্তি ও সমালোচনা: ২১৭
কোরআন আল্লাহর বাণী এবং এর বিধানগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ২১৯
কোরআনের পুনরাবৃত্তি- অলংকার, শিক্ষা ও ঈমানী অভিঘাত ২১৯
কেন কোরআনে পুনরাবৃত্তি? উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ২২০
আরবি অলংকার শাস্ত্রে পুনরাবৃত্তির অবস্থান ২২১
পাঠের প্রতিফলন ২২১

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আদম আ.-এর কাহিনির পুনরাবৃত্তি—কোরআনের অলংকার ও অন্তর্নিহিত শিক্ষা ২২২
পুনরাবৃত্তির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও কার্যকারণ ২২৪
১. প্রসঙ্গ অনুযায়ী নতুন বার্তা: ২২৪
২. পাঠকের চেতনা নির্মাণ ও গভীর উপলব্ধি ২২৪
৩. সাহিত্যিক অলংকার হিসেবে পুনরাবৃত্তি ২২৪
কোরআন: ইতিহাস নয়, হেদায়াতের কিতাব ২২৫
শব্দ বা আয়াতের পুনরাবৃত্তি: একটি অলংকার ২২৫
সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শব্দসংখ্যা: ২২৭
কিছু পরিসংখ্যানগত অন্তর্দৃষ্টি: ২২৭
ভাষিক ব্যাখ্যা ২২৮
গবেষণা ও তথ্যের ভিন্নতা ২২৮
একই ঘটনা, ভিন্ন আলোকে উপস্থাপন: ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইন ২২৯
১. সূরা কাহফ [১৮:৮৩–৯৮]: ঐতিহাসিক বর্ণনা ও প্রতিরোধ ২২৯
২. সূরা আম্বিয়া [২১:৯৬-৯৭]: চূড়ান্ত মুক্তি ও ফিতনার সময়কাল ২৩০
তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র ২৩০
আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা: কালোত্তীর্ণ কিন্তু প্রেক্ষাপটভিত্তিক ২৩১
পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লামা ইকবাল ও শায়খ ইমরান নযর হোসেনের তত্ত্ব জানা যাক ২৩২
গ্যালিলি সাগরের শুকিয়ে যাওয়া: ২৩৫
১. সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তথ্য: ২৩৫
২. কোরআনিক প্রেক্ষাপট: ২৩৫
৩. ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (২০২৫): ২৩৫
৪. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ২৩৫
৫. আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি ২৩৬
শায়খ ইমরান নযর হোসেনের বিশ্লেষণ ২৩৬
কোরআন ও হাদীসে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইন ২৩৮

ইয়াজুজ ও মাজুজ: মিথ, বাস্তবতা ও ফেতনার প্রতিরোধ ২৪০
১. দৈত্যাকার চেহারা, কান দিয়ে ঘুমানো– মিথ না সত্য? ২৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
২. ইয়াজুজ-মাজুজ ও ঐতিহাসিক জাতির সম্ভাব্য মেলবন্ধন	২৪১
৩. ধ্বংস কীভাবে হবে? ঈসা (আ.)-এর ভূমিকা	২৪১
ইয়াজুজ-মাজুজ: কোরআনের ভাষ্য, ভবিষ্যদ্বাণী ও আধুনিক তত্ত্ব	২৪২
নাম ও অর্থমূল্য: তরঙ্গের মতো ধেয়ে আসা জাতি	২৪২
উৎপত্তি ও পরিচয়: আদম সন্তানেরই একটি ধ্বংসাত্মক শাখা	২৪৩
কোরআনের ভাষ্য: যুলকারনাইনের প্রাচীর ও তাদের আটকে পড়া	২৪৩
হাদীসের বর্ণনা: ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞ	২৪৩
সূরা আম্বিয়া: তরঙ্গের মতো আগমন	২৪৪
ইয়াজুজ-মাজুজ কী আজও বন্দী?	২৪৫
ইসলামী বিশ্বদর্শনে তাদের ভূমিকা: দাজ্জাল পরবর্তী ধ্বংসযজ্ঞ:	২৪৫
মানবজাতির অংশ ইয়াজুজ-মাজুজ	২৪৫
তারা এখন কোথায়?	২৪৬
ইয়াজুজ ও মাজুজের গতি-প্রকৃতি	২৪৭
ইয়াজুজ মাজুজের শাব্দিক ও জেনেটিক পরিচয়: আদি-পিতা ইয়াফেথ	২৪৮
ভৌগোলিক অবস্থান ও বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণী	২৪৯
ইয়াজুজ ও মাজুজ: বাইবেল ও হাদীসের আলোকে তাদের অভিযাত্রা ও অবস্থান	২৫০
বাইবেলীয় প্রেক্ষাপট: উত্তরের আগ্রাসন ও বহু জাতির সহাবস্থান:	২৫০
শনাক্তকরণ বিভ্রান্তি	২৫১
যুলকারনাইনের যাত্রা ও ভূগোল: রহস্যময় কালো সমুদ্রের সন্ধান	২৫১
সূরা কাহাফের ভৌগোলিক ইঙ্গিত—যুলকারনাইনের ভ্রমণ ও প্রাচীরের অবস্থান	২৫২
পশ্চিমে ভ্রমণ— সূর্য অস্ত যায় কালো জলরাশিতে:	২৫২
পূর্বে ভ্রমণ—সূর্যোদয়ের উন্মুক্ত ভূমি	২৫৩
ভূগোলের সংকেত: দুই সমুদ্র, এক পর্বতমালা:	২৫৩
ভৌগোলিক অনুসন্ধান: কোন অঞ্চল সব শর্ত পূরণ করে?	২৫৪
ককেশাস অঞ্চল—সম্ভাব্য প্রাচীরের অবস্থান:	২৫৫
প্রাচীন ঐতিহাসিক ও মুসলিম ভূগোলবিদদের মতামত:	২৫৫
দুই সাগর, এক পর্বতমালা এবং সেই রহস্যময় প্রাচীর	২৫৮
দারিয়াল গর্জ: ককেশাসের প্রবেশদ্বার	২৫৮
প্রাচীন দুর্গ ও প্রাচীর—যুলকারনাইনের স্মৃতি	২৫৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি ও ইউরোপীয় অস্থিরতা ২৫৯
ধ্বংসাবশেষের সন্ধানে— লোহা, তামা ও প্রত্নতত্ত্ব ২৫৯
ঐতিহাসিক সাক্ষ্য: প্রাচীন গ্রন্থ ও নামের অর্থ ২৬০
ককেশাসের বিচ্ছিন্ন ভাষা: জর্জিয়ান ভাষা ২৬৩
ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি— নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় শুরু ২৬৪
ছিদ্রের পরিমাণ ও মুক্তির সংকেত ২৬৫
মুতাওয়াতির হাদীসের গুরুত্ব ২৬৫

অভিশপ্ত ইহুদী পুনরুত্থান এবং জেরুজালেমের রহস্য **২৬৬**
জেরুজালেম— নামহীন পবিত্র শহর ২৬৬
শেষযুগে জেরুজালেমের গুরুত্ব ২৬৭
ইহুদী প্রত্যাবর্তনের শর্তসমূহ ২৬৭
ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট ২৬৭
নিষ্কর্ষ—ভণ্ড রাষ্ট্র ইসরায়েল ২৬৮
কোরআনে জেরুজালেম—একটি নগরী হিসেবে রহস্যময় উল্লেখ ২৬৮
মূসা (আ.) যুগ ও সোনার বাছুরের পূজা ২৬৮
সিনাই মরুভূমিতে বনী ইসরায়েলের অবস্থান ও তাদের বিভাজন ২৬৯
জেরুজালেমের নগরীতে বসবাস ও আদর্শ আচরণ ২৬৯
ইয়াজুজ মাজুজ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর নিষেধাজ্ঞা ২৭০
ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থায় শাসন ২৭০
জেরুজালেম- এক 'অজ্ঞাত নগরী' ২৭০
বনী-ইসরায়েলের দুইবারের ফ্যাসাদ এবং শাস্তি ২৭১
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ২৭১
জায়োনবাদ ও আধুনিক জেরুজালেমের রাজনীতি ২৭২
ইসরায়েল: ইয়াজুজ-মাজুজের ব্লাডলাইন ২৭৪
খাযার ইহুদী ২৭৫
ঐতিহাসিক ও ভাষাগত প্রমাণসমূহ ২৭৫
গ্যালিলী হ্রদের সংকট ও ইয়াজুজ-মাজুজের পানির অপচয় ২৭৬
কোরআন ও পানির মহত্ত্ব ২৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
আরবদের প্রতি ইয়াজুজ-মাজুজের বৈরিতা ও তাদের ভাগ্য	২৭৯
নিক্সন শক (১৯৭১)	২৮৭
আমেরিকা-সৌদি জোট	২৮৯
পেট্রোল ও ডলার = পেট্রো-ডলার	২৮৯
রক্তচোষা মুদ্রাব্যবস্থা	২৯০
ইসলামের সুন্নাহ মুদ্রা ও বর্তমান অবস্থা	২৯০
প্রকৃত সম্পদ ও মুদ্রার সম্পর্ক	২৯০
মুদ্রা হিসেবে ডলারের অসুবিধা	২৯১
ডলারের মান হ্রাস ও তার প্রভাব	২৯১
মুদ্রাস্ফীতি—আন্তর্জাতিক চুরি	২৯১
যুদ্ধ আর অর্থনীতি—কাগুজে মুদ্রার ভূমিকা	২৯২
আধুনিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক শোষণ	২৯২
ইয়াজুজ-মাজুজের গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা ও পরিচিতি	২৯২
ইতিহাসে ইয়াজুজ-মাজুজের পরিবর্তিত ধারণা	২৯৩
ইয়াজুজ-মাজুজের মূল লক্ষ্যসমূহ	২৯৪
মাসীয়াহ্ আগমনের প্রেক্ষাপট	২৯৫
মসীহ্ ও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী: বাইবেল ও কোরআনের দৃষ্টিকোণ	২৯৫
ঈসা (আ.) মসীহের আগমন ও ভূমিকা	২৯৬
ক্রুশবিদ্ধকরণ ও তার প্রকৃত সত্য	২৯৭
ঈসা (আ.) ফেরত আসা ও শেষদিনে সাক্ষ্য দান	২৯৭
কেন ঈসা (আ.)-কে মসীহ্ হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি?	২৯৭
মসীহের ক্রুশবিদ্ধকরণ ও বনী ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া:	২৯৭
কেয়ামতের আলামত ও মসীহের আগমন	২৯৯
ঈসা (আ:)-এর প্রত্যাবর্তন—কেয়ামতের সেরা আলামত:	৩০০
দাজ্জাল ও ঈসা (আ.) আগমনের পূর্বশর্তসমূহ	৩০০
ভণ্ড মসীহ্ দাজ্জালের চিত্রণ	৩০০
ইহুদীদের মেসীয়ানিক স্বপ্ন ও বাস্তবতা	৩০১
বর্তমান ইসরায়েল: ইয়াজুজ-মাজুজের বাহন?	৩০১

বিষয় পৃষ্ঠা

ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন: ৩০১
মিস্টেরিয়াস নীলচক্ষু ৩০৪
নীলচক্ষুর রহস্য ও ঐতিহাসিক উৎস ৩০৪
নীলচক্ষুর গুণাবলী ও ফিতনা ৩০৬
প্রাচীন প্যাগানদের বিশ্বাস ও আধুনিক হলিউড ৩০৬
হলিউড: প্যাগান 'পবিত্র বন' ও তার প্রভাব ৩০৬
এই নামটির উৎপত্তি নিয়ে আরও দুটি প্রধান তত্ত্ব আছে: ৩০৭
ফেরাউন ও মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা ৩১০
নীলচক্ষুদের নেতৃত্বে বিশ্বে জুলুম ও ষড়যন্ত্র ৩১০
ইয়াজুজ-মাজুজের রক্তবাহক খাযার ইহুদীর বাস্তবতা ৩১০
ইয়াজুজ-মাজুজের আধুনিক বাহক ও বিশ্ব শাসন ৩১১
সমাজে পলিথিয়িজম থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও নৈতিক অবক্ষয় ৩১১
অর্ধাঙ্গিনী না কি বউ? ৩১৩
পৃথিবীর গগণচুম্বি নগরী ও বৈশ্বিক আধিপত্য ৩১৬
ইউরোপীয় ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মিথ্যা মিত্রতা ও বৈশ্বিক নিপীড়ন ৩১৬
অত্যাচার, দুর্নীতি ও শোষণের গ্লোবাল মেশিন ৩১৬

আধুনিক বিশ্বে নিপীড়নের মুখচ্ছবি: ক্রুসেডের উত্তরাধিকার এবং অর্থনৈতিক গোলামি **৩১৭**
ক্রুসেডের ছদ্মরূপ- সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ ৩১৮
ইউরোপীয় খাযার ইহুদীদের ভূমিকা ৩১৮
ইসরায়েল রাষ্ট্র—এক নববিস্তারের প্রকল্প ৩১৯

ইয়াজুজ-মাজুজ, দাজ্জাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI): শেষযুগের প্রযুক্তিভিত্তিক দাসত্ব ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার **৩২০**
১. ইয়াজুজ-মাজুজ ও প্রযুক্তি বিস্ফোরণ ৩২০
৩. নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: গ্লোবাল কন্ট্রোলের স্বপ্ন ৩২১
৪. দাজ্জালীয় নিয়ন্ত্রণ ও চিপ প্রযুক্তি: সহীহ হাদীসের পরিপূরক ভবিষ্যদ্বাণী? ৩২১
তামিম আদ-দারি (রা.) ও দাজ্জাল: একটি হাদীসের পর্যালোচনা ৩২২

বিষয় **পৃষ্ঠা**

১. হাদীসটির প্রামাণিকতা ও একক সূত্রের প্রশ্ন ৩২৫
২. অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের সঙ্গে বিরোধ ৩২৫
৩. বর্ণনার উৎস্য ও পটভূমি ৩২৭
৪. আলিমদের মতামত—অতিরঞ্জন, রূপক না কি বাস্তবতা? ৩২৭
৫. দাজ্জাল ইহুদী বংশোদ্ভূত হবে ৩২৮
৬. তার অনুসারীরা হবে ইহুদী ও নারী-গরিষ্ঠ: ৩২৮
৭. যুক্তিগত প্রশ্ন ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ৩২৯
সতর্কতার সাথে গ্রহণযোগ্যতা ও অপব্যাখ্যা থেকে দূরত্ব ৩২৯

মেটাভার্স, হিউম্যান ডিজাইনিং ও আত্মার বিলুপ্তির সংকট **৩৩১**
১. আত্মা (রূহ্) কী? কোরআনিক ব্যাখ্যা ৩৩১
২. হিউম্যান ডিজাইনিং: মানুষকে নতুন করে বানানোর অভিযান ৩৩১
৩. মেটাভার্স: বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক মিথ্যা জান্নাত ৩৩২
৪. আত্মার বিলুপ্তি ও মানুষ-দেহের উপর সর্বগ্রাসী দখল: ৩৩৩
৫. আত্মার বিপরীতে দাঁড়ানো প্রযুক্তিবিশ্ব-
কোরআনের আলোকে প্রতিরোধের পথ৩৩৩

কোরআন শিক্ষা দেয় **৩৩৩**
ইলুমিনাতি, কাব্বালা ও আত্মাহীন সমাজের পূর্বাভাস:
ইসরায়েলী নিয়ন্ত্রিত বিশ্বপ্রকল্প **৩৩৪**
১. কাব্বালাহ: ইহুদী জাদুবিদ্যা ও আত্মাহীন বস্তুনিষ্ঠতা ৩৩৪
২. ইলুমিনাতি ও আত্মা নির্মূলের বৈশ্বিক কৌশল ৩৩৪
৩. ইসরায়েল: আত্মাবিহীন বিশ্বব্যবস্থার স্থপতি ৩৩৫
৪. ভবিষ্যতের আত্মাহীন সভ্যতা: কোরআনের সতর্কবাণী ৩৩৫
৫. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: সিংহাসনে বসবে দাজ্জাল, আর হবে একমাত্র আইন ৩৩৬
আত্মার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আত্মার সংগ্রাম ৩৩৬

দাজ্জালের ত্রিমাত্রিক বিশ্বভাষা: সেমিটিক কৌশল,
প্রতীকি ভাষা ও কাববালার সাংকেতিক কোডিং: **৩৩৭**
১. কোরআনভিত্তিক সতর্কবার্তা—শব্দ নয়, উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুখ্য: ৩৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
২. কাব্বালার গাণিতিক ও প্রতীকি ভাষা— বাক্য নয়, সংখ্যা-চিহ্নই বার্তা	৩৩৭
৩. আধুনিক প্রতীকি ভাষা—AI, লোগো, কোড ও মেটাভার্স	৩৩৮
৪. সেমিটিক ভাষার ভিতর লুকানো আখ্যান- দাজ্জালের ভাষাগত কাঠামো	৩৩৯
৫. একবিংশ শতাব্দীর ভাষাতাত্ত্বিক যুদ্ধ— কে ভাষা নিয়ন্ত্রণ করবে, সে-ই নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষকে?	৩৪০
৬. কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক প্রতিরোধ- সোজাসাপ্টা ভাষা, সরল চিন্তা, সংবেদনশীল হৃদয়:	৩৪১
তিন নগররাষ্ট্র এবং ব্যাবিলনের আত্মা	৩৪৩
সিটি অফ ভ্যাটিকান	৩৪৩
সিটি অফ লন্ডন	৩৪৩
সিটি অফ কলম্বিয়া	৩৪৩
তাহলে Federal Reserve কী করে?	৩৪৫
কারা নিয়ন্ত্রণ করে ফেডারেল রিজার্ভ?	৩৪৬
সিটি অব কলম্বিয়া: একটি রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র?	৩৪৮
City of London- বিশ্ব-অর্থনীতির এক অলক্ষ্য অধিপতি	৩৪৮
একটি কর্পোরেশন, একটি আত্মা	**৩৫০**
ব্যাবিলন: একটি হারানো রাজ্য, একটি জীবন্ত আত্মা	৩৫০
সুলাইমান (আ.), জাদু, ও হারুত-মারুতের রহস্য:	৩৫১
ইহুদী অপবাদ ও ইসলামের সংশোধন	৩৫১
সুলাইমান (আ.) ও 'Seal of Solomon'	৩৫২
তবে কেন এখনও জাদুবিদ্যার বইয়ে 'সুলাইমানী জাদু' লেখা থাকে?	৩৫৪
হারুত ও মারুত: ফেরেশতা না কি শিক্ষা পরীক্ষার প্রতীক?	৩৫৪
ইবনে কাসির (রহ.)-এর তাফসির অনুসারে	৩৫৪
জোহরা, ফেরেশতা ও শুকতারা	৩৫৫
বিশেষ সতর্কতা	৩৫৬

প্রকাশকের কথা

বর্তমান বিশ্বের অস্থির ও জটিল সময়ের প্রেক্ষাপটে 'অদৃশ্য সাম্রাজ্য: বিশ্বশাসনের নীলনকশা' বইটি আমাদের কাছে শুধু একটি গ্রন্থ নয়, বলা যায় একটি প্রয়োজনীয় সত্য-উন্মোচনের আহ্বান। লেখক শামিম হোসাইন গভীর অনুসন্ধান, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও ধর্মীয় ব্যাখ্যার আলোকে তুলে ধরেছেন সেই অদৃশ্য শক্তিগুলোর কার্যপদ্ধতি, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবসভ্যতার গতিপথ নির্ধারণ করছে গোপনে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই বই পাঠকের সামনে উন্মোচন করবে বিশ্ব-রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তির অন্তরালে লুকানো সেই গুপ্ত চক্রের বাস্তব রূপরেখা। পাঠক এই গ্রন্থের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন- কীভাবে এক অদৃশ্য শক্তি মানবজাতিকে এক অভিন্ন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, আর কীভাবে সত্যের আলোয় ফিরে আসাই আজকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এই বাস্তবতা ও বিশ্লেষণই বইটিকে সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আমরা আশাবাদী, 'অদৃশ্য সাম্রাজ্য' পাঠকের চিন্তা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে— ইনশাআল্লাহ।

সর্বশেষ বলতে চাই, আমাদের উপস্থাপনাতে দুর্বলতা থাকতে পারে; কিংবা রেফারেন্সে কোনো ঘাটতি থাকতে পারে অথবা কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার সাথে অমিল থাকতে পারে, কিন্তু আগ্রহ ও আন্তরিকতা এবং চেষ্টায় বিন্দুমাত্র খাদ নেই। ভাষার মান ও বানানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নজর দেওয়া সত্ত্বেও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আমরা

আশাবাদী, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদের অজ্ঞাত যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদেরকে অবহিত করলে পাঠকের যেকোনো মূল্যবান পরামর্শ বা সংশোধনীকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো উন্নত, নির্ভুল ও সুন্দর করার চেষ্টা করব। ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই খেদমত কবুল করুন। আমীন।

মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন
প্রকাশক : মাকতাবাতুন নূর

লেখকের কথা

যখন সত্য ইতিহাসের পর্দা উন্মোচন করে কাঁপিয়ে দেয় সভ্যতার ভিত্তি!

আপনি কী জানেন–

কে আসলে পরিচালনা করছে পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি আর যুদ্ধের নাট্যমঞ্চ? রথচাইল্ড, রকফেলার-সহ এলিট পরিবাররা কীভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যের পেছনে বসে নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজা-রানি, ব্যাংক আর বিপ্লব?

ইলুমিনাতি, জেসুইট, ফ্রিম্যাসন আর ট্রাইল্যাটারেল কমিশনের অদৃশ্য জাল কতদূর ছড়িয়েছে আমাদের চেতনায়?

বাইবেলের নিসিয়া কাউন্সিল থেকে শুরু করে আজকের হলিউড পর্যন্ত– এই অন্ধকার শক্তির সুতোগুলো কে টেনে নেয়? কেন ব্যাবিলনের হারুত-মারুতের কাব্বালাহ আজও আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও বিনোদনের আড়ালে লুকিয়ে কাজ করছে?

সত্যিই কি আধুনিক বিশ্ব এক অদৃশ্য ডিপ স্টেটের হাতে বন্দী?

আর আমরা, আপনি-আমি– কি এক প্রোগ্রাম করা বাস্তবতায় বসবাস করছি? প্রযুক্তি, এআই তথা মেটাভার্স আমাদের কীভাবে গ্রাস করছে? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা? তাদের প্রাচীর কোথায়? তারা কি মুক্তি পেয়েছে?

'অদৃশ্য সাম্রাজ্য' বইটি শুধু একটি বই নয়– এটা এক প্রবেশদ্বার, যেখানে ইতিহাস মিলেছে গুপ্ত সংঘের রহস্যের সঙ্গে, বিজ্ঞান জড়িয়েছে ধর্মতত্ত্বে, আর রাজনীতি মিশেছে পরকালীন ভবিষ্যদ্বাণীতে।

এই বইয়ে উন্মোচিত হয়েছে—

১৩ রহস্যময় পরিবারের গোপন ইতিহাস!

গুপ্ত সংঘের পেছনের কথা!

জাতিসংঘ-সহ ১৯ বৈশ্বিক সংস্থার মুখোশ উন্মোচন!

ব্যাবিলনের আত্মা ও কাব্বালাহর পুনর্জাগরণ!

ডিপ স্টেট, CIA, ইসরায়েল ও বৈশ্বিক রাজনীতির অদৃশ্য ছায়া!

ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইন ও গগ-ম্যাগগের প্রাচীর রহস্য!

হলিউড, মিউজিক, ও খেলাধুলায় দাজ্জালের প্রতীকি প্রচার!

প্রযুক্তির দাসত্ব, নিউরাল কন্ট্রোল ও 'ডিজিটাল দাসত্বের যুগ'!

খিলাফাহ, মাহদী ও কেয়ামতের শেষ যুদ্ধের ভূরাজনৈতিক পটভূমি!

পোপতান্ত্রিক রাজনীতি, সৌদির দাসত্ব এবং ভ্যাটিকান প্যালেস রহস্য!

টাইটানিক ষড়যন্ত্র, অলিম্পিক জাহাজ কাণ্ড, ফেডারেল রিজার্ভ প্রতিষ্ঠার কালো ইতিহাস, বিতর্কিত গসপেল নিষিদ্ধ রহস্য, স্ক্রোল লিপি, কুমরান জাতি-সহ সবকিছুর সংমিশ্রণ তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে বাংলাদেশে এক বিরল কাজ।

প্রশ্ন হলো, আপনি কি সাহস করবেন এই অদৃশ্য সাম্রাজ্যের দরজায় প্রবেশ করতে? আপনি কি প্রস্তুত জানার জন্য— পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণ করছে কারা? আর সেই পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি কোথায় নিয়ে যাবে মানবজাতিকে?

যদি আপনার মনে প্রশ্ন জাগে–
"আমরা সত্যিই স্বাধীন তো?"
তাহলে অদৃশ্য সাম্রাজ্য আপনার জন্যই লেখা।

'অদৃশ্য সাম্রাজ্য'– যেখানে সত্য ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুলে দেয় অন্ধকারের নতুন এক দরজা।

লেখক: শামীম হোসাইন

ভূমিকা

"সবকিছু শুরু হয় এক ছোট্ট প্রশ্ন থেকে।
কিন্তু শেষ কোথায়?
জানি না, বা জানলেও বলা চলে না!
কারণ; কোনো একটা প্রশ্নই.....?"

এযাবৎকালে পৃথিবীতে ওঠা সব ছোট প্রশ্ন থেকেই সৃজন হয়েছে বৃহৎ ইতিহাস। যেমন 'ক্ষমা' খুব ছোট শব্দ, তবে এই শব্দটা সবাই সহজে উচ্চারণ করতে পারে না। তাই যুগযুগ ধরে শুধু ক্ষমা নামক শব্দটি উচ্চারণ না করার দরুন পৃথিবীর অনেক ক্ষমতাসীন মানুষের পতন হয়েছে। প্রশ্ন করতেও সাহস লাগে। যারা প্রশ্ন করতে ভালোবাসে, তারাই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। প্রশ্ন করতেও লাগে অসীম সাহস এবং অগাধ জ্ঞান।

বইটি লেখার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন 'মাকতাবাতুন নূর' প্রকাশনীর কর্ণধার মাওলানা দিলওয়ার হুসাইন ভাই। সময়টা খুব সম্ভবত ২০২৩ সাল, একদিন তিনি প্রস্তাব রাখলেন– একটা বই লেখার জন্য। হকচকিয়ে ওঠার মতোই একটা প্রস্তাব ছিল। সামসময়িক বিষয় নিয়ে লেখালিখি করি। কী বিষয় নিয়ে লিখব, তাই নির্ধারণ করতে পারছিলাম না। অবশেষে পেলাম একটা বিষয়। শুরু করলাম ২০২৩ সালের রমজান মাস থেকে। যা মৌলিক কোনো বিষয় নয়, ছড়িয়ে থাকা সব উপকরণ। বিভিন্ন বইপত্র, ব্লগ, নিবন্ধ ও জার্নাল ইত্যাদি তত্ত্ব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কিছু একটা আনার চেষ্টা করেছি। যেখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানা, সংশয় বিদ্যমান। এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ অবদান ও কৃতজ্ঞতা মুহতারাম দিলওয়ার হুসাইন ভাইয়ের সমীপে। তিনি এগিয়ে না আসলে মনে হয় না কখনোই আমি এই দুঃসাহস দেখাতে পারতাম। প্রকাশনী জগতে নতুনদের তেমন পাত্তা দেওয়া হয় না। মানে সব প্রকাশনী নতুনদের নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না। এটাই স্বাভাবিক। কারণ; বিরাট আর্থিক বিষয় থাকে, এজন্য কেউ লোকসানে যেতে চায় না। কিছু লেখক আছেন যারা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এমন পরিস্থিতিতে নিজ থেকে এগিয়ে এসেছেন আমার প্রকাশক। আবারও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। 'রাব্বে কারীম' ভাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুক (আমীন)

ধরুন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এক পুরাতন পাণ্ডুলিপির সামনে। ধুলোমাখা পাতাগুলো খুললে যে শব্দ হয়, সে শব্দে লুকানো থাকে শতাব্দীর অমীমাংসিত রহস্য! আপনি জানেন না এই লেখা কোথা থেকে এসেছে, কে লিখেছে, কারা বলেছে, কোথা থেকে সৃজন হয়েছে বা কেন আপনিই আজ এই অদৃশ্য দরজার সামনে? ইতিহাস কোনো সহজ গদ্য নয়। ইতিহাসের সাথে বিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক অনাদিকালের। ইতিহাস হলো ছিটিয়ে রাখা উপকরণ, ইতিহাস খুঁটে খুঁটে সংযোজন করতে হয়। সত্য-মিথ্যার বিতর্ক বহুদূরের পথ....

যেমন বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথে প্রেমিক, সুচের সাথে সুতো গেঁথে নকশিকাঁথা সৃজন করে বাংলার নারী। তেমনই ইতিহাস। ইতিহাসের সত্য সবসময়ই যাচাই-বাছাই করার সুযোগ থাকে না। পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে শতশত ঘটনা ঘটে। ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সেই 'ঘটনা' লুকিয়ে থাকে কোনো এক লাইব্রেরির বদ্ধ কুঠিরে অথবা কোনো গোপন বন্দীশালায় পাণ্ডুলিপির মধ্যেও লুকিয়ে থাকে নৈঃশব্দ্যের অগণিত শব্দমালা। গোপন কক্ষে বসে তাত্ত্বিকরা সাজিয়ে যায় ছক। সেই ছকে চলে– রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভুগোলনীতি থেকে ধর্মনীতি– অর্থাৎ সর্বনীতি!

ধরে নিন এই লেখার বিষয়বস্তু পুরোটাই কল্পনা... আবার ভেবে নিতে পারেন– এই কল্পনার আড়ালে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দেওয়া ঘটনাবলির ছায়া! বিশ্বাস হলো এমন এক তত্ত্ব, যার আছে অগণিত শাখা-প্রশাখা। এজন্যই সবারই একটা নিজস্ব বিশ্বাসের জায়গা আছে। আমি যা বিশ্বাস করি, তা আপনি করেন না। আপনি যা বিশ্বাস করেন, তা অন্য কেউ করে না। এভাবেই চলে বিশ্বাসের ধারা। আপনার দৃষ্টিতে যা সঠিক, অন্যের দৃষ্টিতে তা বেঠিক। দৃষ্টিভঙ্গি যেমন হবে, দেখাও তেমন হবে। তাই, কেউ একজন বলেছিল– "দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে দুনিয়া বদলে যাবে।"

যে সত্য রক্ত দিয়ে লেখা, সে সত্য চিৎকার করে না; সে শুধু তাকিয়ে থাকে– নির্বাক, কিন্তু অমোঘ। তাই একসাথে ইতিহাস, ধর্ম, প্রযুক্তি, রাজনীতি ও কল্পনার মেলবন্ধন– যেখানে অতীতের ছায়া ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়িয়েছে, আর সবাইকে ডেকে নিয়েছে সেই নৈঃশব্দ্যের অন্তঃস্থ গৃহে, যেখানে প্রতিটি ফিসফাসই একেকটি বিস্ফোরণ। নৈঃশব্দ্যের অন্তঃস্থ গৃহে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের নিষ্পাপ কান্না, যাকে কেউ শুনতে চায় না। যে সত্য বলে না, সে সত্যেই বাস করে– নৈঃশব্দ্যের অন্তঃস্থ গৃহে।

প্রতিটি ধর্মের অনুসারী মনে করে তাদের ধর্ম সত্য, অধার্মিক অবিশ্বাসী অর্থাৎ নাস্তিকরাও মনে করে তাদের বিশ্বাস সত্য ও সঠিক। মা বলে দেয়– আমি তোমার মাতা, ওটা তোমার পিতা– সেই বিশ্বাসই থেকে যায় শেষ নিঃশ্বাস অব্দি। কেউ আর

কখনও এটা নিয়ে প্রশ্ন করে না। বিশ্বাস এক বিরাট ব্যাপার। তাই বলতে পারি– বিশ্বাসের বহুবচন। বিশ্বাস একবচন নয়, তাই এই বইয়ের সবকিছু বিশ্বাস করার কোনো আবশ্যিকতা নেই।

এই বইয়ের কিছু বিষয় আপনি পড়বেন কল্প-কাহিনি ভেবে। বিজ্ঞান নিয়ে অনেক কল্প-কাহিনি অর্থাৎ সাইফাই (Sci-fi) তো পড়েছেন– এটাকেও তাই ভাববেন। বা কোনো রূপকথা, লোককথা, উপকথা অথবা যেন কোনো এক বিকেলের গল্প, হয়তো আগুনের পাশে বসে বলা এক বৃদ্ধা দাদির অতিরঞ্জিত গল্প। আপনি চাইলে এতে হাসবেন, চাইলে আজগুবি কথাবার্তা বলে উড়িয়ে দেবেন, এতে আমার আপত্তি নেই। শুধু বলব– এই গল্পের ভিতরে ঢুকবেন সাবধানে। কারণ; এখান থেকে আর ফিরে আসা হয়তো সম্ভব হবে না। প্রতিটি বাক্যে আপনি পাবেন প্রশ্ন– যার উত্তর আপনি জানেন, কিন্তু কখনো ভাবেননি। এই বইয়ের কিছু বিষয়বস্তু তাদের জন্য, যারা প্রশ্ন করতে ভয় পায় না। যারা শুধু "দেখে যাও" না বলে, জানতে চায়, "কেন এমন হলো? কারা করল? কাদের জন্য আমরা শুধু দেখেই যাচ্ছি? আমি জানব সবকিছু!"

আপনি যদি সেই মানুষটি হয়ে থাকেন, তাহলে এই বইটি আপনার জন্য। আর যদি তা না হন, তাহলে... এই বইয়ের গল্পকে রূপকথা ভেবেই পড়ে ফেলুন।

আমরা যদি ভাবি– ধর্ম শুধু বিশ্বাসের বিষয়, তাহলে জেনে রাখা জরুরি– বিশ্বাস দিয়েই সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, বিশ্বাস নিয়েই যুদ্ধ শুরু হয়, আর বিশ্বাসেই শেষ হয় সবকিছু। ইতিহাসে রক্তস্নাত যত যুদ্ধ ঘটেছে, তার পেছনে ছিল 'বিশ্বাস' নামের এক অদৃশ্য আগুন। হোক তা ধর্মের, মতবাদের, বা বর্ণের।

মূল বইয়ের অধ্যায়ে প্রবেশের আগে বিজ্ঞ পাঠকমহলের কাছে আমার নিবেদন, লেখার কিছু বিষয়াদি ও তথ্য বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ধার করে নেওয়া। যেমন: বাইবেল অধ্যায়ে ড. খোন্দকার আবু নাসর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)-এর বই থেকে কিছু তথ্য নিয়েছি, ইয়াজুজ-মাজুজ আলোচনায় বিভিন্ন ব্লগ ও শায়খ ইমরান নযর হোসেনের বই থেকে তথ্য নিয়েছি এর পাশাপাশি বিভিন্ন ব্লগ, ওয়েব, জার্নাল ইত্যাদি থেকে তথ্য নিয়েছি। কিছু বিদেশি সাইট থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। সবার অনুমতি নেওয়া হয়নি। এই পর্যায়ে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি ক্ষমাপ্রার্থী। ইতিহাসের বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য এটা ছাড়া উপায় ছিল না।

যতটা পেরেছি তথ্য ভেরিফাই করার চেষ্টা করেছি। সব তথ্য শতভাগ যাচাই-বাছাই করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই থাকতে পারে কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি, অপতথ্য

ইত্যাদি কিছু ভুল এবং অসংগতি। অনুগ্রহপূর্বক সেই অসংগতি ধরিয়ে দেবেন, সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ।

বানানরীতি বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানবিধি অনুসরণ করেছি আবার করিনি। অর্থাৎ, কিছু কিছু শব্দের ক্ষেত্রে আমি একাডেমির বিধি অমান্য করেছি। বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, হিব্রু, গ্রিক, আরামাইক ইত্যাদি আরও কিছু বিদেশি ভাষার বিশেষ কিছু শব্দের ক্ষেত্রে– **"কোনো বিদেশি শব্দে 'ঈ-কার' ও 'ঊ-কার' এবং 'ণ' ও 'ষ' ব্যবহৃত হয় না।"** – এই নিয়ম মান্য করিনি, সাথে আরও কিছু নিয়মকে অগ্রাহ্য করেছি। যেমন: দ্বীন, জ্বিন, ঈদ, নূর, দীনার, রাসূল, নবী, ইসলামী, ইহুদী, ইসরায়েলী, যীশু, ঈসা, মূসা, দাউদ, লূক ইত্যাদি আরও বিশেষ কিছু শব্দ আমি একাডেমির 'প্রমিত বানানবিধি'-র নিয়মের বাইরে লিখেছি।

বাংলা ভাষা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম প্রধান বাহক। ভাষার সৌন্দর্য, শুদ্ধতা ও ঐক্য রক্ষার জন্য বানানের একক নিয়ম প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য বাংলা একাডেমি প্রণয়ন করেছে **প্রমিত বাংলা বানান নিয়ম।** তাই সবার নিয়ম মানা জরুরি। এতে দেশব্যাপী একরূপ বানান চর্চা নিশ্চিত হয়। পাঠক সহজে শব্দ ও অর্থ বুঝতে পারে, দ্ব্যর্থতা দূর হয়। প্রাচীন ধ্বনিগত ঐতিহ্য রক্ষা পায়। বানান নিয়ে বিভ্রান্তি কমে যায়।

তবে, পণ্ডিতদের প্রণীত নিছক কিছু তত্ত্বের অহেতুক বিধি আমি মানতে নারাজ। পরিবর্তন ও সংযোজনের পেছনে যে যুক্তি পণ্ডিতগণেরা প্রদান করেন, তা আমার কাছে যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। বিশেষ করে আরবি শব্দগুলো। অ্যারাবিকের ক্ষেত্রে কিছু শব্দ অপরিবর্তিত রাখাই শ্রেয়। তৎসম শব্দের শুদ্ধ রূপ অক্ষুণ্ণ রাখা। মানে তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি গৃহীত শব্দগুলোর বানান মূল রূপে অপরিবর্তিত রাখার কথা বলেছে। আবার তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে আরেক কথা বলা হয়েছে। বিদেশি ভাষার কিছু শব্দ আছে, সেই শব্দগুলো আমি একাডেমির নিয়মের বাইরে যেয়ে লিখেছি। এতে অশুদ্ধ হলে, অশুদ্ধই সই। আমি এসব বানান এমনই লিখব। এরপরও যদি কোনো বানান অশুদ্ধ থাকে, কোনো স্থানে যদি 'ই' ও 'য়' এই বর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দের অপপ্রয়োগ হয়, যদি বাক্যে অসংগতি থাকে অথবা অগোচর টাইপিং মিসটিক হয়ে যায়– তাহলে অবগত করবেন, পরবর্তীতে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ। ভুল হবেই, দীর্ঘ লেখার ক্ষেত্রে কিছু বানান ভুল ও অশুদ্ধ হতে পারে। এই অশুদ্ধতা আপনি শুদ্ধ করার তাগিদ দেবেন। এই আপনার কাছে আমার অনুরোধ।

গগনতে ডাক দেয়া

'ক' তো 'ক' কিন্তু 'খ' কিন্তু 'খ' না! আজব মনে হচ্ছে না? আজবের কারখানায় হলো এই লেখার উপজীব্য। ফকির লালন বলেছিলেন, "যেখানে সাঁইর বারামখানা।"– হ্যাঁ, বারামখানা। এই এক আজব জায়গা। দেহভাণ্ডই হলো সেই বারামখানা। 'দেহভাণ্ড' আর এই 'ধরণী'-কে একই মনে করে লালন-দর্শন।

এই দর্শনের বিশ্বাস এই যে, দেহের ভিতর রয়েছে আঠারো মোকাম (আঠোরোটি ঘর), ছয় লতিফা, বারো বুরুজ, চার চন্দ্র, চৌদ্দ ভুবন, ষড়রিপু এবং দশ ইন্দ্রিয়। এসবই এই দর্শনের ভাবনা।

তাদের আরেকটা মতবাদ ছিল, "যা নাই দেহভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" এরই সূত্র ধরে হাজার বছর পর সুফি-বাংলার মারফতি ঘরনার দেহতাত্ত্বিক সাধকগণ বললেন,

> **"দেহঘড়ির ভিতরে চৌদ্দতালা আর দশটি নালা আছে, যার নয়টি খোলা একটি বন্ধ আর গোপন একটা তালা আছে।"**

মওলা, মালিক, মনের মানুষ, পড়শী, অচিন পাখি, সাঁইজি বা প্রভুকে চোখের সামনে দেখতে হলে প্রয়োজন, দৈহিক এবং মানসিক শুদ্ধির। আর সেই শুদ্ধতা অর্জনে চাই দেহের নানা প্রকোষ্ঠ সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা।

চৌদ্দতালা মানে চৌদ্দ ভুবন। প্রতিটি মানুষের তার পায়ের তলদেশ থেকে মাথার ব্রহ্ম তালু পর্যন্তকে চৌদ্দ ভুবন বা চৌদ্দতালা (স্ব স্ব মানবের ৮৪ আঙ্গুল) বলে। স্ব স্ব মানবের নাভীর নিচে সপ্ত ভুবন আর নাভীর উর্ধ্বে সপ্ত ভুবন মোট চৌদ্দ ভুবন বা চৌদ্দতালা।

দশটি নালা বা দরজা মানবদেহের ভিতর (২টি চক্ষুর নালা, ২টি কানের নালা, ২টি নাকের নালা, ১টি মুখের নালা, ১টি লিঙ্গ (যৌনাঙ্গ) নালা, ১টি গুচ্ছ নালা (পায়ু) ও ১টি নাভী। সর্বমোট ১০টি নালা বা দরজা।

৯টি খোলা ১টি বন্ধ- প্রতিটি মানব মাতৃগর্ভে থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর দশটি দরজা খোলা থাকে। পরবর্তীতে ধাত্রী বা চিকিৎসক ব্রহ্মা নাড়ী (নাভী) বেঁধে ও কেটে দেয়। সেজন্য নাভী দরজা (মধ্যাকর্ষন) বন্ধ থাকে। আর নয়টি দরজা খোলা থাকে।

গোপন তালা- চৌদ্দ ভুবনের মাঝখানে অষ্টদলের উপরে মানস সরোবরে একটি তালা আছে। সাধক ছাড়া সে গোপন তালার কেউ খোঁজ রাখে না। কেউ কেউ বলে সেই গোপন তালার নাম, আধাত্মিক জ্ঞান। যার মাধ্যমে মনের মানুষ, পড়শী তথা প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করা যায়। সেটা হোক ধ্যান বা প্রার্থনার মাধ্যমে। লালনও আরশিনগরে তাই খুঁজেছে। আরশিনগর কোনো দুনিয়ার স্থান নয়। দেহের মধ্যে সংযোগ করে পড়শির (প্রভুর) সন্ধানের কথা বলা হয়েছে। 'আট কুঠুরি নয় দরোজা' নিয়ে লালনের নিজের বলা পদ বা কালাম আছে। এসবের বিরাট ব্যাখ্যা, আমি এদিকে ধাবিত হবো না।

এটা তাদের বিশ্বাস, আমার নয়। আমি তাদের বিশ্বাসকে তাদের দৃষ্টিতে দেখি। বাউল, সুফি, লালন, বৈষ্ণব, সহজিয়া-সহ বিভিন্ন তাসাউফ বা সুফিইজম, আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতাবাদ। এইসব মতবাদ পাঠ করে একটা বিষয় পেয়েছি– তাদের অনুসরণ ভিন্ন হলেও, ভাবাদর্শ একই। এসব কেন বললাম? দেহের ভিতরে আজব কারখানা যেমন ওইসব দর্শন বিশ্বাস করে, আমি তেমন বিশ্বাস করি– এই পৃথিবী এক আজব কারখানা। এই পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় লুকিয়ে আছে রহস্য, লুকিয়ে আছে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অসংখ্য বিষবৃক্ষ। তবে তা আমাদের চোখে পড়ে না, বা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। যদিও সামনে আসে, তা আমরা দেখার প্রয়াস করি না। আর কেউ দেখিয়ে দিলেও, তা আমরা আমাদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক দেখে হেসে উড়িয়ে দেই– সাথে তা নিয়ে নানা বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করি। এটাই আমরা। আমরা আমাদের মতবাদ ও বিশ্বাসের বাইরে অন্য কোনোকিছুই বিশ্বাস করতে রাজি নই।

তেমনই দেখা-অদেখার অসংখ্য গল্প আছে এই ঝুলিতে। প্রথম যে গল্প ঝুলি থেকে বের হচ্ছে, তা শুরু হয়েছিল দুইশ বছরের এক দীর্ঘ ছায়াপথ দিয়ে। যেখানে এক পরিবার, 'রথচাইল্ড', যুগযুগ ধরে গোটা পৃথিবীর অর্থনীতির নাটাই ঘুরিয়ে যাচ্ছে। কাহিনি অনেক আছে, তবে প্রারম্ভ করব তাদের দিয়ে।

আমরা তাদের নাম জানি না। জানার দরকার হয়নি, কারণ তারা চায় না আমরা জানি। তারা চায় আমরা খেলে যাই তাদের ছায়ায়, নীরবে, অজান্তে। তারা পৃথিবীর বড় বড় সিদ্ধান্তের নিয়ন্তা, অথচ কখনো সামনে আসে না।

আমি যখন প্রথম এই পরিবারের কথা জানতে পারি, তখন মনে হয়েছিল, এ তো নিছক গল্প! ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সস্তা বয়ান! পুরনো কোনো অতিরঞ্জিত মিথ! কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের সময়, পশ্চিমাদের ইসলামফোবিয়া দেখে আমি হতবিহ্বল হয়েছিলাম! সভ্য, শিক্ষিত ও সাম্যের নামধারী ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে এত কুৎসিত বিদ্বেষ লুকিয়ে ছিল, তা দেখার পর ভাবলাম– এদের মধ্যে এমন ইসলামফোবিয়া কারা পুশ করল? কেউ না কেউ তো এদের চালাচ্ছে? সভ্য-শিক্ষিত দেশের সুনাগরিকদের কারা এমন আছে যে, এভাবে ফোবিয়াতে আক্রান্ত করে ফেলেছে? কেউ তো আড়াল থেকে গোটা খেলাটা দেখছে? কোনো বিশেষ গোষ্ঠী তো আছে, যাদের আক্রমণ ও বিদ্বেষের তীর সবসময়ই ইসলাম-ধর্ম ও মুসলমানদের দিকে। তাদের মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষের ইনজেকশন পুশ করে দেওয়া হয়েছে– ইসলাম মানেই নারী অধিকার হরণকারী, জঙ্গি কার্কশ্য অর্থাৎ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত, বর্বর-ব্যবস্থা কায়েম করা, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি আরও এমন অসংখ্য অপতথ্য ও প্রোপাগান্ডা নামক ভাইরাস।

অদৃশ্য সাম্রাজ্যের রক্তলিপি

রথচাইল্ডদের নিয়ে ইন্টারনেটে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। কারণ; গোপনীয়তা তাদের অস্তিত্বের মূল স্তম্ভ। তাদের নিয়ে কিছু বললে ফেসবুক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দেয়। কেন? কারণ; এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে উঠে আসে পশ্চিমা রাজনীতির অন্ধকার ষড়যন্ত্র, মধ্যপ্রাচ্যের আগুন, আর ধর্মীয় স্পর্শকাতর সব প্রশ্ন। মেটা, এক্স, ইউটিউব, গুগল– এই বিষয়গুলোকে 'নিষিদ্ধ অঞ্চল' ঘোষণা করে রেখেছে।

তবে, একটা কথা মনে রাখুন– তারা চেনা। শুধু রূপ, চরিত্র আর নাম পালটে সামনে আসে। পেছনে তারা থেকে যায়। কে তারা?

গত ২০০ বছরের ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি বড় ঘটনার দৃশ্যপটে ছিল তাদের ছায়া। আজকের পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুখোশও তাদের হাতে তৈরি।

উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন:

> The longer you can look back, the farther you can look forward."

বিশ্বের বড় বড় নেতা, ক্ষমতাধররা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও, ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকদের কাজকর্ম, বক্তব্য এবং অবস্থান থেকে স্পষ্ট হয়– রথচাইল্ড পরিবারই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবার। বিশ্বের অর্ধেক সম্পদের মালিক, যুদ্ধ ও শান্তির ছায়া-নিয়ন্ত্রক, অর্থনীতির নাটাই ঘোরানো এক অদৃশ্য হাত!

মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করুন– পুঁজিবাদী মুখোশের আড়ালে তারা কারা? তারা একে একে নিজেদের নামে নামকরণ করে ফেলেছে– ১৫৩টি পতঙ্গ, ৫৮টি পাখি, ১৮টি স্তন্যপায়ী, ১৪টি গাছ, ৩টি মাছ, ৩টি মাকড়সা, আর ২টি সরীসৃপ।

Ornithoptera Rothschildi– একটি প্রজাপতির নাম,

Camelopardalis Rothschildi– একটি জিরাফের বৈজ্ঞানিক পরিচয়।

তারা জীববিজ্ঞানে ঢুকে গেছে। যদিও ইতিহাসের পাতায় বলা হয়েছে ওয়াল্টার রথচাইল্ড, একজন বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ এবং প্রাণিবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর অবদান রেখেছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় অসংখ্য বিরল প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো নিয়ে গবেষণা করেন। তার এই অবদানের সম্মানার্থে অনেক প্রাণী এবং উদ্ভিদের নামকরণ তার নামে করা হয়েছে। সে যেভাবেই হোক, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাদের নাম দৃশ্যমান। তারা সড়কে, সাইনবোর্ডে, ইতিহাসের প্রতিটি বাক্যে– কখনো নামকরণে, কখনো ধ্বংসযজ্ঞে। ইসরায়েলের রাস্তা-ঘাট থেকে শুরু করে অ্যান্টার্কটিকার বরফঢাকা দ্বীপ Rothschild Island পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তাদের ছায়া।

তারা কী কেবলই ব্যাংকার? না কি ইতিহাসের প্রাচীনতম গোপন যুদ্ধের জেনারেল? এই পরিবারের নাম Rothschild– যার অর্থই হলো **'লাল ঢাল'** (Red Shield)। তারা নিছক পরিবার নয়, এ এক সাম্রাজ্য। একটি অদৃশ্য সাম্রাজ্য, যার সেনাবাহিনী হলো ব্যাংক, যুদ্ধ হলো বাজার, আর অস্ত্র হলো প্রযুক্তি-তথ্য।

১৯ শতকে রথচাইল্ডদের সম্পদের পরিমাণ ছিল–

> "The largest private fortune in modern history."

কেউ কেউ বলেন, আজও বিশ্বের অর্ধেক সম্পদের উপর পরোক্ষ অধিকার তাদের। তারা যুদ্ধ বাধায়। তারা শান্তি চুক্তি লিখে দেয়। তারা রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন করে– আবার ধ্বংসও করে দেয়।

হেনরি ফোর্ডের তথ্য মতে; রথচাইল্ড পরিবার সপ্তদশ শতক থেকেই ইহুদীদের উত্থানে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে।

ইসরায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, লীগ অব নেশনস, জাতিসংঘ গঠন– এসবের পেছনে তাদের অদৃশ্য প্রভাব ছিল।

তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন:

> "It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning."

[অর্থাৎ, মানুষ যদি ব্যাংকিং ও মুদ্রানীতি সত্যিই বুঝত, তবে আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই বিপ্লব ঘটত!]

১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Anti-Defamation League (ADL)। নিউইয়র্ক সদর দপ্তর এবং ৩২টি শাখার এই সংগঠন ছিল ইহুদীদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগের 'প্রতিরক্ষা বাহিনী'। কীভাবে একটি পরিবার যুগের পর যুগ বিশ্ব-মোড়ল হয়ে উঠল? এখনো কেন বিশ্বের ক্ষমতাধররা তাদের পদলেহন করে চলে?

মেয়র আমশেল রথচাইল্ড (১৭৪৪–১৮১২): তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সের 'পিতামহ'। Forbes Magazine তাকে রেখেছে: "The ২০ Most Influential Businessmen of All Time"-এ ৭ম স্থানে।

পারিবারিক পেশা ছিল 'মুদ্রা ও পণ্য বিনিময় ব্যবসা'।

১৭৫৭ সালের দিকে আমশেল এই ব্যবসার হাল ধরেন। French Revolution (১৭৮৯-১৭৯৯)-এর সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাতারাতি Banking সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছিল **'গগনতে ডাক দেয়া'** নতুন অধ্যায়। শিরোনামটা একটু ব্যাখ্যা করি। গগনতে (আকাশে) দেয়া (মেঘ) তীব্র কণ্ঠে ডাক দিয়ে আসমানকে ঘন-কালো অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে। এমন পূর্বাভাসেও তার নাম নিয়েই রোদন করে যাচ্ছে। তথা এই বিশ্বের আকাশে কালো মেঘ নামক এই অপশক্তি ডাক দিয়েছিল আজ থেকে ২০০ বছর আগে। সেই গর্জন আজও বহমান।

রথচাইল্ডরা শুধু ব্যাংকার ছিলেন না। তারা হয়ে উঠেছিলেন রাজাদের রাজা। যুদ্ধের দামামা, বিজয় আর পরাজয়ের মাঝে, এক অদৃশ্য শক্তি হয়ে সমস্ত ইউরোপের অর্থনীতি, রাজনীতি, এমনকি সিংহাসন নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল এই পরিবার।

রাজারা যুদ্ধে হারলে, ঋণের জন্য তাদের দরকার হতো রথচাইল্ডদের। আর যুদ্ধ জিতলেও, সেনাবাহিনীর বেতন, দেশ পুনর্গঠন– সবই রথচাইল্ডের টাকার ছায়ায় চলত।

কয়েক বছরের মধ্যেই, রথচাইল্ড সন্তানেরা ইউরোপের পাঁচটি শহরে– ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, লন্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা ও নেপলসে অর্থাৎ পাঁচটি প্রধান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে একটি অদৃশ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন।

এদের নিজস্ব গুপ্ত বার্তাবাহক বাহিনী ছিল। এদের ছিল ডাকঘরের চেয়ে দ্রুততর যোগাযোগব্যবস্থা। গোটা ইউরোপে ঘটে যাওয়া ঘটনা, বাজারের পরিবর্তন, যুদ্ধের

মোড় ঘুরে যাওয়া, সবকিছু তারা সাধারণের আগেই জেনে যেত। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক বাজারে চালাত নিজেদের ভয়ঙ্কর খেলা।

রথচাইল্ডরা এখন শুধু ব্যবসায়ী নয়, তারা 'ছায়া-সরকার' হয়ে উঠেছে। এই নাম উচ্চারণ করলেই পশ্চিমা রাজনীতির ষড়যন্ত্র, ইসরায়েলী আগ্রাসন এবং ধর্মীয় স্পর্শকাতর প্রশ্ন উঠে আসে।

১৯২০ সালে হেনরি ফোর্ড নিজের লেখা পুস্তিকায় বললেন,

> "They are not merely bankers.They are shapers of civilization."

হেনরি ফোর্ডের বিখ্যাত বইটির নাম- 'The International Jew: The World's Foremost Problem.' এই বইটি ১৯২০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে তার নিজস্ব সংবাদপত্র 'The Dearborn Independent'-এ প্রকাশিত নিবন্ধগুলোর সংকলন।

এই বইয়ের অন্যতম ভিত্তি ছিল সেই ভয়ংকর দলিল–

> 'The Protocols of the Elders of Zion.'

এই প্রোটোকলে বলা হয়েছিল– ইহুদীরা মিডিয়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং যুদ্ধ সব নিয়ন্ত্রণ করবে।

> "They control the press, the money, the movements of governments... and yet we dare not speak their name." -হেনরি ফোর্ড (১৯২২)

প্রচুর বিতর্ক হয়েছে, বলা হয়েছে এটা একটি জাল দলিল।

তবুও আওয়াজ উঠেছিল–

> "Even if the document is forged, the reality it describes is real."

এখন তাদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না, কিন্তু ছায়া পড়ে সবখানে আজ তারা মিডিয়ায় নেই। কিন্তু BlackRock, Vanguard, IMF, World Bank, Federal Reserve– সবখানে আছে তাদের কাঁটা বসানো সুতো।

তাদের নাম নেই, তাদের পদচিহ্ন নেই, তবে প্রতিটি সিদ্ধান্তে আছে তাদের ধ্বনি। তাদের পরিকল্পনা 'One World Order', তাদের মতাদর্শ 'Zionism', তাদের স্বপ্ন 'Jerusalem-centric World Rule'।

শেষ কথা নয়, শুরু মাত্র। এই পর্যায়ে বলতে পারেন, এসব কি বাস্তব? সত্যিই একটি পরিবারের কল্পনাতীত ক্ষমতা?

আমরা সবাই তাদের চিনি। শুধু তারা তাদের নাম পালটিয়েছে। কখনো তারা দাতব্য সংস্থা, কখনো প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, কখনো আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মালিক। তারা রূপ বদলায়, মুখোশ পরে। কিন্তু তাদের ইশারায় ঘোরে দুনিয়া।

এই বইয়ে ফোর্ড দেখান কীভাবে জায়োনিস্টরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, কীভাবে ১৯১৭ সালের Balfour Declaration–যেটা ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের পথ তৈরি করে, তা রথচাইল্ডদের প্রভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর ঐ ঘোষণাপত্রে কাকে ঠিকানা করা হয়েছিল তা সবাই জানেন। তাও যারা জানেন না, তাদের জন্য বলছি, লর্ড লিওনেল ওয়াল্টার রথচাইল্ড-কে। এখানেই থেমে থাকেননি ফোর্ড। তিনি অভিযোগ তোলেন–

> "বিশ্ব অর্থনীতি, গণমাধ্যম, ও শিল্প-ব্যবসার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রথচাইল্ডদের অনুপ্রবেশ রয়েছে। তারা যাকে চায়, রাজা বানায়; যাকে চায়, ধ্বংস করে।"

তার এই বক্তব্যের পরপরই শুরু হয় বিতর্ক। বিশ্বজুড়ে ইহুদী সংগঠনগুলো ক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। বইটি নিষিদ্ধ হয় একাধিক দেশে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা বইয়ের গতিকে থামাতে পারেনি। বইটি হয়ে ওঠে 'forbidden knowledge'-এর এক সোনালি দলিল।

ডার্ক ওয়েব, ক্রিপ্টো ফরামে, এমনকি গোপন থিঙ্ক ট্যাঙ্কে আজও আলাপ জমে কীভাবে রথচাইল্ডরা তাদের আর্থিক চক্রে পুরো জাতিসংঘ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ, এমনকি আমেরিকান ফেডারেল রিজার্ভ পর্যন্ত নিজেদের মোহজালে বেঁধেছে।

আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'Federal Reserve' কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়, এটা আসলে বেসরকারি মালিকানাধীন, যার প্রধান শেয়ার হোল্ডারদের ভেতর

একাধিক রথচাইল্ড-সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আছে। এই ‘ফেডারেল রিজার্ভ’ বাংক প্রতিষ্ঠা নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য সামনের পাতায় জানতে পারবেন।

এটাই সেই ভয়ের জাল– যা রথচাইল্ডদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা মানুষদের চুপ করিয়ে দেয়। এটাই সেই ভয়, যা ফেসবুকের অ্যালগরিদমকে ট্রিগার করে। এটাই সেই ভয়, যা ওই তথ্যকে এক শতাব্দী ধরে পাঠকদের চোখের আড়াল করে রাখে। তবুও, ইতিহাসের পাতায় সত্য রয়ে যায়। লুকানো ইতিহাস ঠিকই একদিন মুখ খুলবে। সেই বাক্য দিয়ে বলি– When you see a snake, never mind where his tail is– look at where his head lies.

ধারণা দেওয়ার জন্য হেনরি ফোর্ডের তথ্যের সূচনা করেছি। ঐতিহাসিক দাবী থাকতেই পারে যে, ফোর্ডের তথ্য মিথ্যা, ফোর্ডের উক্ত দলিল জাল, চরম ইহুদী-বিদ্বেষের প্রকাশ। তবে সব মনে হয় না মিথ্যা তথ্য! সত্যের মধ্যেই মিথ্যা থাকে, মিথ্যার মধ্যেই সত্য থাকে। কিছু ঘটেছে দেখেই রটেছে। না ঘটলে তো রটত না। ফোর্ডের তথ্য দিয়ে সূচনা করার কারণ হলো, হেনরি ফোর্ডই সবচেয়ে বেশি এদের বিষয় তথ্য দিতে পেরেছিল। ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব বলে এড়িয়ে যাওয়া যেতেই পারে, আপনি তা পারেন। তবে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার দিকে নজর দিলে, হেনরি ফোর্ডের অতীতের বলা কথাগুলোর একটা ভিত্তি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন আসতেই পারে, এরা এত শক্তি পেল কীভাবে? ফোর্ডের ভাষায়, রথচাইল্ডদের অর্থ, রাজনীতির বাইরেও সবচেয়ে বড় হাত ছিল ‘ideological manipulation’-এ। তারা শুধু যুদ্ধ ফান্ড করেনি, তারা মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রোপাগান্ডার রাজ্যে তারা ছিল নেপথ্য শাসক।

আইজ্যাক অসিমভ বলেছিলেন–

> "You may silence a man, but not the questions he leaves behind."

“তাদের নাম বলতে ভয় পায় মানুষ।

তাদের নিয়ে মুখ খুললেই বদনসিব নামে।

তবুও ইতিহাসের পাতায় পাতায় তারা ছড়িয়ে আছে– অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা এক গোপন চুক্তির মতো।”

একটা সময় ছিল, যখন রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে মানুষ নির্দ্বিধায় ইহুদী ও এই তাত্ত্বিকদের নিয়ে কথা বলত। আজ? সেই কথাগুলো শোনা যায় ফিসফিসে কণ্ঠে, অথবা কোনো গোপন গ্রুপের চ্যাটে। কেন? কারণ; আজ সেই কথাটাই বললে আপনাকে বলা হবে 'বর্ণবিদ্বেষী', 'উগ্রবাদী', 'সাম্প্রদায়িক,' 'ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক' কিংবা 'পাগলের প্রলাপ' 'আজগুবি আষাঢ়ে গল্প' সাথে 'অস্বাভাবিক'।

কিন্তু ইতিহাস ভুলে যায় না। ইতিহাস সব মনে রাখে।

একটু পেছনে গেলেই জানা যায় অনেক জেন্টাইল 'হিব্রু' বা 'সেমাইট' বলে ইহুদীদের সম্বোধন করত। এক সময় রাস্তা-ঘাটে ইহুদীদের নিয়ে দেদার আলোচনা হতো। রথচাইল্ড পরিবার ছিল সেই বিতর্কের কেন্দ্রে। তাদের বাড়িতে পুলিশের হানা, পত্রিকায় বড় হরফে 'সন্ত্রাসী' শিরোনামে তাদের আখ্যায়ন! কিন্তু সময় বদলালো।আজ সেই পরিবারের নাম শুনলেই ক্ষমতাবানরা ভীত কণ্ঠে বলে, 'No comment.'

কী এমন ঘটল? যার দরুন মানুষ ইহুদীদের নিয়ে আলোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল? উত্তরটা রয়েছে ইতিহাসের মলিন পৃষ্ঠাগুলোতে, যা কেউ খুলে দেখতে চায় না।

১৯১৩, আমেরিকায় জন্ম নেয় 'Anti-Defamation League'. নাম শুনে মনে হয় যেন এটা মানবাধিকার রক্ষার জন্য একটি নিরীহ সংগঠন। কিন্তু এর লক্ষ্য ছিল ইহুদীদের নিয়ে কোনো 'নেগেটিভ' আলোচনার মুখ বন্ধ করে দেওয়া।

আজকের সমাজে এদের অনেকে বলে– "The Shield of the Chosen." তারা শুধু গাল-গল্প থামায় না, তারা ইহুদীদের 'ভিকটিম' রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু আসল খেলাটা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই।

সবকিছুর শুরু এক নাম দিয়ে, মায়ের আমশেল রথচাইল্ড (Mayer Amschel Rothschild)

রক্তিম সুদের বীজ

১৭৪৪ সালের এক কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের জুডেনগ্যাসে (Juddengasse) জন্ম নেয় এক শিশু, যার নাম ছিল মায়ের আমশেল বাউর। সেই সময় জার্মানিতে ইহুদী গেটো ছিল শুধু অভিশপ্ত নয়, চতুর্দিকে প্রাচীরঘেরা। যেন মানুষের মন থেকে যত ঘৃণা, ভয় আর অবজ্ঞা ঝরে পড়ে, তা যেন একত্রে জমে থাকে সেই অলিগলিতে। সে সময়কার ইউরোপে ইহুদীরা ছিল নির্বাসিত, নিপীড়িত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। কিন্তু আমশেল ছিল আলাদা। তিনি বুঝেছিলেন, যুদ্ধ আর রাজনীতি শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে অর্থনীতিতে।

আঠারো বছর বয়সে মেয়র রথচাইল্ড চলে গিয়েছিলেন পাঁচশ কিলোমিটার দূরের হামবুর্গ শহরে। শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন সেখানকার ওথেনহাইমার ব্যাংকিং হাউসে। এক বছর ধরে ব্যাংকিং ব্যবসার নাড়িনক্ষত্র জেনে, আবার ফিরে এসেছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে। ইহুদী মহল্লাতেই খুলে ফেলেছিলেন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাংক। নিজেই মালিক, নিজেই কর্মী। ইহুদীদের টাকা জমা রাখতেন। সেই টাকা বাজারে খাটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সুদ-সহ ফেরত দিতেন। একইসঙ্গে বাবার মতোই প্রাচীন সামগ্রীর ব্যবসাও চালাতেন। টাকা সুদে দিতেন, তবে ইহুদীদের টাকা দিতেন বিনা সুদে। অন্য ধর্মালম্বীরা নিলে সুদ গুনতে হতো।

আমশেল যৌবনে যেমন সুন্দর দেখতে ছিলেন, তেমনই ছিলেন বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ। ছিল অচেনা কোনো মানুষকে দ্রুত মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব সবসময় সমাজের ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়কে নিজের ব্যাংকের গ্রাহক করার চেষ্টায় থাকতেন আমশেল। পরিচয় হওয়ার পরই সম্ভাব্য গ্রাহকের পরিবারে সে ঢুকে পড়তেন বন্ধু হয়ে। অল্পদিনের মধ্যেই ধনী ব্যক্তিটির টাকা নিয়ে আসতেন নিজের ব্যাংকে। তবে গ্রাহকদের উচ্চ সুদ-সহ আসল ফেরত দিতে ভুলতেন না আমশেল। ফলে ক্রমশই ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেছিল ধুরন্ধর ইহুদী মানুষটির ব্যবসা।

সে ছিল একজন ইহুদী মানি-লেন্ডারের সন্তান। বাবা আমশেল মোশে বাউর, একজন কিউরেটর ও কয়েন কালেক্টর, যিনি স্থানীয় কিছু প্রিন্সের কাছে প্রাচীন মুদ্রা কেনাবেচা করতেন। ঘরের দরজার ওপরে ছিল একটি লাল রঙের ঝুলন্ত সাইনবোর্ড 'Rothschild' (German: Rotes Schild), (জার্মান অর্থ: লাল ঢাল)। সেখান থেকেই আসে নতুন নাম– **রথচাইল্ড**।

শিখে ফেলেছিল ব্যাংকিং-এর অদৃশ্য ভাষা– ঋণ, সুদ, ও যুদ্ধের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার গোপন গাণিতিক জাল।

আমশেল রথচাইল্ডের বিশেষ আগ্রহ ছিল রাজার পছন্দের জিনিস দুর্লভ কয়েন ও পুরাতন ধাতব মুদ্রা। এই আগ্রহই তাকে যুক্ত করে ল্যান্ডগ্রেভ উইলিয়াম IX-এর সঙ্গে, যিনি তৎকালীন ইউরোপের অন্যতম ধনী ব্যক্তি এবং প্রুশিয়ান সেনাদের ভাড়া দিয়ে আয় করা অর্থের পাহাড়সম মালিক। এভাবে সে হয়ে ওঠে ব্যাংকার, অর্থসংরক্ষক এবং ধীরে ধীরে ছায়া অর্থমন্ত্রী। রাজপরিবারের পড়ে থাকা প্রাচীন জিনিস স্বল্প মূল্যে ক্রয় করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি করত আমশেল রথচাইল্ড।

তবে, আসল কাহিনি শুরু হয় এখানেই। রথচাইল্ড মনে হয় বুঝেছিল–

> **"যুদ্ধে জয়ী নয়, যিনি উভয় পক্ষকে ঋণ দেন, প্রকৃত জয়ী তিনি।"**

পাঁচ পুত্র, পাঁচ অস্ত্র

ব্যবসা যখন ছড়িয়ে বড় হয়ে যায়। তখন আমশেল রথচাইল্ড তার পাঁচ পুত্রকে পাঠিয়ে দেন ইউরোপের পাঁচ ভিন্ন দেশে– লন্ডন, প্যারিস, নেপলস, ভিয়েনা ও ফ্রাঙ্কফুর্টে। তাদের হাতে তুলে দেন একটিই নির্দেশ–

> **"একই রক্তে একটাই ব্যাংক চালাবে। বিভক্ত থাকবে দেহে, কিন্তু এক থাকবে লাভে।"**

এই পাঁচ রথচাইল্ড ভাই অচিরেই হয়ে ওঠে নেপোলিয়ন যুদ্ধ, ওয়াটারলু যুদ্ধ এবং পরে মার্কিন গৃহযুদ্ধেও অর্থের জাদুকর। তারা দুই পক্ষকেই অর্থ দিত। জয় হোক যে কারও, লাভ হতো একটাই পরিবারের। অর্থাৎ তার ছেলেরা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের পাঁচটি দেশের পাঁচটি রাজধানীতে। ব্যাংকের ছদ্মবেশে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়ে ওঠে অর্থনীতির রাজা এবং রাজনীতির নিয়ন্ত্রক।

- লন্ডনে নাথান রথচাইল্ড।
- প্যারিসে জেমস।
- ভিয়েনায় সালোমন।
- নেপলসে কার্ল।
- আর ফ্রাঙ্কফুর্টে মূল আন্সেলম ঘাঁটি।

প্রতিটি ভাই শুধু একজন ব্যবসায়ী নয়, সেই দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে হয়ে উঠল সেই দেশের নিয়ন্ত্রকদের আত্মীয়, বিবাহের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের 'অন্তঃপুরে' প্রবেশ এইভাবে সহজ হলো। এ বিষয়ে আরও কিছু বলা যাক। কীভাবে তারা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল? সামগ্রিক বলা সম্ভব নয়, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে জানা যাক।

পাঁচ আঙুলে ইউরোপ- পঞ্চশক্তির সমবায়

আঠারো শতকের শেষভাগ। সময়টা যখন সাম্রাজ্যগুলো ঝিমিয়ে পড়ছিল, রাজ্যগুলো ছিল ঋণে ডুবে থাকা জর্জরিত মৃতপ্রায় দেহ। তখনই এক ইহুদী সুদী মহাজন ফ্র্যাঙ্কফুর্টের গেটোর ভিতর থেকে বুনে ফেলল এক সুদবিহীন দৃষ্টিতে মহাপরিকল্পনা। বিশ্বের অর্থনীতিকে কবজা করার পরিকল্পনা। নাম তার মায়ের আমশেল রথচাইল্ড।

তার বিশ্বাস ছিল, "যে জাতি মুদ্রা ছাপে, প্রকৃত রাজত্ব তারই। রাজা নয়, সম্রাট নয়– ঋণদাতা হবে বিশ্বশাসক।"

আমশেল রথচাইল্ড বুঝে গিয়েছিল, একা এক গলি থেকে বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। প্রয়োজন ছিল পাঁচ আঙুলের মতো পাঁচ পুত্র যারা ছড়িয়ে পড়বে ইউরোপজুড়ে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ থাকবে এক মস্তিষ্কে। পাঁচ ছেলের জন্য গড়ে উঠল এক অর্থনৈতিক পেন্টাগ্রাম, যেখানে প্রতিটি কেন্দ্র ছিল একেকটি শহর, একেকটি শাসনব্যবস্থার হৃদয়।

১. আন্সেলম মায়ের রথচাইল্ড– ফ্রাঙ্কফুর্ট:

সবচেয়ে বড় ছেলে। বাবার ব্যবসা ও ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের মূল ঘাঁটি ফ্রাঙ্কফুর্টে থেকেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। জার্মান রাজপরিবারে সুদীর্ঘ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, প্রুশিয়ার যুদ্ধ ও শিল্পায়নের খরচের জন্য অগণিত ঋণ দেন।

২. নাথান মায়ের রথচাইল্ড– লন্ডন:

সর্বাপেক্ষা চালাক ও বুদ্ধিমান পুত্র। ১৮০৬ সালে লন্ডনে পাড়ি জমান এবং প্রতিষ্ঠা করেন 'N.M. Rothschild & Sons' ব্যাংক। নাথান ছিলেন নেপোলিয়নের যুদ্ধের প্রকৃত অর্থদাতা ও বিজয়ীর আর্থিক পরিকল্পক। ওয়াটারলু যুদ্ধের দিন, লন্ডনের শেয়ার বাজারে ধস নামাতে রথচাইল্ড পরিবারের গুপ্তচর জালের এক মিথ্যে বার্তা। এই নাথানের বুদ্ধিমত্তার দরুন বিট্রিশ অর্থনীতি রথচাইল্ড পরিবারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, যা বিট্রিশকে কার্যত আজ্ঞাবহ করে।

৩. জেমস মায়ের রথচাইল্ড– প্যারিস:

জেমস রথচাইল্ড, যিনি পরে ব্যারন জেমস ডি রথচাইল্ড নামে পরিচিত হন, ১৮১১ সালে প্যারিসে আসেন। তিনি রথচাইল্ড পরিবারের পঞ্চম এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তার ভাই নাথান রথচাইল্ড তাকে প্যারিসে পাঠান যাতে তারা মহাদেশীয় অবরোধের সময় ব্রিটিশ পণ্য পাচার করতে পারে। কিন্তু ১৮২০-এর দশকে তিনিই

হয়ে উঠলেন প্যারিসের শিল্পায়ন, রেলপথ নির্মাণ ও সামরিক সরঞ্জাম দানকারীদের অর্থদাতা। ব্যাংক অফ ফ্রান্সের ভিতরে রথচাইল্ডদের লোক বসেছিল, যাদের কাজ ছিল রাজপরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সুদের খেলা চালানো।

ফরাসি সরকারের বন্ড এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় করতেন, যা রাষ্ট্রের ঋণ-ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করত। এর মাধ্যমে তারা ফরাসি রাজপরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব বা দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লবের পর যখন লুই ফিলিপ ক্ষমতায় আসেন, তখন রথচাইল্ড পরিবার তাকে সমর্থন দেয় এবং তার সরকারকে বিশাল অঙ্কের ঋণ দেয়। লুই ফিলিপ একজন উদারপন্থী রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

বস্তুত, জুলাই বিপ্লবের পর উদারপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতায় জেমস যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছিলেন, তা ফেরত দিতে গিয়ে ফরাসি রাজশক্তি কার্যত মাথানত করে। অর্থাৎ এখানে রথচাইল্ড হয়ে যায় ছায়া সরকার।

৪. কার্ল মায়ের রথচাইল্ড– নেপলস:

ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন 'C.M. de Rothschild & Figli.' নেপলসের রাজপরিবারকে শাসন করতে সাহায্য করেন ঋণের মাধ্যমে। ভ্যাটিকান ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে প্রথম সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন কার্ল, যা পরবর্তীতে ভ্যাটিকানের ব্যাংকিং প্রভাবেও রথচাইল্ড প্রভাব বিস্তার ঘটায়। অর্থাৎ ১৮৩০-এর দশকে পোপ ষোড়শ গ্রেগরি (Pope Gregory XVI)-এর সময় ভ্যাটিকান আর্থিক সংকটে পড়ে। এই সময়ে রথচাইল্ড পরিবার, বিশেষ করে কার্ল, পোপকে বিশাল অঙ্কের ঋণ দেন। তখনই একটা গোপন চুক্তি হয়। সেটা সামনের অধ্যায়ে পেয়ে যাবেন।

৫. সালোমন মায়ের রথচাইল্ড– ভিয়েনা

অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ভিয়েনায় গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'S.M. von Rothschild ব্যাংক'। উইনার স্টেট রেলওয়ে, আয়রন মাইনস, কারখানা সবকিছুর আর্থিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সালোমন। অস্ট্রিয়ান সম্রাটের পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেছেন।

গোপন সমঝোতা ও চিঠির কারিগরি:

এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ছিল গোপন কূটনৈতিক বার্তাবাহক ব্যবস্থা। সময়ের অনেক আগেই তারা গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব 'ডাকব্যবস্থা'– রথচাইল্ড কুরিয়ার, যা ইউরোপের রাজদরবারকেও হার মানাত দ্রুততায়।

তাদের গোপন সাংকেতিক চিঠিতে লেনদেন, রাজনৈতিক পরিবর্তন, সেনা-সঞ্চালনের গোপন খবর, এমনকি গুপ্তচরবৃত্তির নির্দেশ থাকত।

"এক পরিবার, পাঁচ রাজধানী, এক শাসনব্যবস্থা" রথচাইল্ডরা কখনো একটি দেশ শাসন করেননি, কিন্তু পাঁচটি দেশের রাজারা তাদের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেননি। তারা রাজার মাথায় মুকুট বসাতেন আর সেই মুকুটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেন ঋণের তালিকা।

তারা ছিল অদৃশ্য সাম্রাজ্যের 'সুদের সম্রাট'। তারা একে বলতেন–

> *"The Empire of the Invisible Hand."*

ঋণ যখন অস্ত্র

রথচাইল্ডরা আবিষ্কার করেছিল আধুনিক ঋণের এক ভয়ংকর ব্যাকরণ– একটি রাষ্ট্রকে ঋণ দাও। ঋণের বিনিময়ে নিরাপত্তা ও নীতিনির্ধারণের অধিকার আদায় করো। ঋণ পরিশোধ না করলে– স্বর্ণ, সম্পদ, এমনকি যুদ্ধ বাধিয়ে নিয়ন্ত্রণ করো।

এই নীতিতে তারা ক্রমে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে– ব্রিটিশ সেন্ট্রাল ব্যাংক, ফরাসি জাতীয় ব্যাংক, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের পূর্বসূরি ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক এবং ইউরোপের রাজাদের গোপন খরচপত্র।

এক গেটোর দরিদ্র কিশোর কীভাবে হয়ে উঠল বিশ্বব্যবস্থার মহারথী? কী এমন করেছিল যে সাম্রাজ্যবাদীরা পর্যন্ত তাদের কাছে হাত পাতে? কিংবা সুদের মাধ্যমে যে টাকা আসে, তা কি আসলেই টাকা? না কি রক্তাক্ত প্রজাদের চোখের জলকে পুঁজিতে পরিণত করার এক আধুনিক যন্ত্র?

১৭৪৪ সালের জার্মানির এক নিরীহ বস্তিতে জন্ম নেওয়া এই লোকটিকে প্রথমে কেউ চিনত না। তার পৈত্রিক ব্যবসা ছিল, মুদ্রা ও পণ্য বিনিময়। কিন্তু সময়ের কৌশলে, ইতিহাসের সুবিধাজনক বাঁকে সে হয়ে ওঠে 'আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং'-এর জনক।

'French Revolution' ছিল তার জন্য সোনার খনি।

যেখানে অন্যরা হারাচ্ছিল সব, সেখানে তিনি শুধুই নিচ্ছিলেন রাজনৈতিক যোগাযোগ, যুদ্ধ-বাণিজ্যের সুবিধা এবং সরকারের আস্থা।

তাকে অর্থ দেওয়া হতো, যুদ্ধে পাঠানোর জন্য ভাড়াটে জার্মান সেনা রিক্রুট করতে। কিন্তু সে করত কী?

৫০ টাকা নিয়ে ১৫ টাকায় কাজ চালিয়ে ৩৫ পকেটে পুরত।

এই অর্থ-শিল্পই তাকে করে তোলে ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবার গঠনের রূপকার। কীভাবে এক ব্যক্তি, এক পরিবার, এক ছদ্মনামে গড়ে তোলে এক বৈশ্বিক শক্তির সাম্রাজ্য? জীর্ণ-শীর্ণ বাড়িতে বসবাস করা যতসামান্য টাকা সুদে লাগিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল, তা এখন বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। আগে একটা মানুষকে তারা ঋণের সুদের ফাঁদে ফেলে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের আজ্ঞাবহ করে নিত, সেই মহল্লার গলির নিয়ন্ত্রণ প্রতিভাকে উপজীব্য করে একই পন্থা অবলম্বন করে দেশ থেকে বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে তারা।

Rothschild শুধু এক নাম নয়, এ এক সিস্টেম, এক ছায়াময় অবকাঠামো, যার শিকড় আজও গেঁথে আছে Wall Street থেকে Westminster পর্যন্ত। তারা কি ম্যাজিক জানত? না, তারা জানত অঙ্ক। তারা জানত ভয়। আর তারা জানত কীভাবে 'ঋণ' নামের এক চোরাবালিতে গোটা রাষ্ট্রকে আটকে রাখতে হয়। এদের নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই চাবিকাঠি, যা খুলে দেয় আধুনিক 'গ্লোবাল ব্যাংকিং সিস্টেম'-এর রহস্যদ্বার।

তারা ব্যাংক খুলল, ঋণ দিল, যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষকে টাকা জোগাল। একই সঙ্গে দুই পক্ষকে ঋণ দিত অর্থাৎ, যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে রথচাইল্ডের স্বার্থ হাসিল! যেমন নাথান রথচাইল্ড ওয়াটারলুর যুদ্ধের ফলাফল জেনে গিয়েছিলেন ২৪ ঘণ্টা আগেই নিজস্ব 'গোয়েন্দা বার্তা' ব্যবস্থার মাধ্যমে।

ঋণের সিংহাসন

১৮১৫ সাল। ওয়াটারলুর যুদ্ধের ঠিক পরদিন। লন্ডনের রাস্তায় তখন আতঙ্ক আর উত্তেজনার কুয়াশা। সবাই অধীর অপেক্ষায় নেপোলিয়ন জিতেছে না ব্রিটিশ? কিন্তু একজন মানুষ তখনই জানতেন উত্তরটা: **নাথান রথচাইল্ড**।

সিনহা-বাহিত বাটনহোল কোট পরা সেই রহস্যময় ব্যক্তি তখন ছায়ার মতো হেঁটে যাচ্ছিল ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের দিকে। যুদ্ধের ফলাফল তখনও সরকার জানে না।

কিন্তু রথচাইল্ড জানতেন, কারণ তার নিজস্ব গুপ্ত বার্তাবাহক 'রেডশিল্ড কোড' ব্যবহার করে আগেই বার্লিন থেকে খবর এনেছে। ছড়িয়ে দেওয়া হলো, "ন্যাপোলিয়ন জিতেছে!"

এই খবর বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে গেল। এরপর শুরু হয়ে গেল শেয়ার বিক্রির ধুম। রহস্যময় সেই ব্যক্তি স্টক মার্কেটে ঢুকে পড়লেন, মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটিয়ে সব শেয়ার বিক্রি করতে লাগলেন। ওখানেও রটে গেল ব্রিটিশরা হেরেছে! লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল বিক্রিতে, শেয়ারের দাম পড়তে লাগল পতঙ্গের মতো। ঠিক তখনই, নাথান রথচাইল্ডের গুপ্তচররা চুপিসারে বিভিন্ন বেশে প্রায় সব শেয়ার কিনে নিল গলে যাওয়া মূল্যে বা পানির দামে।

পরে যখন আসল খবর আসলো ব্রিটিশরা জিতেছে, তখন সময় অনেক পেরিয়ে গেছে। রথচাইল্ড তখন একদিনে হয়ে উঠলেন **ইংল্যান্ডের ছায়া-রাজা**। এই ছিল রথচাইল্ডদের বিশ্বব্যাপী সুদের সাম্রাজ্যের সূচনা। তাদের মূল অস্ত্র: **ঋণ।** তাদের মূল কৌশল: **যুদ্ধ।**

এই ঘটনা ১৮৪৬ সালে Georges Dairnvaell নামক একজন ফরাসি লেখক তার একটি প্রকাশনায় প্রথম লেখেন, যা পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

মূল ধারার ইতিহাসবিৎরা লিখেছেন, নাথান রথচাইল্ড যুদ্ধের খবর পাওয়ার পর জানতে পারেন যে ব্রিটিশরা জয়ী হয়েছে। তিনি এই তথ্যের ভিত্তিতে বাজারে ব্রিটিশ সরকারের বন্ড (Government bonds) কেনা শুরু করেন। যেহেতু তার আগে আর কেউ এই খবর জানত না, তাই বন্ডের দাম তখন কম ছিল। যখন সরকারিভাবে জয়ের খবর ঘোষিত হয়, তখন বন্ডের দাম আকাশচুম্বী হয় এবং এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেন। তবে, সেই মুনাফার পরিমাণ ঠিক কত ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

সুদ: আধুনিক দাসত্বের হাতিয়ার

রথচাইল্ডরা জানতেন– বন্দুক দিয়ে নয়, সুদের চুক্তিপত্র দিয়েই সভ্যতা দাসে পরিণত করা যায়।

"আমার দেশের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থাকলে, কে আইন বানাল তাতে আমার কিছু যায় আসে না।" *-মায়ের আমশেল রথচাইল্ড*

তারা ইউরোপের রাজপরিবারগুলোকে ঋণ দিতে শুরু করলেন। পেছনে সুদের শৃঙ্খল। প্রতিটি যুদ্ধ মানেই ছিল নতুন ঋণের প্রয়োজন। প্রতিটি দেশ জয় মানেই

ছিল নতুন ঋণগ্রস্ত রাষ্ট্র। অর্থনীতির গহীন গুহায় ঢুকে তারা তৈরি করলেন এক অদৃশ্য সাম্রাজ্য। যার কোনো পতাকা নেই, সীমান্ত নেই, কিন্তু সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে প্রথমে যুদ্ধজর্জর রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে তারা ঋণের আবেদন নেয়। তারপর অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ করে। উভয় পক্ষকেই তারা টাকা দেয়, যেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সুদের পাহাড় আরও উঁচু হয়।

আজ রথচাইল্ডদের নাম নেই হেডলাইনে। কিন্তু তাদের প্রভাব ছড়িয়ে আছে– বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক আইন, মিডিয়া হাউস, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, এমনকি ইসরায়েলের ভূ-রাজনৈতিক নকশা পর্যন্ত। তারা আছে, তবে ভিন্ন নামে। তারা চেনে আমাদের, কিন্তু আমরা তাদের চিনতে পারি না।

কারণ; তাদের অস্তিত্ব 'institutionalized' হয়ে গেছে। তারা এখন দাতব্য সংস্থার মুখোশে, পরিবেশবাদী বিনিয়োগ প্রকল্পে, এথিক্যাল ব্যাংকিংয়ের কসমে, আর হ্যাঁ, 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর স্বপ্নে। 'তিন শূন্যের পৃথিবী'– আমাদের প্রফেসর ইউনূসের দর্শন। এই দর্শনের সাথে একত্রীকরণ বা গভীর সংপৃক্ততা আছে বলা যায়, এই 'নব বিশ্ব সভ্যতা' বা 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর। প্রতিটি বিষয় ধরে ধরে পড়বেন। আগেই কোনো মন্তব্য করবেন না। সামনে গেলে এসব প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

স্বরবর্ণ

তারা কারা? তাদের অস্তিত্ব আমাদের গোচরে আসে না। কিন্তু তারা আছে– ছায়ার মতো, ধোঁয়ার মতো, রাতের নিঃশব্দ ঘোড়সওয়ারের মতো। আপনি যখন কোনো যুদ্ধে একপক্ষকে দোষারোপ করেন, তারা তখন উভয়পক্ষকে অর্থ জোগায়। আপনি যখন কোনো নির্বাচনে উত্তেজিত হন,

তারা তখন দুই প্রার্থীকেই গোপনে অর্থ দেয়। আপনি যখন যুদ্ধের খবর দেখেন, তারা তখন সেই যুদ্ধের জন্য দায়ী রাষ্ট্রের ঋণ মওকুফ করে।

তারা কোনো প্রচলিত ধর্ম মানে না, তবুও ধর্মকে ব্যবহার করে। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, তবুও গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। আমেরিকার রাজা কে? আমেরিকার প্রেসিডেন্টই সবচেয়ে ক্ষমতাধর? না। প্রেসিডেন্টরা আসে ও যায়। কিন্তু 'Federal Reserve' থেকে 'Council on Foreign Relations'– সব একেই ঘোরে। আর সেই ঘূর্ণিপাকে দাঁড়িয়ে থাকে রথচাইল্ডদের উত্তরসূরি।

১৯১৩ সালে, 'Federal Reserve প্রতিষ্ঠিত হয়'। লোক দেখানো সরকারি প্রতিষ্ঠান– কিন্তু প্রকৃত মালিক?

প্রাইভেট ব্যাংকারদের গোপন চক্র। তারাই নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকার ডলার ছাপানোর মেশিন। তারাই ঠিক করে, আপনার ডলার আজ শক্তিশালী হবে, না দুর্বল!

তিন রাজত্ব, এক ছায়া: আমেরিকা, সৌদি, ভ্যাটিকান। এই পৃথিবীর তিন শক্তিধর অক্ষ

ক. আমেরিকা– সামরিক আগ্রাসনের বাহিনী।

খ. ভ্যাটিকান– ধর্মীয় কূটনীতি ও গোপন জ্ঞানের হাব।

গ. সৌদি আরব– তেলের রাজনীতি এবং মুসলিম বিশ্বের মানসিক নিয়ন্ত্রণ।

এই তিনটি অক্ষ একে অপরের শত্রু নয়, বলা যায় একে অপরের মুখোশ। আর তাদের মঞ্চনাট্যের পরিচালক?

একই আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এলিট!

ভ্যাটিকান লাইব্রেরির নিচে কী আছে? হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দলিল, আদি বাইবেল, ডেড-সি স্ক্রলসের আসল ব্যাখ্যা, এমনকি ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের পূর্বাভাস!

কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। রথচাইল্ডদের প্রভাবেই ভ্যাটিকান সম্পদ রক্ষিত থাকে ইউরোপের কয়েকটি ব্যাংকে, যার মধ্যে অন্যতম রথচাইল্ডদের ব্যাংকিং চেইন। ধর্ম ও অর্থ– দুই জগতের সংযোগস্থল ভ্যাটিকান, আর তার রক্ষক হিসেবে রথচাইল্ডরাই নিয়ন্ত্রক।

১৯৩৩ সাল, সৌদি আরবে তেলের খনির সন্ধান। এক চুক্তি হয়– 'Standard Oil Company of California' (বর্তমানে Chevron)-এর সাথে। পেছনের কাহিনি? রথচাইল্ডদের বিনিয়োগেই সৌদি রাজপরিবার প্রথমবার বিশ্বমঞ্চে উঠে আসে। আজও সৌদি আরবের আরামকো, আরব লীগ, এমনকি ওআইসি– সবকিছুতে ঘাপটি মেরে বসে আছে সেই ছায়া।

এই সবকিছু কী কাকতালীয়? না কি পূর্ব নির্ধারিত?

তারা ইতিহাস লেখে না, তারা ইতিহাস সৃজন করে। তারা চিৎকার করে না, তারা ষড়যন্ত্র ফিসফিস করে। আমরা ভাবব, তারা নেই– অথচ প্রতিটি মুদ্রায়, প্রতিটি যুদ্ধে, প্রতিটি সংকটে তাদের অস্পষ্ট ছায়া পড়ে। তারা স্রেফ রথচাইল্ড নয়, তারা এক প্রতিষ্ঠান, এক মনস্তত্ত্ব, এক গোপন ধর্ম।

তিন রাজত্ব, এক ছায়া

বিশ্ব-রাজনীতির মঞ্চে আমরা দেখতে পাই তিনটি অদ্ভুতভাবে সমান্তরাল কিন্তু পরস্পর-সংযুক্ত শক্তির বলয়– আমেরিকা, সৌদি আরব ও ভ্যাটিকান। একে অপরের থেকে দূরত্বে অবস্থান করলেও, কার্যকরী ভূমিকায় তারা যেন একে অপরের পরিপূরক। উপর থেকে তারা বিভিন্ন মতাদর্শের প্রতিনিধি হলেও গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এই তিন রাজত্ব একই নাটকের অংশ, পরিচালনায় রয়েছে এক অভিন্ন ছায়াশক্তি– আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এলিট, যার পেছনে বারবার উঠে আসে রথচাইল্ড পরিবারের নাম।

১. আমেরিকা: সামরিক আগ্রাসনের হাতিয়ার:

আমেরিকার ভূমিকাটি পরিষ্কার: এটা আধুনিক যুগের সামরিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা নিজেকে বিশ্বের 'পুলিশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এবং কার নির্দেশে?

ফেডারেল রিজার্ভ নামক যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যার অংশীদারিত্ব রয়েছে একাধিক ব্যাংকিং পরিবারের হাতে– রথচাইল্ড, রকফেলার, ওয়ারবার্গ প্রমুখ।

এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধনীতি পরিচালিত হয়। এক-এগারোর সফল নাটক মঞ্চস্থের পর ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া কিংবা সিরিয়া– প্রতিটি আগ্রাসনের পেছনে তেলের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

২. ভ্যাটিকান: ধর্ম ও রহস্যের রাজনীতি

ভ্যাটিকানকে শুধু খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। এটা ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী গোপন সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে মিলিত হয়েছে ধর্মীয় কূটনীতি, লুকায়িত প্রাচীন জ্ঞান এবং গভীর আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক।

জেসুইট অর্ডার, অপুস দেই, নাইটস টেম্পলারস– এসব গোষ্ঠী ভ্যাটিকানের ছায়াতলে থেকেই যুগ যুগ ধরে গোপনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাল নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। ভ্যাটিকানের ব্যাংক (IOR– Institute for the Works of Religion)-এর সাথে রথচাইল্ড পরিবারের দীর্ঘদিনের আর্থিক সম্পর্কের দলিল রয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায়, রথচাইল্ডরা পোপকে ঋণ দিয়েছে এমন রেকর্ড পর্যন্ত রয়েছে (যেমন: ১৯ শতকে পোপ গ্রেগরি ষোড়শ)। অর্থাৎ ধর্মও ছিল এক সময়ে ব্যাংকিং ক্ষমতার গ্রাহক।

৩. সৌদি আরব: তেল, ইসলাম ও মানসিক উপনিবেশ

সৌদি আরব শুধু তেলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, মুসলিম বিশ্বের মানসিক নিয়ন্ত্রণেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৩৩ সালে সৌদি আরব ও স্ট্যান্ডার্ড অয়েল (রকফেলারের) মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ছিল ইতিহাসের মোড় ঘোরানো ঘটনা।

পেট্রোডলার-ব্যবস্থা (Petrodollar System): আমেরিকান ডলার দিয়ে বিশ্বজুড়ে তেল বিক্রি করার শর্তে সৌদি রাজপরিবারকে টিকে থাকার গ্যারান্টি দিয়েছিল ওয়াশিংটন। এভাবেই সৌদি আরব মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হলেও, তার নিরাপত্তা ও ধর্মনীতি রয়ে গেছে পশ্চিমা স্বার্থরক্ষায় বন্দী। ওহাবী মতবাদের প্রসার, তথাকথিত সৃষ্ট জঙ্গিবাদে অর্থায়ন এবং ইরানের বিরুদ্ধে কৌশলগত অবস্থান– এসবই ছিল গভীরতর পরিকল্পনার অংশ, যেখানে আন্তর্জাতিক অর্থ ও গোয়েন্দা চক্র জড়িত।

৪. এক পরিচালকের ছায়া: আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এলিট

এই তিন শক্তির পেছনে একটি অভিন্ন শক্তি কাজ করে, যার নাম বহু সময়ে পালটে গেলেও তার প্রকৃতি এক: বিনিয়োগ, ঋণ, সুদ ও নিয়ন্ত্রণ।

রথচাইল্ড পরিবার, যারা ১৯শ শতক থেকেই ইউরোপের রাজপরিবারকে ঋণ দিয়ে যুদ্ধ ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত, তারাই আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ, ব্রিটেনের ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ও ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক-সহ বহু প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিভূ রেখে গেছে। যুদ্ধ হোক, মুদ্রাস্ফীতি হোক কিংবা আর্থিক সংকট– সবকিছুর মাধ্যমে তাদের আয় ও প্রভাব বেড়েছে।

এইসব ঘটনার পেছনের অভিন্ন নকশা কে আঁকে? উত্তর স্পষ্ট: আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এলিট, বিশেষত রথচাইল্ডদের মতো পরিবার, যারা নেপথ্যে থেকে অর্থনীতির সুতো ধরে ঘুরিয়ে দেয় ভূ-রাজনীতির চাকা।

মুখোশের অন্তরালে এক মুখ

তিনটি রাজত্ব– আমেরিকা, সৌদি আরব, ভ্যাটিকান– তিনটি ভিন্ন ভূমিকায় হলেও মূলত এক নাট্যরচনার তিনটি পাত্র। আমেরিকা যুদ্ধ করে, সৌদি প্রভাবিত করে মুসলিম মানসিকতা, ভ্যাটিকান রাখে প্রাচীন গোপন চুক্তির চাবিকাঠি।

আর পরিচালক? অদৃশ্য ছায়ার মধ্যে থাকা একদল ব্যাংকিং রাজা, যারা যুদ্ধ, ধর্ম ও তেল– সবকিছুকে ব্যালেন্স শিটে রূপান্তর করে।

পৃথিবীর ক্ষমতা-কাঠামোকে বুঝতে হলে ভূ-রাজনীতি, ধর্মীয় জ্ঞান এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ– এই তিনটি স্তম্ভ একত্রে বিশ্লেষণ করতে হয়। খণ্ডভাবে কেউ আমেরিকার সামরিক নেটওয়ার্ক, কেউ সৌদি আরবের তেলের রাজনীতি, আবার কেউ ভ্যাটিকানের ধর্মীয় সম্রাজ্য দেখিয়ে থাকে। কিন্তু এই তিনটি শক্তির অন্তর্নিহিত বন্ধন ও অভিন্ন নিয়ন্ত্রককে উপেক্ষা করে গেলে বুঝতে পারা যায় না, আসলে কারা নেপথ্যে বিশ্ব পরিচালনা করছে?

আমেরিকার সামরিক বাহিনী এককভাবে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভূখণ্ডে ছায়া ফেলে রেখেছে। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, এমনকি ইউরোপ– সবখানে মার্কিন ঘাঁটি, ড্রোন ও স্যাটেলাইট নজরদারি। তবে এই সামরিক বাহিনী আদৌ কী আমেরিকার জনগণের নীতিগত প্রতিনিধি? না কি এটা এক বিশেষ শ্রেণির 'প্রাইভেট মিলিটারি সার্ভিস'?

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকান সামরিক হস্তক্ষেপগুলো (ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া) অধিকাংশই আন্তর্জাতিক ঋণ, অস্ত্র বাণিজ্য এবং তেল দখলের খেলায় পরিণত হয়েছিল। রথচাইল্ড নিয়ন্ত্রিত ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক প্রতিটি যুদ্ধে ছিল আর্থিক প্রণোদনার মূল উৎস। সুতরাং, মার্কিন সৈন্যরা যুদ্ধ করে, কিন্তু তার মুনাফা যায় ব্যাংকিং এলিটদের পকেটে।

১৯৩৩ সালে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল অব ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে চুক্তির পর সৌদি আরব হয়ে ওঠে আমেরিকান পেট্রোডলারের মেরুদণ্ড। সত্তরের দশকে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড থেকে ডলারের বিচ্ছেদের পর সৌদিরা চুক্তি করে, তেলের বিনিময়ে শুধু ডলার নেবে। এর ফল? গোটা বিশ্ব ডলার কেনে তেল কেনার জন্য, আর ডলার রিজার্ভের মালিক হয় ওয়াশিংটন।

অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে সৌদি আরবের সঙ্গে আমেরিকান কোম্পানি Standard Oil Company of California (SOCAL)-এর একটি তেল অনুসন্ধান চুক্তি হয়েছিল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পেট্রোডলার ব্যবস্থা (Petrodollar System) ভূ-রাজনৈতিক চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে হয়েছিল। তৎকালীন সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসে। এই চুক্তির মূল শর্ত ছিল: সৌদি আরব তার তেল শুধু মার্কিন ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করবে। তেল বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত ডলার তারা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বাজারে বিনিয়োগ করবে (যেমন: মার্কিন ট্রেজারি বন্ড কেনা)। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি রাজপরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং সামরিক সহায়তা দেবে। এই চুক্তিই আজকের পেট্রোডলার-ব্যবস্থার ভিত্তি, যা বিশ্বজুড়ে মার্কিন ডলারের আধিপত্য ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ধর্মীয় দিক থেকেও সৌদি রাজতন্ত্র বিশ্ব মুসলিমদের এক ‘স্টেট স্পনসর্ড ইসলাম’ শোনায়। যার মূল ভিত্তি, ক্ষমতাসীনদের সমর্থন, উগ্রবাদ নয় আবার প্রতিরোধও নয়। এভাবে তেল ও ইসলাম, উভয় নিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে ‘সিস্টেমিক প্রোগ্রামিং’-এর অংশ।

ভ্যাটিকান সিটি– পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র, কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গোপন আর্কাইভের মালিক। এখানেই আছে বহু পুরাতন ধর্মগ্রন্থ, যীশুর অসমাপ্ত জীবনের ইতিহাস, প্যাগান ও কাব্বালাহি নথিপত্র– যা কখনোই জনসাধারণের চোখে আসে না।

পোপতন্ত্র কখনো রোমান সাম্রাজ্যের চেয়েও শক্তিশালী ছিল। আধুনিক যুগে সে ক্ষমতা সরাসরি সামরিক নয়, বলা যায় নীতিনির্ধারণ ও লবিং-এর মাধ্যমে। ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমেই পশ্চিমা ধর্মীয় কূটনীতি পরিচালিত হয় এবং খ্রিষ্টধর্মের মধ্যেই ঢুকে থাকে রাজনীতি, সিআইএ, এমনকি ইলুমিনাতির প্রাচীন চিহ্ন।

এই তিন রাজত্বের পেছনে যে ছায়া নৃত্য করে, তার নাম– আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এলিট। রথচাইল্ড পরিবার, ওয়ারবার্গ, শিফ, ল্যাজার্ড ও রকফেলারের মতো পরিবারগণ এদের মূল নিয়ন্ত্রক। পুঁজিবাদ, যুদ্ধ, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি– সবই এই ব্যাংকিং চক্রের অর্থনৈতিক সুদের ঋণপ্যাঁচে বন্দী।

"Let me issue and control a nation's money, and I care not who makes its laws."– Mayer Amschel Rothschild-এর এই বাক্যটি শুধু উক্তি নয়, বলা যায় ২০০ বছরের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি।

আমেরিকা, সৌদি আরব, ও ভ্যাটিকান– তিনটি ভিন্ন মুখোশ, তিনটি ভিন্ন উপস্থাপনা, কিন্তু একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দু। এই কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে এমন এক 'শক্তি', যারা যুদ্ধ শুরু করে, আবার শান্তি সম্মেলনেও সই করে; যারা ধর্ম প্রচার করে, আবার ধর্মের নামে জাতি ধ্বংস করে; যারা গণতন্ত্রের বুলি শোনায়, আবার চোরাপথে একনায়কতন্ত্রকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়।

বিশ্ব একটি মঞ্চ, আর আমরাই সেই দর্শক– যাদের করতালি, নীরবতা কিংবা হতবাক চোখ কেউ দেখে না। তবে ইতিহাস সাক্ষী, প্রতিটি অন্ধকার শাসনের পতনের আগেই আসে এক প্রশ্ন– 'কে এই ছায়া?'

আমেরিকার বৈশ্বিক ভূমিকা শুধু একটি রাষ্ট্রের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ নয়, এটা এক সাম্রাজ্যবাদী চেতনার প্রতিনিধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে বিশ্বব্যাপী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে, 'ডেমোক্রেসি' রপ্তানির নামে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, ইরানকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো– কেন?

উত্তর: ব্যাংক, অস্ত্র ও জ্বালানি খাতের বৃহৎ কর্পোরেটদের মুনাফা, একক নিয়ন্ত্রণ এবং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার। যুদ্ধ মানে ঋণ, ঋণ মানে সুদ। বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে 'উন্নয়নের' নামে সুদখোর ফাঁদে ফেলা হয়, যার মূল নিয়ন্ত্রক এই ব্যাংকিং এলিট গোষ্ঠী।

রথচাইল্ড পরিবার ১৯১৩ সালে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছিল বলে বহু গবেষণায় দাবী করা হয়। এটা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক নয়, প্রাইভেট মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে সুদের মাধ্যমে আমেরিকার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পোপ বা যাজকগণ সরাসরি যুদ্ধ না করলেও, তারা 'ক্রুসেড', 'ইনকুইজিশন', 'মিশনারি রাজনীতি'-র মাধ্যমে অগণিত জনগোষ্ঠীকে নিজের মতো করে রূপান্তরিত করেছে। এদের অর্থায়নও অনেক সময় এসেছে একই উৎস থেকে– রথচাইল্ডদের কাছ থেকে।

একটা সময় ভ্যাটিকান নিজেদের অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ হিসেবে রথচাইল্ড ব্যাংককে ব্যবহার করত। এমন তথ্য বহু ঐতিহাসিক দালিলে পাওয়া যায়। ফলে ভ্যাটিকানের পবিত্র মুখোশের নিচে রয়েছে এক গাঢ় চুক্তি– ধর্মীয় আবরণে সাম্রাজ্যবাদ।

আমেরিকা চায় তেল, সৌদি চায় নিরাপত্তা। এর বিনিময়ে সৌদি আরব নিজের সমস্ত সম্পদ ও ধর্মীয় ভাবধারাকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে আটকে দেয়।

সৌদি পরিবার, ব্রিটিশ রাজনীতি ও সিআইএ– এই ত্রিধারা একসঙ্গে মিলে ইসলামী বিশ্বের 'মৌলিক চেতনা'-কে পুনর্গঠিত করে।

তেল বিক্রি ডলারেই করতে হবে– এই চুক্তির কারণে সৌদি রাজতন্ত্র আজও আমেরিকার পেট্রোডলার রাজনীতির হাতের পুতুল। আর এই পেট্রোডলার ব্যবস্থার মূলে? রথচাইল্ড প্রভাবিত আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং-ব্যবস্থা।

আমেরিকার যুদ্ধ, সৌদির তেল, ভ্যাটিকানের কূটনীতি– এই তিনটি শক্তি বাস্তবে এক দৃশ্যমান অস্তিত্ব, কিন্তু তাদের পেছনে রয়েছে এক অদৃশ্য মস্তিষ্ক! আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এলিট, যার পুরোধা রথচাইল্ড, ওয়রবার্গ, রকফেলার, গোল্ডম্যান স্যাচসের মতো পরিবার।

এই পরিবারগুলো– সরকারকে ঋণ দেয়, যুদ্ধ অর্থায়ন করে এবং ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখে।

তারা কারও কথিত বন্ধু নয়, কারও কথিত শত্রুও নয়, তারা শুধু ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। অর্থ, ভয়, বিশ্বাস– এই তিন অস্ত্রের মালিক তারাই। একে বলা যায়, 'তিন রাজত্ব, এক ছায়া'।

ঔপনিবেশিক যুগে শারীরিক দখল ছিল উপনিবেশের মূল কৌশল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন রাজনৈতিক মুক্তির ঢেউ উঠল, তখন দখলের ধরণও পালটে গেল। শারীরিক শৃঙ্খল ভেঙে গেলেও মুসলিম সমাজ এখনো মুক্ত হয়নি মানসিক শৃঙ্খল থেকে। এটা এক নতুন উপনিবেশ। মানসিক উপনিবেশ, যেখানে কূটনৈতিক কৌশল, ধর্মীয় বিভ্রান্তি, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং তথ্যের জাল দিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্বকে এক অপার শূন্যতায় বন্দী রাখা হয়েছে।

ভ্যাটিকান ও পশ্চিমা সেক্যুলার চিন্তাধারার সহযোগিতায় ইসলামের মূল শাশ্বত চিন্তা– তাওহীদ, খিলাফাহ, জিহাদ, উম্মাহর সংহতি। এসবকে ধীরে ধীরে 'বিতর্কিত' কিংবা 'উগ্রবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামকে 'শুধু নামাজ-রোজার ধর্ম' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চেতনা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। এই ধরণের উপস্থাপনা তৈরি করেছে 'আধ্যাত্মিক মুসলিম, নিষ্ক্রিয় নাগরিক'।

সৌদি অর্থায়নে নির্দিষ্ট ধাঁচের ইসলাম বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যার মধ্যে নেই– খিলাফাহর স্বপ্ন, রাজনৈতিক প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা।

এই কথিত মতবাদ শুধু আদব ও আচরণ শেখায়, প্রতিবাদ নয়। তেল-অর্থনীতির বিপরীতে তারা মুসলিম বিশ্বের সম্ভাবনাময় অর্থনীতিকে দমিয়ে রাখে, যেন আন্তর্জাতিক চক্রের বিকল্প না গড়ে ওঠে।

আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া– প্রত্যেকটিই উদাহরণ, কীভাবে একটার পর একটা মুসলিম ভূখণ্ডে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে স্থানচ্যুত করা হয়েছিল মুসলিম নেতৃত্বকে, ধ্বংস করা হয়েছে আত্মবিশ্বাস, তৈরি করা হয়েছে "মুসলমান মানেই জঙ্গি"– এই স্টেরিওটাইপ।

এই সামরিক নাটকের পেছনে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এলিটই কৌশল রচনা করে, আর আমেরিকা মঞ্চে তাদের 'মেরিন'।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক, থিঙ্কট্যাংক, স্কলারশিপ প্রোগ্রাম সবকিছু ব্যবহার করে এই বার্তা প্রতিষ্ঠা করা হয়—"ইসলাম মানে শান্তি, প্রতিবাদ মানে উগ্রতা"– অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী কোনো মিথ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তা উগ্রবাদ; সত্য মিথ্যা যেটাই হোক চুপ থেকে শান্তি বজায় রাখতে হবে!! এভাবে প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার আড়ালে মুসলিম চিন্তাবিদদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এর দরুন আজকের বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষিত মুসলমান অনেক সময় কোরআনের জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতকেই অস্বীকার করে বসে। এটাই মানসিক উপনিবেশের সর্বোচ্চ সাফল্য।

CNN, BBC, Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok– এইসব প্ল্যাটফর্ম দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এমন এক কাল্পনিক বাস্তবতা, যেখানে ইসলামীক সংস্কৃতি ও পোশাককে পশ্চাৎপদ ও 'কঠোর' হিসেবে দেখানো হয়। ‘মডারেট মুসলিম’ মানেই পশ্চিমা ধাঁচে চিন্তা করা, পশ্চিমা ধাঁচে পোশাক পরা, পশ্চিমা ধাঁচে জীবনযাপন করা, আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে পুরাতন বলে আধুনিকতার নামে নিজেদের মতো পরিবর্তন করা, নাউজুবিল্লাহ!!

এখানে মুসলিম চেতনাকে নয়, তার সেলফ-ইমেজকেই আক্রমণ করা হয়। উম্মাহর ধারণাকে ভেঙে দিয়ে কৃত্রিম জাতীয়তাবাদের পরিচয়ে প্রতিটি মুসলিমকে আলাদা

করে দেওয়া হয়েছে ইরানী শিয়া, সৌদি সুন্নী, তুর্কি মুসলিম এবং বাংলাদেশি/ বাঙালি মুসলমান ইত্যাদি জাতীয়তাবাদে।

এই বিভাজন একটিই লক্ষ্য নিয়ে। তা হলো, মুসলিমরা যেন আর কখনো একটি গঠনমূলক ঐক্যে আসতে না পারে। এক হয়ে যেন খেলাফত শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে না পারে। মতবাদ বা আকিদার ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বে যত বিভাজন, তা আর কোনো ধর্মে তেমন দেখা যায় না। এই আকিদার সংঘর্ষেই মুসলিমরা বিশ্বনেতৃত্বের মসনদ হারা হয়েছে। ইতিহাসের অপ্রিয় সত্য তাই বলে।

আজকের মুসলিমদের সবচেয়ে বড় সংকট, চেতনার দখল। শারীরিক দখল থেকে মুক্ত হলেও আমরা এখনো চক্রের হাতে পরিচালিত ব্যাংকিং উপনিবেশে বন্দী। এর পেছনের মূল কুশীলব– আন্তর্জাতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকিং এলিট। তারা বোঝে, ইসলামীক অর্থনীতি ও খিলাফাহ-চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটলে তাদের সাম্রাজ্য কেঁপে উঠবে। তাই এই চেতনার পুনর্জাগরণই মানসিক উপনিবেশ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

ঔপনিবেশিক যুগে শারীরিক দখলই ছিল উপনিবেশের মূল কৌশল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতার মর্যাদা ফিরে আসতে শুরু করে, তখন দখলের ধরণ রূপান্তরে মুখ্য করে ওঠে মানসিক উপনিবেশ। এখানে কূটনৈতিক কৌশল, ধর্মীয় বিভ্রান্তি, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং তথ্যের জালের মাধ্যমে গোটা মুসলিম বিশ্বকে এক বিশেষ ধরণের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে।

সৌদি-ভ্যাটিকান সম্পর্ক: গোপনীয়তা ও কূটনৈতিক বোঝাপড়া

ভ্যাটিকান ও সৌদি আরব কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে একে অপরকে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করে না। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকে সৌদি আরবের প্রভাবশালী যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে নানা সময়ে দেখা গেছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিত। বর্তমান পোপ লিও চতুর্দশ-এর সাথে সেই ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে।

ঘটনার ধারাবিবরণ

২০১৮ সালের ৩০শে নভেম্বর-১লা ডিসেম্বর তারিখে, রিয়াদে প্রথমবারের মতো খোলামেলা (open) কপ্টিক মিসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটা একটি বাড়িতে (private setting) আয়োজিত হয়েছিল, যেখানে কপ্টিক বিশপ Ava Morkos

(Shobra Al-Kheima, Egypt থেকে) ধর্মীয় এই সেবা পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠানে রিয়াদে কর্মরত প্রায় কয়েক ডজন কপ্টিক উপস্থিত ছিলেন এবং মিশরীয় দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।

উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, ২০১৮ সালে সৌদি আরবে ধর্মীয় পুলিশ (Committee for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice) প্রথমবারের মতো খ্রিষ্টান ধর্মীয় সেবা (publicly/private) পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং এই Coptic Mass ছিল প্রথম 'documented Christian service.'

আরবে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের প্রবেশের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে (যেমন: The Guardian, Reuters) ২০১৮ সালে সৌদি আরবে কিছু খ্রিষ্টান ধর্মযাজককে আমন্ত্রণ জানানো এবং গোপনে খ্রিষ্টান উপাসনালয় পরিচালনার অনুমতি দেওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

২০১৯ সালে পোপ ফ্রান্সিসের আবুধাবি সফর: খ্রিষ্টানদের ইতিহাসে প্রথম কোনো পোপ আরব উপদ্বীপ সফরে যান। সেখানে 'Human Fraternity Document'-এ স্বাক্ষর করেন তিনি এবং আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম আহমদ আল-তাইয়্যেব। (এ বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য সামনের অধ্যায়ে পেয়ে যাবেন।)

ভ্যাটিকান ও সৌদি প্রতিনিধিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংলাপ: সৌদি আরবের ইসলামীক অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির বিভিন্ন প্রতিনিধি ইতালিতে যেয়ে ধর্মীয় সহাবস্থানের নামে কয়েকটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এসব 'ইন্টারফেইথ ডায়ালগ' গোপন ধর্মীয় দখলদারির হাতিয়ার।

আমেরিকা: মোড়লের ভূমিকায় একাধিক মাস্ক

আমেরিকা বিশ্বের বহু দেশে গণতন্ত্রের কথা বলে সামরিক হস্তক্ষেপ চালালেও সৌদি আরবের একনায়কতন্ত্র ও ভ্যাটিকানের কুসংস্কারবাদে কোনো আপত্তি তোলে না। তারা এই দুই শক্তিকে সমর্থন দেয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে। সৌদির তেল বিক্রয় শুধু ডলারে (পেট্রোডলার সিস্টেম) আমেরিকার বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের মেরুদণ্ড এই চুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে।

ভ্যাটিকান ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত আমেরিকান কর্পোরেশন ও রাজনীতিবিদদের অর্থ লেনদেন একাধিক রিপোর্টে ফাঁস হয়েছে ভ্যাটিকান ব্যাংক অব লাতেরান-এর সাথে যুক্ত কিছু আমেরিকান রাজনীতিকের কালো টাকা লেনদেন।

এই উপনিবেশ শুধু ভূখণ্ড নয়, হৃদয় ও মগজের ইসলামী আদর্শকে ধ্বংস করে, পশ্চিমা উপসর্গ ও সংস্কৃতির অনুকরণে এক প্রজন্মকে তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য।

এই তিন রাজত্বের তলদেশে এক অভিন্ন শেকড় ব্যাংকিং এলিট। এই গোষ্ঠী বিশ্বযুদ্ধ, ধর্মীয় ফ্যাসাদ, তেল সংকট, ও অর্থনৈতিক মন্দা, সবকিছুর পেছনে ছায়া সরকার হিসেবে কাজ করে। পেট্রোডলার, সুদভিত্তিক অর্থনীতি, অস্ত্র বাণিজ্য ও ধর্মীয় বিভ্রান্তি এদের হাতিয়ার।

এই এলিট গোষ্ঠী একদিকে আমেরিকাকে সামরিক কাঁধ বানায়, অপরদিকে সৌদি আরবকে ইসলামীক ভাবধারার নিয়ন্ত্রক বানায়, আর ভ্যাটিকানকে ব্যবহার করে ধর্মীয় ও গোপন ঐতিহ্যকে পুঁজি করে জনগণের মগজ ধোলাই করে। এইভাবে একক শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নব্য উপনিবেশবাদ। যাকে আমরা দেখছি তিনটি আলাদা মাস্ক পরে।

ব্যঞ্জনবর্ণ

এটাই সেই অর্থনৈতিক দাসত্ব, যা আমরা আজও ঠিকভাবে বুঝতে পারি না। আমরা ভাবি, IMF আর World Bank গরিব দেশের জন্য কাজ করে। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানি না এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পিছনেও সেই রথচাইল্ডের ছায়া!

আমরা বুঝতে পারিনি, যারা ব্যাংক তৈরি করে, তারাই আসলে রাষ্ট্র তৈরি করে। আর সেই ব্যাংক গঠনের নেপথ্য খল-নায়কের নাম– রথচাইল্ড।

এটাই রথচাইল্ডদের পরিচয়। একটি পরিবার, যারা রাজ্য তৈরি করেনি, কিন্তু রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। যুদ্ধ শুরু করেনি, কিন্তু যুদ্ধ থেকে মুনাফা করেছে। ইতিহাস লেখেনি, কিন্তু ইতিহাসকে চালনা করেছে।

এই পরিবার কি এখনও বর্তমান? তারা আরও পরিণত হয়ে আজও নীরবে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক বিশ্বের পেছনের ছায়ায়?

তাদের উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে যেমন অর্থ, অন্যদিকে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। আর এদেরই মাধ্যমে সৃষ্টি হলো জাতিসংঘ, যা ইসরায়েল রাষ্ট্রকে অবৈধভাবে স্বীকৃতি দিতে সবকিছু কিছু করে গেল। খেলাফত শাসনব্যবস্থার পতনের পেছনেও ছিল রথচাইল্ড পরিবারের হাত। রাষ্ট্রের সংবিধান, সরকার, জাতিরাষ্ট্রের তত্ত্ব, সবই তাদের হাতের সৃষ্টি।

তারা একক নয়, একাধিক গোষ্ঠী মিলে, বিভিন্ন পরিবারের নাম নিয়ে বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য, এরা একাধিক গুপ্ত সংগঠনের জন্ম দেয়। যেমন: 'স্কাল অ্যান্ড বোনস', 'বোহেমিয়ান ক্লাব', 'নাইটস টেম্পলারস', 'ফ্রিম্যাসন', 'ইলুমিনাতি', 'বিল্ডারবার্গ' ইত্যাদি। আর তাদের ম্যাসোনিক ধর্মের আবির্ভাব ঘটে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য। টাকা ছাড়া, যে-কোনো পরিমাণ বুদ্ধি, বাহিনী, পরিকল্পনা এবং অস্ত্রের অধিকারী হতে হবে। এমনটাই ছিল তাদের দর্শন।

আমাদের বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলটি এর একটি ছোট উদাহরণ হতে পারে, যারা ভারতের সহায়তায় একে একে চারটি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিল। এর মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা এবং লোকবল সবই ছিল। অবশেষে এক রক্তক্ষয়ী সর্বাত্মক সংগ্রাম ও জনতার আত্মবলিদানের জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে সেই স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের লজ্জাজনক পতন হয়। নির্লজ্জ, বেহায়ার মতো পালিয়ে যায় ভারতে। সেইদিকে যাচ্ছি না।

বিংশ শতাব্দীতে রথচাইল্ডদের কর্মকাণ্ডে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তারা একসময় পর্দার আড়ালে চলে যায়, কিন্তু কেন? আমার মতে; সবকিছু দৃশ্যমান হলে তার মূল্য থাকে না। এক নামের প্রভাব বেশি সময় শক্তিশালী থাকে না। তাই তারা গোপনে, যুগান্তর ধরে নতুন নামে পৃথিবীকে আতঙ্কিত করে রেখেছে।

এভাবে তারা বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে নতুন ফর্মুলা বাস্তবায়ন শুরু করে। এরমধ্যে আছে 'ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক', যা ব্রিটেনের 'ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড' বা ফ্রান্সের 'সেন্ট্রাল ব্যাংক'-এর আদলে তৈরি হয়, কিন্তু এটা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। ফেডারেল রিজার্ভ ১৯১৩ সাল থেকে দুনিয়ার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে, এবং তারা মার্কিন ডলারের প্রস্তুতকারী।

ডারেল রিজার্ভের অন্যতম হর্তাকর্তা ছিল পল ওয়ারবুর্গ, যিনি রথচাইল্ড পরিবারের গোপন এজেন্ট ছিলেন। বর্তমানে, পৃথিবীর সমস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক BIS (The Bank for International Settlements) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর নীতিনির্ধারকও রথচাইল্ড।

এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে, রথচাইল্ড পরিবার একে একে জনগণের শত্রু হয়ে ওঠে। ইউরোপে তখন প্রচলিত ছিল অ্যান্টি-সেমিটিজম বা ইহুদীবিদ্বেষ, যেখানে প্রায় সব দেশের অর্থনীতিই ইহুদীদের দখলে ছিল। তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশে, যেমনটা হিটলারের 'মাইন কাম্ফ' বইয়ে বর্ণিত ছিল, সাধারণ জনগণ কখনোই জমিদার বা মোড়লদের পছন্দ করে না, তা সে যতই দয়ালু হোক না কেন। যদিও বলা হয় হিটলার ৬০ লাখ ইহুদী হত্যা করেছিল। এটা হলো একটা গুজব! এর তেমন কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। তবে এই ৬০ লাখ বলার পেছনে ছিল গভীর এক ষড়যন্ত্র! সেই বিষয়ে পরে আলাপ করা যাবে।

তবে, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক বিষয়ক একটা আলাপ করে নেওয়া জরুরি।

'টাইটানিক' আসলেই টাইটানিক ছিল না কি 'অলিম্পিক' ছিল?

'টাইটানিক' নাম সবার শোনা হয়েছে। এমন কোনো মানুষ বাংলাদেশে নেই, যিনি 'টাইটানিক' নাম শোনেননি। টাইটানিক কী আসলেই ডুবে গেছিল, না কি কোনো ষড়যন্ত্র ছিল? চলুন এ বিষয়ে জানা যাক। ধরে নিন এটাও একটা কাল্পনিক গল্প! এই ঘটনা অবতারণার আগে মোটাদাগে জেনে নিতে হবে যে প্রথমত; 'টাইটানিক' আসলেই টাইটানিক ছিল না কি 'অলিম্পিক' ছিল?

তার আগে চলুন টাইটানিক সৃষ্ট থেকে শুরু করে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত খুটিনাটি বিষয়গুলো অতি সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক–

শুরুটা ছিল গর্বে গরিমায়, শেষটা শুধুই কান্না আর কুয়াশা

বিশ শতকের গোড়ার দিকে, এক জাহাজকে ঘিরে পুরো পৃথিবী যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এমন জাহাজ, যার নির্মাতারা বলেছিলেন– "স্বয়ং ঈশ্বরও এটাকে ডুবাতে পারবেন না!" (নাউজুবিল্লাহ) সেই জাহাজই মাত্র চার দিনের মাথায় আটলান্টিকের গহীন নীল পানিতে তলিয়ে গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ট্র্যাজেডি খুব কমই দেখা গেছে, যেটা একদিকে প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক আবার অন্যদিকে মানব অহংকারের গায়ে সজোরে আঘাত হানে। জাহাজটির নামকরণ করা হয়েছিল- **আর.এম.এস. টাইটানিক**।

অদম্য বিশ্বাস আর অপূর্ব নির্মাণ

'টাইটান' ছিল গ্রিক পুরাণের এক সৃষ্টিশীল ও শক্তিশালী দেবতা। সেই দেবতার নামানুসারেই জাহাজটির নাম রাখা হয় **'টাইটানিক'**। কারণ; তাদের মতবিশ্বাস অনুযায়ী, টাইটান দেবতারা মহাজাগতিক শক্তির প্রাচীন প্রতীক।

গ্রিক পুরাণের প্রাচীন ইতিহাসে টাইটান দেবতারা এক অনন্য অধ্যায়। গ্রিক মিথলজি অনুযায়ী, তারা কোনো সাধারণ দেবতা ছিলেন না। তারা ছিলেন মহাশক্তির প্রতীক,

আকাশ-পাতাল কাঁপানো এক মহাসভ্যতার প্রতিনিধি। 'টাইটান' শব্দটি নিজেই বহন করে অপরিমেয় শক্তি ও বিস্তৃতির অর্থ, যা গ্রিক শব্দ **'Τιτάν'** থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ, 'অপ্রতিরোধ্য' বা 'আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি'।

টাইটানদের উৎপত্তি ঘটে আদিযুগে। যখন মহাবিশ্বের শাসন ছিল আদি দেবতা উরানুস (আকাশ) ও গাইয়া (পৃথিবী)-র হাতে। এই দুই শক্তির মিলনে জন্ম নেয় বারোটি টাইটান, ছয় ভাই এবং ছয় বোন। তাদের মধ্যে ছিলেন ক্রোনোস, ওশেনাস, হাইপেরিয়ন, ইয়াপেটাস, কোইয়াস, ক্রায়োস এবং থিয়া, রিয়া, ফোয়েবে, থেমিস, টেথিস, ও মনে মোসিনাই (নয়জন মিউজ)। এই টাইটানদের প্রত্যেকে প্রকৃতির একেকটি মৌলিক শক্তির রূপকার ছিলেন।

সেই এখান থেকেই এই জাহাজের নামকরণের কারণ। অর্থাৎ টাইটানরা অপ্রতিরোধ্য অতএব; টাইটানিকও তাই হবে। তাদের ধারণা টাইটান দেবতারা সর্বক্ষণ তাদের সহযোগিতা করবে। মৌলিক শক্তির রূপকাররা তাদের নামকে রক্ষা করবে। টাইটানরা মহাবিশ্বের শাসকের সাথে লড়াই করেছিল। এই জাহাজও তাই করবে। পুরো নাম **Royal Mail Steamer Titanic**। এটা শুধু একটি প্রমোদতরী ছিল না, ছিল শিল্প, শক্তি ও শৌর্যের প্রতীক। নির্মাণ শুরু হয় ১৯০৭ সালে, শেষ হয় ১৯১২ সালে। ব্রিটিশ শিপিং কোম্পানি **হোয়াইট স্টার লাইন**-এর অধীনে, ৬০ হাজার টনের দৈত্যাকার এই জাহাজটি ছিল ২৭৫ মিটার দীর্ঘ, নির্মাণ ব্যয় ৭.৫ মিলিয়ন ডলার।

নকশা এমনই নিখুঁত, জাহাজটি চারটি পানি-প্লাবিত কম্পার্টমেন্ট নিয়েও ভেসে থাকতে পারত। ডিজাইনার **থমাস অ্যান্ড্রুজ** বলেছিলেন, "এ জাহাজ ডোবার প্রশ্নই ওঠে না।" হয়তো সেই আত্মবিশ্বাসই ছিল টাইটানিকের প্রথম ভুল পদক্ষেপ।

যাত্রা শুরু: উৎসবমুখর শুরু, অনিশ্চিত শেষ

১৯১২ সালের ১০ই এপ্রিল, সাউদাম্পটন বন্দর থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করে টাইটানিক। যাত্রী সংখ্যা প্রায় ২২০০, সঙ্গে কয়েকশ কর্মী। প্রথম শ্রেণির ভাড়া ছিল ৩১০০ ডলার, তৃতীয় শ্রেণির মাত্র ৩২ ডলার। টাইটানিকে চড়ার বিষয়টি ছিল সম্মানের, এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হবার উত্তেজনায় মুখর। বন্দরে জড়ো হয়েছিল হাজারো দর্শক। সাইরেন বাজিয়ে যাত্রা শুরু করল 'অদম্য টাইটানিক'।

প্রথম তিন দিন ছিল স্বপ্নের মতো। বিলাস, আমোদ আর আত্মবিশ্বাসে ডুবে ছিল যাত্রীরা। কেউ জানত না, চতুর্থ দিনেই শুরু হবে দুঃস্বপ্নের এক অধ্যায়।

১৪ই এপ্রিল: মৃত্যুর দূতের আগমন

সেদিন দুপুরে 'Amerika' নামের একটি জাহাজ রেডিয়োর মাধ্যমে সতর্ক করে, টাইটানিকের সামনে বিশাল একটি আইসবার্গ। এরপর 'Mesaba' নামক আরেকটি জাহাজও একই বার্তা পাঠায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, টাইটানিকের রেডিয়ো অপারেটর জ্যাক পিলিপস ও হ্যারল্ড ব্রিজ সেই বার্তাগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে পাঠাননি।

ডুবির মাত্র ৪০ মিনিট আগে Californian জাহাজ থেকেও বার্তা আসে, কিন্তু ক্লান্ত পিলিপস রাগ করে সেই যোগাযোগ কেটে দেন। ভুল বোঝাবুঝি, অবহেলা আর অহংকার। এ তিনেই ফাটল ধরতে শুরু করে প্রযুক্তির অদম্য দেওয়ালে।

সংঘর্ষ: শান্তির সমুদ্রে নেমে এলো মৃত্যু

রাত ১১:৪৫, আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু চাঁদ নেই। হিমেল বাতাস আর অন্ধকারের মধ্যে আচমকা নজরে আসে বিশাল এক আইসবার্গ। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড স্মিথ তৎক্ষণাৎ গতিপথ ঘোরানোর নির্দেশ দেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আইসবার্গের আট ভাগের এক ভাগ থাকে পানির ওপরে, যা দেখা যায়, বাকি অংশ থাকে অদৃশ্য মৃত্যুর মতোই সাগরতলে।

জাহাজের ডান পাশে ভয়াবহ ঘর্ষণ হয়, প্রায় ৯০ মিটার জুড়ে চিড় ধরিয়ে দেয় সেই বরফখণ্ড। পানিরোধী ১২টি দরজাও ব্যর্থ হয়ে পড়ে, পানি ঢুকে পড়ে পাঁচটি কম্পার্টমেন্টে।

রাত ১২টার পর লাইফবোট নামানো শুরু হয়। কিন্তু মোট ছিল মাত্র ১৬টি! প্রত্যেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ছুটছে, কিন্তু আগে মহিলা ও শিশুরা– এই আদেশেই অনেক পরিবার ভেঙে যায়। জাহাজের আলো নিভে যায় ঠিক ডুবে যাওয়ার আগ মুহূর্তে, চারপাশ নিস্তব্ধ। রাত ২:২০ মিনিটে টাইটানিক সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

নিকটতম জাহাজ দি কারপাথিয়া পৌঁছাতে পেরেছিল রাত ৪:১০ মিনিটে। জীবিত ছিলেন মাত্র ৬৮৭ জন।

৭৩ বছর পর, ১৯৮৫ সালে সমুদ্রতলের প্রায় ১৩,০০০ ফুট নিচে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান রবার্ট বালার্ড। ছোটবেলায় যার স্বপ্ন ছিল এই জাহাজ খুঁজে বের করা। তিনি সফল হন, কিন্তু রহস্যের জট খুলে যায়নি।

১৯৯৭ সালে জেমস ক্যামেরুন পরিচালিত 'Titanic' সিনেমা মুক্তি পায়। ২০০ মিলিয়ন বাজেটের এই ছবি আয় করে ১.৮৩৫ বিলিয়ন ডলার! জয় করে ১১টি অস্কার, ৭৬টি পুরস্কার, আর কোটি কোটি দর্শকের হৃদয়।

"Look on my works, ye Mighty, and despair!"– ওজিম্যান্ডিয়াস, শেলি।

টাইটানিক আজও ডুবে আছে, কিন্তু তার গল্প ভেসে বেড়ায় সমুদ্রের ঢেউয়ে, মানুষের মনে আর ইতিহাসের পাতায়।

অভিশাপ? দুর্ঘটনা? না কি পরিকল্পিত ধোঁকা?

ডুবির পর থেকেই একে ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক। অনেকে বলেন, টাইটানিক ছিল অলিম্পিক জাহাজের ছদ্মবেশ, একটি ইন্স্যুরেন্স স্ক্যাম! আবার কেউ বলেন, জাহাজে ছিল এক অভিশপ্ত মমি, যাকে নিয়েই ঘটে এই দুর্ঘটনা।

রহস্য আরও ঘনীভূত হয় জাহাজের নম্বর ৩৯০৯০৪ নিয়ে। পানিতে এর প্রতিফলনে নাকি দেখা যায় 'NO POPE'– তৎকালীন ধর্মপ্রাণ ইউরোপবাসীদের মধ্যে তা সৃষ্টি করেছিল কল্পিত অভিশাপের আতঙ্ক।

আর সবচেয়ে বিস্ফোরক দাবী আসে সেকেন্ড অফিসার চার্লস লাইটোলার-এর পরিবারের পক্ষ থেকে। তার নাতনি লেখক লুইস প্যাটার্ন জানিয়েছেন, ভুল দিকনির্দেশ deliberately দেওয়া হয়েছিল। একটি গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেই পরিকল্পিতভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল টাইটানিককে।

কী ছিল সেই গোপন বৈঠকের পরিকল্পনা? ষড়যন্ত্র কী ছিল? কেন এত প্রাণহানি ঘটানো হলো? উত্তরগুলো খুঁজতে বিতর্কিত কিছু বিষয়াবলি জেনে নিতে হবে। টাইটানিক কী আসলেই অলিম্পিক ছিল?

এই দাবী প্রথম আসে কিছু বিকল্প ইতিহাসবিৎ বা ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে, যেমন: Robin Gardiner-এর বই 'Titanic: The Ship That Never Sank?'

তাদের মতে; White Star Line কোম্পানি দুইটি প্রায় অভিন্ন জাহাজ বানায়– 'Olympic' এবং 'Titanic.' ১৯১১ সালে 'Olympic' দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিমা সংস্থা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তাত্ত্বিকদের মতে, 'Titanic'-এর নামে মূলত 'Olympic'-কে রঙ করে আবার সমুদ্রে পাঠানো হয়, পরিকল্পিতভাবে ডুবানোর জন্য, যাতে বিমার টাকা পাওয়া যায়।

প্রমাণের দাবী হিসেবে যা বলা হয়: Titanic-এর কিছু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য Olympic-এর সাথে বেশি মিল ছিল। কিছু সার্ভিস রিপোর্টে এবং জীবিত যাত্রীদের বর্ণনায় কিছু অমিল ধরা পড়ে। বিমা (Insurance) নীতিতে Titanic-এর বিমার অঙ্ক রহস্যজনকভাবে বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু, মূলধারার ইতিহাসবিৎরা মনে করেন: Titanic ও Olympic-এর ভেতরের নকশা ও নির্মাণগত ফারাক ছিল, যা বহু চাক্ষুষ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত। Titanic ডুবেছিল একটি আইসবার্গের আঘাতে এবং জাহাজের নির্মাণকর্মী, প্রকৌশলী ও উদ্ধার অভিযানের বিবরণেও কোনো 'জাহাজ বদলের' ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

ফেডারেল রিজার্ভ' প্রতিষ্ঠার সাথে টাইটানিক ডুবির সম্পর্ক?

মূল দাবী; ১৯১২ সালে টাইটানিকে কয়েকজন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন যারা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকিং সিস্টেমের বিরোধী ছিলেন। যেমন: John Jacob Astor IV (বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি), Benjamin Guggenheim, Isidor Straus (Macy's departmental store-এর মালিক)।

এই তিনজনই টাইটানিক দুর্ঘটনায় মারা যান। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব অনুসারে, যারা ফেডারেল রিজার্ভ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন (বিশেষ করে Rothschild পরিবারের সাথে যুক্ত কিছু প্রভাবশালী ব্যাংকার), তারা চেয়েছিলেন এই বাধাগুলো সরিয়ে ফেলতে। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে খুব অল্প প্রতিরোধের মুখে ফেডারেল রিজার্ভ অ্যাক্ট পাশ হয়, মাত্র এক বছরের মধ্যেই।

আমি এখানে দুই মতের ঐতিহাসিকদের তথ্য সংযোজন করেছি। মূলধারার ঐতিহাসিকরা যা বলেছে তাও বললাম, স্রোতের বিপরীতে থাকা ঐতিহাসিকরা যা বলেছে তাও বললাম। এবার চলুন গহ্বরে প্রবেশ করা যাক।

১ম স্তর: টাইটানিক (বা অলিম্পিক) ধ্বংসের ছায়া পরিকল্পনা

১৯১২ সালের এপ্রিলে, RMS Titanic তার প্রথম যাত্রায় নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সবাই জানত, এটা "ডুবে যাবার অযোগ্য জাহাজ"। কিন্তু গোপনে এক অদৃশ্য পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল...... White Star Line কোম্পানির মূল নিয়ন্ত্রণ ছিল এক ধনকুবেরের হাতে: J.P. Morgan. Morgan ছিলেন Rothschild পরিবার ও ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং এলিটদের ঘনিষ্ঠ মিত্র।

Titanic-এর অভ্যন্তরে ছিল বিশ্বখ্যাত ধনকুবের John Jacob Astor IV, Isidor Straus এবং Benjamin Guggenheim– যারা সকলে যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Fed) গঠনের বিরোধী ছিলেন। ঠিক যাত্রার আগে অর্থাৎ জাঁকজমক এই যাত্রার জন্য যেখানে মানুষের হাহাকার ও আফসোস ছিল, সেই যাত্রাকে উপেক্ষা করে J.P. Morgan নিজে এবং আরও কিছু প্রভাবশালী ব্যাংকার অদ্ভুতভাবে টাইটানিকের যাত্রার ঠিক আগমুহূর্তে 'অসুস্থতার অজুহাতে যাত্রা বাতিল করেন।কিন্তু কেন জাহাজ ছাড়ার আগমুহূর্তে বিশেষ কয়েকজন যাত্রা বাতিল করল? কী ছিল এর আসল কারণ? এর সদুত্তর আজও কেউ দেয়নি।

২য় স্তর: ফেডারেল রিজার্ভ ও জায়োনিস্ট (Zionist) নীলনকশা

টাইটানিকের ধ্বংসের ঠিক ১ বছরের মধ্যেই ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৩ সালে The Federal Reserve Act কংগ্রেসে পাশ হয়। এটা ছিল একটি 'বেসরকারি' ব্যাংকিং সিস্টেম, যা আমেরিকার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ 'আঞ্চলিক ব্যাংকিং পরিবারগুলোর' হাতে তুলে দেয়। এই পরিবারগুলোর মধ্যে Rothschilds, Rockefellers, Kuhn Loeb & Co এবং Warburgs উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে অনেকেই সরাসরি জায়োনিস্ট আন্দোলন ও ভবিষ্যতের ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিল।

সুতরাং, ষড়যন্ত্রের থিওরি বলছে, টাইটানিকের ধ্বংস ছিল "economic coup d'état"– এক বিশ্বব্যাপী আর্থিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধীদের মুছে ফেলার গোপন অপারেশন!

৩য় স্তর: গভীর ষড়যন্ত্র: পর্দার আড়ালে যাদের নাম খুব কম আলোচিত হয়

আরও গা ছমছমে বিষয় হলো, Titanic দুর্ঘটনার তদন্তকার্য ছিল এমনভাবে প্রভাবিত, যাতে কারও দায় প্রমাণ করা না যায়। জাহাজের ত্রুটি, আইসবার্গের সতর্কবার্তা উপেক্ষা, জীবনরক্ষাকারী নৌকার কমতি, সবকিছু যেন পূর্ব-পরিকল্পনার অংশ মনে হয়। টাইটানিক দুর্ঘটনা শুধু দুর্ঘটনা নয়; ছিল এক বিশ্বব্যাপী আর্থিক দখলের জন্য নিখুঁত ছায়া-অপারেশন।

'টাইটানিক পরিকল্পনা'-এর মূল কুশীলব

Warburg ও Rothschild-দের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ:
Rothschild ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় শাখার প্রধানরা Warburg পরিবারকে জার্মানি থেকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনের জন্য।

Jacob Schiff-এর সোভিয়েত বিপ্লবে ভূমিকা:

Schiff প্রায় $২০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিলেন রুশ বিপ্লব (১৯১৭) সংগঠনে, রোমানোভ সাম্রাজ্য পতনের জন্য। কারণ; রোমানোভরা ছিল জায়োনিজমের বিরোধী।

মিল খুঁজে পাওয়া গেল কিছু? এবার একটু আমরা টাইটানিক জাহাজে ভ্রমণে চলে যাই, গল্পকারে সবিস্তারে জানা যাক।

টাইটানিক: ডোবা এক জাহাজ, না কি দাফন এক বিরোধী শক্তির?

'The Ship of Dreams'– একে এই নামে ডাকা হতো। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এ জাহাজের নাম আজ এক নিঃশব্দ কান্নার প্রতীক। তবে, প্রশ্ন জাগে সত্যিই কী এটা দুর্ঘটনা ছিল? না কি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার অর্থনৈতিক গুপ্তহত্যা?

- **প্রথম দৃশ্য: সমুদ্রের নীল শবদেহ**

১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল শেষে, ১৫ই এপ্রিলের প্রথম প্রহর। বঙ্গাব্দ বর্ষপঞ্জির অন্ত। বৈশাখ এসে দুয়ারে কড়া নাড়াচ্ছিল– বসন্তের বিদায়কালীন রজনী। নতুন কুঁড়ি, নতুন নক্ষত্র, নতুন প্রেম, নতুন ভাবনা, নতুন উন্মাদনা আর নতুন উচ্ছ্বাস– সবই ছিল। ঠিক এমন মুহূর্তে মাঝ-আটলান্টিকে ডুবে গেল বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জাহাজ– টাইটানিক। দেড় হাজারের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করল। বলা হলো, 'আইসবার্গ'-এর সাথে সংঘর্ষে জাহাজটি ছিন্নভিন্ন হয়ে ডুবে গেছে। বিশ্বের সংবাদপত্র কেঁপে উঠল। কিন্তু ইতিহাসের ছায়ায়, এক রহস্য জন্ম নিল– "টাইটানিক কী সত্যিই ডুবে গিয়েছিল, না কি ডোবানো হয়েছিল?"

চেহারার আড়ালে সত্তার লুকোচুরি

White Star Line নামক কোম্পানি দুটি প্রায় অভিন্ন জাহাজ নির্মাণ করেছিল– Olympic ও Titanic. Robin Gardiner-সহ বেশ কিছু বিকল্প ইতিহাসবিৎ বলছেন, ১৯১১ সালে Olympic দুর্ঘটনায় পড়ে এবং ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

ঠিক তখনই নাকি তৈরি হয় এক ভয়ংকর পরিকল্পনা: Titanic-এর নামে Olympic-কে রঙ করে, নকশায় খানিক পরিবর্তন এনে, সমুদ্রে পাঠানো হয়। এক পরিকল্পিত 'দুর্ঘটনা' হিসেবে। এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য; বিমা প্রতারণা করে অর্থ উদ্ধার, ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের বিরোধীদের চিরতরে সরিয়ে ফেলা।

• যাদের মৃত্যু জরুরি ছিল

টাইটানিকের যাত্রীদের তালিকায় দেখা যায়: John Jacob Astor IV– সেই সময়কার অন্যতম ধনকুবের ও ফেডারেল রিজার্ভের প্রকাশ্য বিরোধী। Benjamin Guggenheim– শিল্পপতি ও ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয়-ব্যবস্থার বিরোধিতা করতেন, Isidor Straus– Macy's-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা, একজন স্পষ্টভাষী অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী। এই তিনজনই টাইটানিক দুর্ঘটনায় মারা যান।

• পরবর্তী বছরেই কী সব বদলে যায়?

মাত্র এক বছরের মাথায়, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১৩ সালে, The Federal Reserve Act পাশ হয়। যার ফলে আমেরিকার মুদ্রানীতি, সুদ ও ব্যাংকিং-ব্যবস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যায় একটি বেসরকারি গোষ্ঠীর হাতে। কোনো সরকার বা জনগণের অধিকার ছিল না এসব প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপের। এই 'গোষ্ঠী' কারা? Rothschilds, Warburgs (Paul Warburg ছিলেন ফেডারেল রিজার্ভ অ্যাক্টের স্থপতি।), Rockefellers, Kuhn, Loeb & Co. (Jacob Schiff ছিলেন শীর্ষ নিয়ন্ত্রক।).

অদ্ভুতভাবে, এই নামগুলোই পরে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা, সোভিয়েত বিপ্লব, দুই বিশ্বযুদ্ধের অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

• একটি বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র?

অনেক গবেষক দাবী করেন, Titanic দুর্ঘটনা ছিল প্রকৃতপক্ষে "economic coup d'état" অর্থাৎ একটি ষড়যন্ত্রমূলক অর্থনৈতিক বিপ্লব। এতে পৃথিবীর অন্যতম ধনী ও মুক্তচিন্তক কিছু ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ; তারা ছিল Zionist banking agenda-এর সবচেয়ে বড় বাধা। Titanic ডুবিয়ে সেই প্রতিরোধকে শেষ করে দেওয়া হয়।

• সঙ্কেত ও নিদর্শন:

Titanic জাহাজে লাইফবোট ছিল অনেক কম, এমনকি জাহাজের ধারণক্ষমতার অর্ধেকও নয়। সাবধানবাণী থাকা সত্ত্বেও, জাহাজের গতি কমানো হয়নি। কিছু বেঁচে যাওয়া যাত্রী পরবর্তীতে জানিয়েছিলেন, জাহাজে আগেই ক্ষতি ছিল, যেটা Olympic-এর দুর্ঘটনার সাথে মিলে যায়। বিমার পরিমাণ আগেই বৃদ্ধি করা হয়েছিল রহস্যজনকভাবে।

- **প্রশ্নের জন্ম**

কেন একই সময়, একই পথে, একই জাহাজে তিনজন বিত্তবান ফেড-বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন? কেন মালিক ও শীর্ষ ব্যাংকারগণ যাত্রা বাতিল করলেন একযোগে? কেন মাত্র এক বছরের মধ্যে এত বড় আর্থিক আইন পাস হলো মাত্র কয়েকজনের অনুমোদনে?

- **সমাপ্তি না শুরু?**

Titanic-এর দুর্ঘটনা ছিল না শুধু একটি সমুদ্রযাত্রার সমাপ্তি। এটা ছিল বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রথম রক্তাক্ত অধ্যায়। ছিল অবৈধ ইসরায়েল গড়ার এক গভীর ষড়যন্ত্র। এর পেছনে ছিল একদল লোক, যারা চেয়েছিল এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যেখানে সরকার থাকবে লোক দেখানো, কিন্তু আসল শাসন থাকবে কিছু পরিবার, কিছু ব্যাংক, কিছু ছায়া-প্রতিষ্ঠানের হাতে।

এই গল্প এখনও শেষ হয়নি। কারণ; ফেডারেল রিজার্ভ আজও সেই ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। Titanic ডুবে যায়, কিন্তু এক নতুন সাম্রাজ্য ভেসে ওঠে।

> "যে ইতিহাস জানে না, সে সেই ইতিহাস পুনরায় ভোগ করবে। আর যে ইতিহাস বোঝে, সে বুঝে যাবে– সবকিছু কাকতালীয় নয়, গভীর পরিকল্পনা।"

এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করা শুধু ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক গঠন করায় উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য অন্যকিছু ছিল! সেই উদ্দেশ্য জানার আগ্রহ বর্তমান সংবরণ করে, আমরা ফেড নিয়ে কিছু কথা জেনে নিই।

দাসের স্বপ্ন ও শাসকের ব্যাংক: (The Federal Reserve & The Hidden Masters)

"আর্থিক সন্ত্রাস যে বোমা বা বন্দুক দিয়ে হয় না, তা বুঝতে আমেরিকানদের সময় লেগে গিয়েছিল একশ বছর।"

১৯১৩ সাল। বড়দিনের ঠিক আগের দিন। যখন বেশিরভাগ সিনেটর-সদস্য ছুটিতে চলে গেছেন, তখন মার্কিন কংগ্রেসে একটি আইন পাশ হয়ে গেল একপ্রকার গোপনে– The Federal Reserve Act।

এই আইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং-ব্যবস্থা 'ফেডারেল রিজার্ভ' প্রতিষ্ঠা করে, যেটা শোনায় সরকারি, কিন্তু বাস্তবে এটা একটি বেসরকারি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন। যাকে অনেকেই হাইব্রিড হিসেবে বলে থাকে।

- **কী ছিল এই আইনের ভিতরে লুকানো?**

আমেরিকার অর্থনীতি এখন থেকে আর সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। মুদ্রা ছাপানো, সুদের হার নির্ধারণ, ব্যাংক ঋণের শর্ত– all under the control of Federal Reserve Board, যার শীর্ষ সদস্যরা নিযুক্ত হয় ব্যাংকিং এলিটদের পরামর্শে।

- **কারা এই এলিট?**

কীভাবে মাত্র কয়েকটি ইহুদী ব্যাংকিং পরিবার আস্তে আস্তে পুরো পৃথিবীর অর্থনীতিকে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত করল।

Napoleonic যুদ্ধের সময় তারা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, জার্মানি– সব দেশের যুদ্ধ খরচের দায় নেয়। অর্থাৎ উভয়পক্ষকে ঋণ দিয়ে যুদ্ধের পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করে। যুদ্ধ জিতুক বা হারুক– Rothschild পরিবার লাভবান হবেই। এই বিষয়ে আগের পাতায় জেনেছেন।

১৮শ শতাব্দীতে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম 'ফেডারেল রিজার্ভের ভিতরে বীজ রোপণ' শুরু করে। তাদের নেটওয়ার্ক ইউরোপীয় ব্যাংক থেকে ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকায়।

Kuhn, Loeb & Co. এবং Jacob Schiff

এই নামটি সাধারণ ইতিহাসের বইতে নেই। কিন্তু Schiff ছিলেন একজন banking tactician, যিনি Rothschild পরিবারের পক্ষ থেকে আমেরিকায় অর্থনৈতিক উপনিবেশ গড়ে তোলেন।

তিনি ছিলেন: Rockefeller Standard Oil-এর আর্থিক পৃষ্ঠপোষক, রাশিয়ায় বোলশেভিক বিপ্লবে ২০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নকারী এবং Federal Reserve গঠনের অন্যতম নেপথ্য উদ্যোক্তা।

Paul Warburg: একজন জার্মান, যিনি আমেরিকার অর্থনৈতিক মস্তিষ্ক লিখে দিলেন

Warburg ছিলেন Rothschild-বংশজাত জার্মান ব্যাংকার, যাকে আমেরিকায় এনে ফেডারেল রিজার্ভ গঠনের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

তিনি নিজেই কংগ্রেসে একাধিক শুনানিতে বলেন–

> "America needs a central bank controlled by independent experts, not politicians."

তবে সেই 'independent experts' কারা হবেন, তা কখনো বলা হয়নি। বাস্তবে, তা হয়ে ওঠে Zionist-linked financial families-এর গোপন নিয়ন্ত্রণে।

Jekyll Island Meeting: ষড়যন্ত্রের গোপন জন্মভূমি:

১৯১০ সালে জর্জিয়ার Jekyll Island-এ মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে গোপন অর্থনৈতিক বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন: Nelson Aldrich (রকফেলারের আত্মীয়), Paul Warburg, Frank Vanderlip (National City Bank), Henry Davison (J.P. Morgan প্রতিনিধি) এবং আরও কয়েকজন ব্যাংকিং অভিজাত। তারা একত্র হয়ে রচনা করেন 'Aldrich Plan', যা পরবর্তীতে রূপ নেয় 'Federal Reserve Act'-এ।

কে নিয়ন্ত্রণ করে Fed?

একটি প্রশ্ন সবসময় গোপনে রাখা হয়– ফেডারেল রিজার্ভ কি রাষ্ট্রীয়? না। Fed-এর শেয়ারের মালিক হয় ১২টি আঞ্চলিক 'ব্যাংক', যাদের মালিকানা থাকে বেসরকারি হাতে।

এই ব্যাংকগুলোর শীর্ষ মালিকানায় আছে:

- JPMorgan Chase.
- Goldman Sachs.
- Rothschild Banking Group.
- Bank of America.

- Citigroup.
- Lazard Brothers.
- **এবং অন্যান্য** Zionist-**সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান।**

তাদের অডিট হয় না। তাদের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এবং তারা কেবল লাভজনক নীতিই নেয়, জনকল্যাণ নয়।

- **বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ: টাকা ছাপা মানেই শাসন:**

যখন কোনো দেশ যুদ্ধ করে, Fed চেক ছাপে। যখন জনগণ বেকার হয়, Fed সুদ কমায়। যখন কোনো সরকার দেউলিয়া হয়, Fed তাদের ঋণ দেয়– আর সাথে শর্ত দেয়: নীতিনির্ধারণ ক্ষমতা ত্যাগ করো।

ফলে, গণতন্ত্র কাগজে থাকে। শাসন চলে অর্থব্যবস্থার হাতে। এবং সেই অর্থব্যবস্থা Rothschild-প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং মডেলের উপর দাঁড়িয়ে।

- **ফলাফল?**

আমেরিকানরা ভাবেন তারা স্বাধীন। কিন্তু তারা আসলে ঋণের দাস। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো IMF ও World Bank-এর মাধ্যমে Fed-নির্ভর বন্দীত্বে আবদ্ধ। যেহেতু ফেডারেল রিজার্ভ ইসরায়েলী নীতির গোপন মিত্র, তাই ফিলিস্তিনের মৃত্যু আর নিউইয়র্কের লাভ– একই মুদ্রার দুই পিঠ।

- **সমাপ্তি না শুরুর দিকে?**

Titanic কাহিনি ছিল **শুরু**। Fed ছিল **যন্ত্র**। আর আজকের AI, Digital Currency এবং Central Bank Digital Control হলো শেষ পরিণতির রূপরেখা।

আপনার সামনে এখনো সময় আছে প্রশ্ন করার– **"আমরা কারা? কে আমাদের চালায়? কে আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে?"**

আপনার কাছে এই তথ্যগুলো নতুন মনে হচ্ছে। অনেকেই আছেন, এর আগে কখনও এমন তথ্য জানেননি। আপনি বইপত্র ঘাঁটলে বা অন্তর্জালে অনুসন্ধান করলে 'ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক' সম্পর্কে যা জানতে পারবেন, তা নিম্নরূপ গতানুগতিক ইতিহাস, এভাবে তারা ইতিহাস বলে:

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Federal Reserve System) বা সংক্ষেপে **'ফেড'** হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, মুদ্রানীতি নির্ধারণ করা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম তদারকি করা। অর্থনীতির সংকটকালীন সময়ে তারল্য সরবরাহ ও মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

ফেডারেলের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলো:

১. যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ব্যাংক (১৭৯১-১৮১১) ২. দ্বিতীয় জাতীয় ব্যাংক (১৮১৬-১৮৩৬) ৩. স্বাধীন ট্রেজারি সিস্টেম (১৮৪৬-১৯২০) ৪. ন্যাশনাল ব্যাংকিং সিস্টেম (১৮৬৩-১৯৩৫)

এই ব্যাংকিং-ব্যবস্থাগুলোর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ছিল, যেমন: আর্থিক সংকট রোধে ব্যর্থতা, আঞ্চলিকভাবে ভারসাম্যহীন ঋণ বিতরণ, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাব এবং রিজার্ভ মান ও সরবরাহে অনিশ্চয়তা।

এই সমস্যা মোকাবেলায় মার্কিন কংগ্রেস ১৯০৭ সালের ব্যাংকিং সংকটের পর 'ন্যাশনাল মনিটারি কমিশন' গঠন করে, যার প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে Federal Reserve Act পাস হয়। এর আওতায় ১৯১৪ সালের নভেম্বরে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

গঠন ও কাঠামো

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত:

১. **বোর্ড অব গভর্নরস (Board of Governors):** ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত, কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারক সংস্থা।

২. **১২টি আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক:** যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করা, যেমন: নিউইয়র্ক, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো ইত্যাদি।

৩. **ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটি (FOMC):** মুদ্রানীতি নির্ধারণকারী মূল কমিটি, যা সুদের হার এবং ওপেন-মার্কেট অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে।

মূল কার্যাবলি ও দায়িত্ব

ব্যাংক রিজার্ভ সংরক্ষণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বাধ্যতামূলক রিজার্ভ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে জমা থাকে। এটা আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।

সরকারি ডিপোজিটরি হিসেবে কাজ: সরকারি লেনদেন, বন্ড নিলাম, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি পরিচালনা করে। অর্থাৎ এটা সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি আর্থিক সেতুবন্ধন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ প্রদান: সংকটকালীন বা তারল্য ঘাটতির সময় স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করে, যাতে আর্থিক প্যানিক এড়ানো যায়।

সরকারি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অ্যাকাউন্টগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে। পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা: ব্যাংকগুলোর মধ্যে অর্থ স্থানান্তর, চেক নিষ্পত্তি এবং ইলেকট্রনিক পেমেন্ট প্রসেস করে।

মুদ্রা জারি: ফেডারেল রিজার্ভ নোট বা ডলার ছাপিয়ে দেশের বৈধ মুদ্রা সরবরাহ করে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র আইনি টেন্ডার।

ওপেন-মার্কেট অপারেশন: বাজারে অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারি বন্ড ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সুদের হার ও তারল্য ব্যবস্থাপনা করে। এই কাজ প্রধানত নিউইয়র্ক ফেড ব্যাংক করে থাকে।

অর্থনীতিতে প্রভাব

ফেডারেল রিজার্ভের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রভাব : সুদের হার কমালে বিনিয়োগ ও ভোক্তা ব্যয় বাড়ে। সুদের হার বাড়ালে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে বাজারে তারল্য বাড়ে। সংকটকালে আর্থিক খাতকে বেইলআউট দিয়ে স্থিতিশীলতা আনে।

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক শুধু একটি ব্যাংক নয়, এটা একটি পরিপূর্ণ **মুদ্রানীতি কেন্দ্র**, যা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আধুনিক অর্থনীতিতে এর কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

এরকমই গতানুগতিক তথ্য পাবেন। আবার যখন প্রশ্ন করবেন গুগলকে যে, এই ব্যাংক সরকারি না কি বেসরকারি? এই উত্তরটাও দিয়ে রেখেছে কৌশলে। আমি ওটাও তুলে ধরছি—

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক একটি সরকারি এবং বেসরকারি উভয় সত্তার মিশ্রণ। এটা সম্পূর্ণভাবে সরকারিও নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে বেসরকারিও নয়। এই কাঠামোটিকে 'সরকারের মধ্যে স্বাধীন' (independent within the government) হিসাবে বর্ণনা করা হয়।এর কিছু অংশ সরকারি এবং কিছু অংশ বেসরকারি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে:

বোর্ড অফ গভর্নরস (Board of Governors): এটা ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং এটা একটি সরকারি সংস্থা। এর সাতজন সদস্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং সিনেট দ্বারা অনুমোদিত হন। তারা সরাসরি কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহি করেন।

আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলি: ১২টি আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক বেসরকারি কর্পোরেশনের মতো গঠিত। এগুলোর সদস্য ব্যাংকগুলি (বাণিজ্যিক ব্যাংক) আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের শেয়ার ধারণ করে। তবে, এই শেয়ারগুলো সাধারণ কোম্পানির শেয়ারের মতো নয়, এগুলো থেকে সীমিত লভ্যাংশ পাওয়া যায় এবং এগুলো লাভ-ভিত্তিক নয়। এই ব্যাংকগুলো কংগ্রেসের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং জনগণের সেবা করার জন্য কাজ করে। এই অনন্য কাঠামো ফেডারেল রিজার্ভকে রাজনৈতিক চাপ থেকে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন থাকতে সাহায্য করে, যা দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সহায়ক।

এমনই উত্তর ও তথ্য পাবেন। এর বেশি কিছু পাবেন না। বেশিরভাগ মানুষ এমনই জানে। আসুন 'ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক' নিয়ে আরও কিছু জানা যাক।

ফেডারেল রিজার্ভ গোপন কাঠামো

বিশ্বের অর্থনৈতিক-ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় ও আলোচিত একটি নাম হচ্ছে **ফেডারেল রিজার্ভ**। যদিও এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিত, তবে এর গঠন, নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও বাস্তব ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক, গুজব এবং ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে রহস্যময় ব্যাংকিং পরিবার, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী স্বার্থ এবং 'দৃশ্যমান রাষ্ট্রের' আড়ালে কাজ করা এক ছায়া সরকারব্যবস্থা।

১. ফেডারেল রিজার্ভ কী আসলেই 'সরকারি'?

অনেকেই ভুলভাবে ধরে নেন যে ফেডারেল রিজার্ভ একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি সংস্থা। বাস্তবে এটা একটি **আংশিক বেসরকারি এবং আংশিক সরকারি সংস্থা**, যার মালিকানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। তবে, তাও পুরোপুরি সঠিক নয়। এমন সংমিশ্রণ করে রাখা ও বলার মধ্যেও একটা পরিকল্পনা আছে।

১২টি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংকের মালিকানা রয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হাতে। অর্থাৎ, প্রাইভেট ব্যাংকগুলোই রিজার্ভ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার। এই ব্যাংকগুলো বছরে বিলিয়ন ডলারের লাভ করে, যার একটি অংশ সরকারকে দিলেও বাকি অংশ থেকে যায় নিজস্ব ব্যবহার ও ব্যাংকসমূহের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভকে সাধারণ সরকারি সংস্থার মতো কংগ্রেসীয় তদন্ত বা জবাবদিহির আওতায় আনানো যায় না। এমনকি এর বাজেট, কর্মী নিয়োগ ও সিদ্ধান্তগুলোর উপর মার্কিন জনগণের কোনো সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেই।

২. গোপন কাঠামো ও 'Shadow Banking' সিস্টেম:

ফেডারেল রিজার্ভের প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে এর গোপন আর্থিক সিস্টেম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিতে, যা মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়:

ক. বোর্ড অব গভর্নরস:

ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত এই বোর্ড রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হলেও তারা দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকেন এবং নিয়ন্ত্রণে প্রায় স্বাধীন। রাষ্ট্রপতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব শেষ হয় না।

খ. ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটি (FOMC):

এই কমিটি দেশের মুদ্রানীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সদস্যদের মধ্যে প্রাইভেট ব্যাংকের প্রতিনিধিও থাকে, যারা প্রতিনিয়ত সরকারি ঋণ, বন্ড ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধান্তে প্রভাব রাখে।

গ. System Open Market Account (SOMA):

এই পোর্টফোলিওর মাধ্যমে ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ ও সিকিউরিটি কিনে ফেলা হয়। এসব কার্যক্রমের অনেকটাই হয় গোপনে, যার হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ পায় না।

৩. রথচাইল্ড পরিবার ও ইতিহাসের ছায়া

বিশ্বব্যাপী আর্থিক নিয়ন্ত্রণে যেসব পরিবারের নাম আলোচিত, তাদের মধ্যে **রথচাইল্ড পরিবার** সর্বাধিক প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। ১৮শ শতকে ইউরোপজুড়ে পাঁচ ভাইয়ের মাধ্যমে যে ব্যাংকিং সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, তার একটি বড় অংশ ছিল রাষ্ট্রীয় ঋণ ও যুদ্ধবাজ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ।

যুক্তরাষ্ট্রে রথচাইল্ড প্রভাব: যদিও সরাসরি ফেডে তাদের মালিকানা নেই বলে দাবী করা হয়, তবে Rothschild-বান্ধব ব্যাংক, হেজ ফান্ড এবং সিকিউরিটি সংস্থা বহু বছর ধরেই নিউইয়র্ক ফেডের ওপেন মার্কেট অপারেশনে প্রভাব রাখছে। বিশেষ করে Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley-এর মাধ্যমে Rothschild-ঘনিষ্ঠ চক্র Wall Street-এর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত।

১৯১০ সালের Jekyll Island বৈঠক: ইতিহাসে আলোচিত এই গোপন বৈঠকে যে ব্যক্তিরা ফেড গঠনের পরিকল্পনা করেন, তারা প্রত্যেকেই Wall Street ও Rothschild-মিত্র বড় ব্যাংকের প্রতিনিধি ছিলেন– যেমন: Paul Warburg (Kuhn, Loeb & Co.), Frank Vanderlip (National City Bank), Henry Davison (J.P. Morgan)। এদের কারোরই সরকারি পরিচয় ছিল না।

৪. Wall Street: ফেডের ছায়া সরকার?

Wall Street শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয়, গোটা বিশ্ব অর্থনীতির 'অদৃশ্য প্রশাসন' হিসেবে বিবেচিত। ফেডারেল রিজার্ভের ওপেন মার্কেট অপারেশনের মাধ্যমে Wall Street-এর ব্যাংকগুলো বন্ডের দর নিয়ন্ত্রণ করে, সুদের হারে প্রভাব ফেলে, বেইলআউট সুবিধা পায় এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যেও মুনাফা অর্জন করে।

২০০৮ সালের আর্থিক সংকটে যখন Lehman Brothers ধ্বসে পড়ে, ফেডের ত্বরিত বেইলআউট চলে JPMorgan, Goldman Sachs, AIG-এর দিকে। কেউ জিজ্ঞেস করেনি কেন Wall Street বাঁচাতে জনগণের করের অর্থ ব্যবহার হবে।

৫. বিতর্ক ও সমালোচনা:

ক. 'End the Fed' আন্দোলন:

Ron Paul-এর মতো রাজনীতিকরা বহু বছর ধরে ফেড বাতিল করার দাবী জানিয়ে আসছেন। তাদের মতে, এটা গণতন্ত্রবহির্ভূত এক ধনিকতন্ত্রের প্রতীক।

খ. স্বর্ণমুদ্রা বনাম কাগজের নোট:

ফেড ডলার ছাপে কিন্তু তার কোনো বাস্তব ভিত্তি (যেমন: সোনা) নেই। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি, ঋণভিত্তিক অর্থনীতি এবং বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

গ. নাগরিকের প্রতিশ্রুতি নয়, কর্পোরেটের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত:

ফেডের সিদ্ধান্তে প্রায়শই সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ধনী কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলো লাভবান হয়। এই বাস্তবতা মার্কিন গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক শুধুই একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর এক নিঃশব্দ পরিচালনাকারী কেন্দ্র। এর গঠন কাঠামো এবং ইতিহাস যতটা স্বচ্ছ দেখানো হয়, প্রকৃতপক্ষে তা ততটাই ছায়াবৃত, নিও-আর্থিক সাম্রাজ্যবাদে পরিপূর্ণ। Rothschild বা Wall Street-এর মতো শক্তিগুলোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিশ্বের অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে, যা হয়তো ভবিষ্যতের নতুন এক আর্থিক পরাধীনতার রূপরেখা।

প্রশ্ন থেকেই যায়, ফেড কী জনগণের অর্থনীতির রক্ষক, না কি গোপন অভিজাতদের অর্থনৈতিক অস্ত্র?

ফেডারেল রিজার্ভ ও বিশ্ব আধিপত্য

পৃথিবীর শক্তির কেন্দ্রবিন্দু অস্ত্র কিংবা সামরিক বাহিনীতে সীমাবদ্ধ নয়, বলা যায় একে আরও গভীর ও সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আর্থিক নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠানগুলো। এই নীতিনির্ধারকদের কেন্দ্রে অবস্থান করছে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলেও বাস্তবে তা একটি বৈশ্বিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রধান নিয়ামক। ডলারের একাধিপত্য, সুদের হারের বৈশ্বিক সমন্বয় এবং আর্থিক বাজারের সাইকোলজিক্যাল প্রভাব– সবই নিয়ন্ত্রিত হয় ফেডের মাধ্যমে।

১. ডলারের বিশ্বায়ন ও আধিপত্যের জন্ম

ফেডারেল রিজার্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালে। তবে বৈশ্বিক স্তরে এর আধিপত্যমূলক রূপ নেয় **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রেটন উডস ব্যবস্থার** মাধ্যমে। ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন ডলারকে **বিশ্বের রিজার্ভ কারেন্সি** হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর মানে ছিল, অধিকাংশ আন্তর্জাতিক লেনদেন ডলারে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের রিজার্ভে ডলার সংরক্ষণ করবে। তেল, স্বর্ণ, খাদ্য-সহ প্রায় সব পণ্যের দাম নির্ধারিত হবে ডলারে।

ফেডের মুদ্রানীতি ও সুদের হার এখন শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে নয়, প্রায় প্রতিটি দেশের মুদ্রা, বন্ড, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যনীতিকে প্রভাবিত করে।

২. আর্থিক উপনিবেশ: বিশ্বব্যবস্থায় ফেডের নিয়ন্ত্রণ:

ফেডারেল রিজার্ভ কোনো দেশে সরাসরি সৈন্য পাঠায় না, তবে মুদ্রানীতি, ঋণ ও সুদের হার ব্যবহার করে দেশগুলোকে এমন এক ধরণের আর্থিক পরাধীনতায় আবদ্ধ করে রাখে, যা সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন রূপ।

ক. উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ-নির্ভরতা

যখন ফেড সুদের হার বাড়ায়, তখন বিশ্ববাজারে মূলধন সরু হয়ে যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলো ঋণ পেতে হিমশিম খায়, অথচ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো (বিশেষ

করে IMF ও World Bank, যাদের নীতিগত ভিত্তি মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন) কড়া শর্তে ঋণ দেয়। এই ঋণ দেওয়ার সাথে থাকে: নব্য-উদারনীতির চাপ, বেসরকারিকরণ, করপোরেট, অবকাঠামো খুলে দেওয়া, ঘরোয়া উৎপাদন ধ্বংস।

ফলে এসব দেশ নিজের অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং একপ্রকার **'debt trap imperialism'**-এর শিকার হয়।

খ. মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য সংকট

ফেড ডলারের সরবরাহ বাড়ালে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বাড়ে। আবার সুদ বাড়ালে তাৎক্ষণিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে মূল্যস্ফীতির চাপ পড়ে। খাদ্য, জ্বালানি, ঔষধ–সবই ডলার-নির্ভর হওয়ায় এসব দেশের জনগণ বিশ্বব্যবস্থার সিদ্ধান্তের দায় নিজে না নিয়েও মূল্য দেয়।

৩. ফেডারেল রিজার্ভ ও ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য

ক. নিষেধাজ্ঞার অস্ত্র হিসেবে ডলার

মার্কিন সরকার যখন কোনো দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেড ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। **SWIFT ব্যবস্থার** মাধ্যমে দেশের লেনদেন থামিয়ে দেওয়া হয়, ব্যাংকগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং মূলধন হ্রাস করে রাজনৈতিক চাপে নতি স্বীকার করানো হয়।উদাহরণস্বরূপ: ইরান, ভেনেজুয়েলা ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত আর্থিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ফেড ও তার আওতাধীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

খ মার্কিন সামরিক খরচের অর্থায়ন

ফেডারেল রিজার্ভ সরকারের বন্ড ক্রয় করে অর্থ সরবরাহ করে, যার একটি বড় অংশ যায় সামরিক খাতে। এর মানে, যুদ্ধ-নির্ভর অর্থনীতি পরিচালনা করা, বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে সেনা মোতায়েন করা এবং সবকিছু ফেডের ছাপানো ডলারের মাধ্যমে সম্ভব করা।

এই প্রক্রিয়াকে অনেকে বলেন "Banking-Military Complex", যেখানে যুদ্ধ এবং ব্যাংক উভয়েই একে অপরের সুবিধাভোগী।

৪. ফেডারেল রিজার্ভ বনাম সার্বভৌমত্ব

অনেক দেশের নীতিনির্ধারকেরা আজ নিজ দেশের অর্থনীতির চেয়ে ফেডার সুদের হার, FOMC বৈঠক, বা Jerome Powell-এর বিবৃতির দিকে বেশি নজর দেয়। এটা একটি গভীর সংকেত, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এখন আর শুধু সংবিধানে লেখা নেই, বাস্তব সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে বৈশ্বিক ফাইন্যান্সের উপরে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো: ফেডের সিদ্ধান্তে উদীয়মান অর্থনীতির মুদ্রা হঠাৎ করে অবমূল্যায়িত হয়ে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীরা নির্ধারণ করে কোন দেশ বিনিয়োগযোগ্য, কোনটি নয়। দেশীয় নীতিগুলো প্রায়শই বৈদেশিক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের পছন্দ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

৫. ফেড কার পক্ষে কাজ করে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে উঠে আসে কিছু বিতর্কিত সত্য।ফেডারেল রিজার্ভ আইনত সরকারের অংশ নয়। এটার লাভ ও নীতিনির্ধারণে সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণ নেই। Rothschild, Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock – এই ধরণের কর্পোরেট শক্তির প্রভাব রয়েছে ফেডের নীতিতে। ফেডের প্রতিবছরের শতশত বিলিয়ন ডলারের আর্থিক ম্যানিপুলেশন কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় না।

ফলে কেউ কেউ একে বলেন, "শক্তিশালী দেশের সবচেয়ে দুর্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান", আবার কেউ বলেন "গোপন আধিপত্যের আর্থিক অস্ত্র"।

বলা যেতেই পারে, ফেডারেল রিজার্ভ এক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সেনাপতি, যাকে প্রকাশ্যে দেখা যায় না, অথচ তার সিদ্ধান্তে কাঁপে মুদ্রা, ওঠে-নামে শেয়ারবাজার, ঝুঁকির মুখে পড়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র।

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় যুদ্ধ-অস্ত্র নয়, অর্থনৈতিক নীতিমালা, ঋণচক্র, সুদের হার ও মুদ্রা সরবরাহ– এই চারটি মাধ্যমে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর সেই নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি আজ ফেডারেল রিজার্ভের হাতে।

ইসরায়েল, রথচাইল্ড ও আধুনিক ব্যাংকিং সাম্রাজ্য

বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির জটিল বাঁকে যে কয়টি নাম অদৃশ্য ছায়ার মতো ছড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী নাম– Rothschild। ইউরোপীয়

জুয়েলারি ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এক অবিশ্বাস্য আর্থিক সাম্রাজ্যের নির্মাতা এই পরিবার শুধু ব্যাংক বা বন্ড ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেনি, আধুনিক বিশ্বরাজনীতির অভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতিও প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে ইসরায়েলের রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও আর্থিক অবকাঠামো গঠনে রথচাইল্ড পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু বিশ্লেষক মনে করেন, এটা ছিল একটি বহুদিনের 'ঐতিহাসিক প্রকল্প'।

ইসরায়েল: একটি আর্থ-রাজনৈতিক প্রকল্প

১৯১৭ সালের 'Balfour Declaration' ছিল ইতিহাসের মোড় ঘোরানো একটি ঘোষণা, যেখানে ব্রিটিশ সরকার ইহুদী জাতির জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রটি কোনো রাষ্ট্রের প্রতি নয়, ব্যক্তিগতভাবে পাঠানো হয় লর্ড রথচাইল্ডের কাছে। এটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, রথচাইল্ড পরিবার যে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করছিল, তার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ফিলিস্তিনে ইহুদী পুনর্বাসনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল, তার অনেকটাই এসেছে রথচাইল্ড পরিবার ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে। ইউরোপের রাজ্যগুলোর যুদ্ধ অর্থায়ন করেছে, সরকারের বন্ড বিক্রয় ও নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, বিশ্বমন্দা ও যুদ্ধের সুযোগে বিপুল পুঁজি জমিয়েছে।

এদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল বিশ্বব্যাপী সেন্ট্রাল ব্যাংকিং সিস্টেমের ভিত্তি, যার অন্যতম উদাহরণ ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Fed)।

অদৃশ্য বন্ধন

Wall Street হলো আধুনিক ব্যাংকিং, শেয়ারবাজার ও কর্পোরেট পুঁজিবাদের কেন্দ্র। Rothschild পরিবারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব Wall Street-এর বহু নামকরা ব্যাংকে ছিল এবং এখনো অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Lehman Brothers (বর্তমানে বিলুপ্ত)। এই ব্যাংকগুলো শুধু অর্থনৈতিক অঙ্গনে নয়, রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাব বিস্তার করে এসেছে।

বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, IMF ও World Bank-এর গঠন, সবকিছুতেই রথচাইল্ডদের মতাদর্শিক ও অর্থনৈতিক ছায়া লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটেও Wall Street-এর সেই পুরনো শক্তিগুলো লাভবান হয়, যখন কোটি কোটি সাধারণ মানুষ কাজ হারায়, ঘর হারায়।

ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও Rothschild ছায়া:

ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'Bank of Israel' গঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। এর তত্ত্বাবধান ও গঠনমূলক কাঠামোয় পশ্চিমা কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং মডেল অনুসৃত হয়, যার ভিত্তি ব্রিটিশ ও মার্কিন অর্থনীতি। প্রথম গভর্নর ছিলেন ডেভিড হোরোভিৎজ। পরবর্তীতে ইসরায়েলের অর্থনীতির উত্থানকালে দেখা যায়, দেশটির বাজেট, মুদ্রানীতি এবং বৈদেশিক লেনদেন Rothschild ভাবধারার ব্যাংকিং কাঠামো অনুসরণ করে চলে। উদাহরণস্বরূপ, 'State of Israel Bonds', যা বিশ্বের ইহুদী ও সমর্থক দেশগুলোকে কিনতে উৎসাহিত করা হয়, রথচাইল্ডদের বন্ড-কেন্দ্রিক অর্থনীতির কৌশলের আধুনিক রূপ।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম শুধু একটি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অর্জন নয়, এটা একটি অর্থনৈতিক প্রকল্প, যার পিছনে ছিল ইহুদী-চক্র, ও Rothschild পরিবারের বহু দশকের পরিকল্পনা ও অর্থায়ন। আধুনিক ব্যাংকিং-ব্যবস্থা, বিশেষত কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ও বন্ড-নির্ভর অর্থনীতি, মূলত Rothschild ও Wall Street-এর যৌথ প্রয়াসে গঠিত হয়েছে, যা বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—একটি পরিবার কীভাবে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে? উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সেই কথায়—**"যার হাতে অর্থ, তার হাতেই ক্ষমতা। আর যার হাতে উভয়ই, সে-ই লেখে ইতিহাস।"**

ব্যাকরণ: কেন ফিলিস্তিনই?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইহুদীদের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। নানা জায়গায়– মাদাগাস্কার, ব্রাজিলের 'মাটো গ্রোসো' প্রদেশ, সুদান, কেনিয়া, উত্তর রোডেশিয়া (জিম্বাবুয়ে), গায়ানা। এগুলো সকলেই টেবিলে ছিল। কিন্তু, রথচাইল্ড পরিবারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত প্যালেস্টাইনকে (ফিলিস্তিন) বেছে নেওয়া হয়। কেন ফিলিস্তিন? ব্রিটিশরা এর দখলে ছিল, আর কেন বিশ্বশক্তিগুলো এই ভূমি বেছে নিয়েছিল? এই প্রশ্ন এখনও উন্মুক্ত। টাইটানিক ষড়যন্ত্র তত্ত্বের আরেকটা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ছিল ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ইহুদীদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা।

এ বিষয়ে আলাপ করা জরুরি। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ফিলিস্তিন ছেড়ে ইহুদীরা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম (আ.)-এর বসবাসস্থল ফিলিস্তিনে ফেরার চেষ্টা করেছিল।

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে: ১৯ শতকের শুরুর দিকে ইহুদীদের মধ্যে একটি দল জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করে এবং এই উদ্দেশ্যে রথচাইল্ড পরিবার তাদের অর্থায়ন করে। যা 'প্রথম জায়োনিস্ট কংগ্রেস' (First Zionist Congress) নামে পরিচিত, ১৮৯৭ সালের ২৯-৩১ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের বাসেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। থিওডোর হার্জেল ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান সংগঠক। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদী জনগণের জন্য একটি 'আইনগতভাবে নিশ্চিত আবাস' (a publicly and legally assured home) প্রতিষ্ঠা করা।

থিওডোর হার্জেল বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখনও ফিলিস্তিনের শাসক ছিল না। ফিলিস্তিন তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ব্রিটেনের সরাসরি ও গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন আসে ১৯১৭ সালে 'বালফোর ডিক্লারেশন' ঘোষণার মাধ্যমে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ করে। এই ঘোষণায় ব্রিটেন স্পষ্টভাবে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাদের সমর্থন জানায়। এর পর পরই ব্রি অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর, বিট্রিশরা ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং ১৯২০ সাল থেকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট (British Mandate) শুরু হয়, যার ফলে ইহুদী অভিবাসন ও বসতি স্থাপন ত্বরান্বিত হয়।

অর্থাৎ, জায়োনিস্টরা ১৮৯৭ সালে বাসেলে সম্মেলন করেছিল এবং ফিলিস্তিনে একটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেছিল, যা দীর্ঘ ২০ বছর সময় নিয়ে বাস্তবায়িত করে।

অটোমান সরকার এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল, যা এর আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলেছিল। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, অটোমান দেশে বিদেশিদের জমি কেনার অনুমতি দিলে এর অপব্যবহার হতে পারে। তারা ১৮৬৯ সালের আইন করে হিজাজ ব্যতীত আর কাউকে জমি বিক্রি করতে নিষিদ্ধ করে।১৮৭১ সালে ফিলিস্তিনের ৮০ ভাগ ভূমি রাষ্ট্রীয় ছিল। তখন ফিলিস্তিনে কয়েক হাজার উসমানীয় ইহুদী বসবাস করত।

রাশিয়ায় ইহুদীদের বধ: ১৮৮১ সালে ইহুদীরা রাশিয়ায় গণহত্যার মুখোমুখি হয়ে ফিলিস্তিনে ব্যাপকভাবে অভিবাসন করতে চেয়েছিল। এজন্য তারা রথচাইল্ড ও হির্শ পরিবারের মতো ইহুদী বংশোদ্ভূত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা চেয়েছিল, যাকে জায়োনবাদী সাহিত্যে আলিয়া বলা হয়।

এর প্রতিক্রিয়ায়, সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে ইহুদীদের ফিলিস্তিনে পুনর্বাসিত হতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ সময় তাদের সাম্রাজ্যে ১৫০টির বেশি ইহুদী পরিবার ছিল না। এরপর তিনি হাজিন-ই হাসা নামে তার ব্যক্তিগত কোষাগারের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের কৌশলগত জমি কিনতে শুরু করেন।

১৮৮২ সাল থেকে রথচাইল্ডরা অন্যদের পক্ষে ফিলিস্তিনে জমি কিনতে শুরু করে। রথচাইল্ড যে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকারকে অর্থ ধার দিত, তা উপরে আলোচনার মাধ্যমে জেনেছেন। তারা চেয়েছিল যে, উদ্বাস্তু রাশিয়ান ইহুদীদের এই জমিগুলোতে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হোক। এই জন্য বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে তারা হস্তক্ষেপ শুরু করে। অটোমান সরকার কী করবে তা নিয়ে বিভ্রান্ত ছিল! অনুমতি না পাওয়ায়, সত্ত্বেও একই বছর জাফাতে প্রথম ইহুদী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনের বিশ ভাগের এক ভাগ উর্বর জমি রথচাইল্ডদের দখলে ছিল।

মিথ্যা ঘোষণায় জমি-ক্রয়

১৮৯১ সালে যখন রাশিয়া ইহুদীদের উপর চাপ বাড়ায়, শরণার্থীরা ইউরোপের সাহায্যে বেআইনি ও অবৈধ পদ্ধতি ব্যবহার করে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন শুরু করে। এজন্য তারা পরিচয় গোপন করে, স্থানীয় কর্মকর্তাদের ঘুস দিয়ে, জাল পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র এবং টাইটেল ডিড ব্যবহার করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৮১ সালে ফ্রান্সের দখলে থাকা তিউনিসের তিউনিসিয়ানরা অটোমান সরকার-কর্তৃক নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। বহিরাগত ইহুদীরা জাল নথি ব্যবহার করে অটোমান দেশে প্রবেশ করে এবং তিউনিসিয়ায় নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে।

ইউরোপীয়দের দ্বারা নির্বাসিত প্রায় ৪৪০ ইহুদীদের একটি দল ফিলিস্তিনি শহর সাফেদে বসতি স্থাপনের প্রয়াসে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিল, কিন্তু অটোমান সরকার তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ বিষয়ে সরকার বিভিন্ন প্রদেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একের পর এক বহু আদেশ জারি করে এবং অবহেলাকারী কর্মকর্তাদের শাস্তির আদেশ দেওয়া হয়। অটোমান আর্কাইভগুলো এই বিষয়ে চিঠিপত্রে পূর্ণ।

লাল পারমিট

তা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অভিবাসন ঠেকানো যায়নি। বিশ্বাস করে যে তিনি এটা প্রতিরোধ করতে পারবেন না, গ্র্যান্ড ভিজিয়ার সেভাদ পাশা রথচাইল্ডদের

সাথে একটি চুক্তিতে আসেন এবং আরও শরণার্থী না আনার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বসতিগুলোর প্রতি অন্ধ দৃষ্টি রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে, সুলতান ১৮৯৪ সালে গ্র্যান্ড ভিজিয়ারকে বরখাস্ত করেন এবং তাকে দামেস্কে নির্বাসিত করেন, যেখানে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছিলেন। এছাড়াও দুজন গভর্নর এবং কিছু বেসামরিক কর্মচারীকে বরখাস্ত এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

১৯০০ সালে জেরুজালেমের পবিত্র ভূমিতে ইহুদীদের প্রবেশের শর্ত চালু করা হয়। তদনুসারে, ফিলিস্তিনে আসা প্রতিটি ইহুদী ব্যক্তিকে তাদের পেশা, জাতীয়তা এবং সফরের কারণ দেখানোর জন্য একটি চিঠি বা পাসপোর্ট বহন করতে হতো। ইহুদীদের বহন করা এই 'রেড পারমিট' ফিলিস্তিনে আসার সময় সরকারি কর্তৃপক্ষ চেক এবং রেকর্ড করেছিল। ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাদের বিতাড়িত করা হতো।

উসমানীয় সরকার স্থানীয় ইহুদী জনগোষ্ঠীকে ইহুদীবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল। সমস্ত ইহুদী জনগণ জায়োনবাদী ছিল না। এ সময় ইহুদীদের একটি গ্রুপ সহজ জীবনযাপন করত এবং কোনোরকম রাজনীতিতে যুক্ত থাকত না।

হার্জল এবং তার আকর্ষণীয় অফার

এদিকে বুদাপেস্টের থিওডর হার্জল, ইহুদীবাদী আন্দোলনের নেতা, সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। যখন তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়, তিনি ১৯০১ সালের মে মাসে তার পোলিশ বন্ধু ফিলিপ নিউলিনস্কির মাধ্যমে একটি প্রস্তাব দেন, যিনি সুলতানের সাথেও পরিচিত ছিলেন।থিওডর হার্জলের প্রস্তাব ছিল ফিলিস্তিনকে ইহুদী অভিবাসনের জন্য উন্মুক্ত করা এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত ইহুদী আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে অটোমান সরকারকে বিদেশি ঋণ পরিশোধে উলটো ঋণ প্রদান করা হবে।

সুলতান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। হার্জল চুক্তি করতে অক্ষম ছিলেন এবং তিনি পরের বছর প্রস্তাব পুনরাবৃত্তি করেন। ঋণের কারণে মিশরের স্বায়ত্তশাসিত উসমানীয় প্রদেশে যা ঘটেছিল তার ভয়ে সুলতান হার্জলের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

সরকার রথচাইল্ডদের অর্থ ধার এবং বিনিময়ে ফিলিস্তিনে জায়গা কেনার অনুমতি দেওয়ার দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট। ১৮৫৪ সালের ক্রিমিয়ান যুদ্ধের অর্থায়নের জন্য রথচাইল্ড-সহ বিদেশি ব্যাংকারদের অনাদায়ী ঋণগুলো সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনামলে পুনর্গঠন করা হয়েছিল। যেভাবেই হোক ধার নেওয়ার জন্য

তার এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। দুয়ুন-ই উমুমিয়ে প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে তিনি বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং রাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেন। তার শাসনামলে ছোট আকারের বিদেশি ঋণও উচ্চ ব্যয়ের জোনিং কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছিল।

পরে সুলতান হামিদ ফিলিস্তিনি জমি না দেওয়ার জন্য সিংহাসন হারিয়েছিলেন। (যদিও বলা হয়, স্বৈরাচারী অপশাসন, নিপীড়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হবার জন্য তীব্র আন্দোলনের মুখে সুলতান হামিদের পতন হয়েছিল। এই ইতিহাস অহেতুক প্রোপাগান্ডা। তাদের সগোত্রীয়দের সাজানো অতিরঞ্জিত কথামালা এইসব।) বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তরুণ তুর্কিরা, যারা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে, তারা প্রথমে সুলতানের মালিকানাধীন কোষাগারের জমিগুলোকে জাতীয়করণ করে। তাদের সমর্থনকারী ইহুদীবাদীদের খুশি করার জন্য তারা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অভিবাসনের অনুমতি দেয়।

যদিও তারা ঘটনার গভীরতা উপলব্ধি করার পরপরই এবং ফিলিস্তিনে বিদেশিদের কাছে জমি বিক্রি নিষিদ্ধ করে, ব্যাপারগুলো ইতোমধ্যেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। রথচাইল্ডের টাকায় ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে, ইহুদীরা ৫০ হাজার একর জমি কিনেছিল এবং ১০টি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। উসমানীয় আদমশুমারি অনুসারে, ১৮৮১ সালে প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৯,৫০০, ১৮৯৬ সালে ১২,৫০০, ১৯০৬ সালে ১৪,২০০ এবং ১৯১৪ সালে ৩১,০০০ -এর কিছু বেশি।

১৯১৭ সালে, জায়োনবাদীরা ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোরের সাথে একটি চুক্তিতে আসে। ইহুদী পুঁজির জন্য লোভী ব্রিটেন বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদীদের ফিলিস্তিনে একটি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সিরিয়ার ফ্রন্টের পতন হলে ফিলিস্তিন ব্রিটিশ বাহিনীর দখলে চলে যায়।

ফিলিস্তিনের ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সময় আরব ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক আন্দোলন প্রতিবাদ বাধা সত্ত্বেও ইহুদী অভিবাসন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। নাৎসি দমন-পীড়নও এই অভিবাসনে ইন্ধন জোগায়। ফিলিস্তিনের ইহুদীরা এখন তাদের খুশিমতো জমির মালিক হতে পারে, দাবীহীন জমি পুনরুদ্ধার করে কিন্তু সরকার বা ব্যক্তিদের কাছ থেকে খরিদ করেও। অর্থনৈতিকভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়া আরব ফিলিস্তিনিরা তাদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

অটোমান আমলে গ্রামবাসীরা কম কর প্রদানের জন্য কৌশল অবলম্বন করত। যেমন: জমি অন্যের নামে রেজিস্ট্রি করা। এসব জমি ক্রয়ের মাধ্যমে পরে ইহুদীদের হাতে চলে যায়। ১৯৪৮ সালের মধ্যে ইহুদীদের অধিকাংশ ভূমি দখলে ছিল।

ইহুদী দলগুলো তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্রিটিশদের উপনিবেশী শাসন থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে ছিল। ১৯৩৯ সালে ব্রিটেন ঘোষণা করেছিল যে, বেলফোর ঘোষণা ছিল একটি গুরুতর ভুল, কারণ এখনকার ইসরায়েল বা ফিলিস্তিন ছিল ব্রিটিশদের দখলে। ব্রিটেনের কাছে এর সমাধান কলমের খোঁচা ছিল, যা শেষ পর্যন্ত একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যায়।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইহুদীদের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী এক অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। রথচাইল্ড পরিবার তাদের বিশাল অর্থনৈতিক প্রভাব এবং ঋণের মাধ্যমে ব্রিটেনকে সংকটকালে সাহায্য করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৭৫ সালে মিশর যখন সুয়েজ খাল থেকে নিজেদের অংশ বিক্রির পরিকল্পনা করেছিল, তখন ব্রিটেন সেই অংশ কিনে নেয় রথচাইল্ড পরিবারের ঋণের মাধ্যমে।

ইহুদীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানও তাদের শক্তির একটি বড় অংশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রবার্ট ওপেনহাইমারের পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার বিশ্বরাজনীতিতে তাদের প্রভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। ব্রিটেনে বসবাসরত বিজ্ঞানী হেইম ওয়েইজম্যানের উদ্ভাবন, এসিটন উৎপাদন কৌশল, বৃটেনের যুদ্ধের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তার এই অবদান ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সহানুভূতি তৈরিতে সহায়ক হয়।

১৯২২ সালে জাতিসংঘ ইহুদীদের সমর্থন দেয় এবং ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনকে তিন ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব করে। এর ফলশ্রুতিতে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন হয় এবং আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়।

এক রহস্যময় জগৎ, যেখানে ইতিহাস ও রাজনীতি একে অপরকে ঘিরে রহস্যের জাল বুনছে। ১৯৪৯ সালের ১১ই মে, এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তে, ইসরায়েল জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়। তবে, এর পিছনে রয়েছে এক অদৃশ্য শক্তি। ১৯৫৬ সালে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইসরায়েল মিশরের দিকে চেপে বসে। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের পর, পিছু হটে তারা। কিন্তু সেই দুঃসাহসী পদক্ষেপটি ছিল কেবল শুরু। এরপর আসে ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধ। আরব লীগ চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এই যুদ্ধে ইসরায়েল প্রতিপক্ষকে এমনভাবে হারায় যে, সারা পৃথিবী চমকে ওঠে। সেই মুহূর্তে একটি অদ্ভুত নীরবতা ভর করে মধ্যপ্রাচ্যে। আসলে এই যুদ্ধ কোনো যুদ্ধ ছিল না, ছিল দায় মেটানোর এক অভিনয়।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে সংঘটিত 'ছয় দিনের যুদ্ধ' ছিল আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের একটি নাটকীয় পর্ব, যেখানে মাত্র ছয় দিনে ইসরায়েল চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল চমকপ্রদ, এমনকি পুঁজিবাদী পশ্চিমও স্তম্ভিত হয়েছিল ইসরায়েলী বাহিনীর অগ্রগতিতে। কিন্তু ইতিহাসের অন্তরালে এই যুদ্ধ শুধু একটি কৌশলগত বিজয় ছিল না, ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত এক ছদ্ম-সংঘর্ষ, যেখানে আসল নাট্যকার ছিল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ ও গোপন এলিট-শক্তি।

ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায়– ১৯৬৭ সালের আগেই, ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে একাধিক গোপন কূটনৈতিক চুক্তি হয়। আমেরিকান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা 'NSA' যুদ্ধের সময় মিশরীয় যোগাযোগ-ব্যবস্থায় গুপ্তচরবৃত্তি চালায়, যাতে ইসরায়েলকে যথাসময়ে তথ্য পৌঁছে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নথিপত্র থেকেও প্রমাণ মেলে যে ব্রিটেন আগে থেকেই জানত ইসরায়েল আক্রমণ করবে এবং তারা চুপ থেকেছে।

বিশ্ববিখ্যাত সামরিক গবেষক Liddell Hart লিখেছেন— *"The Six-Day War was won even before it began; the Arabs were blindfolded and baited."* অর্থাৎ, এই যুদ্ধে আরবদের কোনো কৌশলগত প্রস্তুতি ছিল না, তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। তার বই 'History of the First World War' এবং 'The Second World War' বেশ পরিচিত।

ইহুদী ইতিহাসবিৎ টম সেগেভ উল্লেখ করেন– ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকোল যুদ্ধের সময় নিজে থেকে আক্রমণের নির্দেশ দেন আর পশ্চিমা শক্তি তাতে সম্পূর্ণ নীরব থাকে। সাথে এ-ও বলা হয়– আমেরিকা ও ব্রিটেন তাদের সামরিক বাহিনী ইসরায়েলের সৈন্যদের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিল।

আরব লীগ চূর্ণবিচূর্ণ হয়।মিশরের গামাল আব্দেল নাসের, যিনি আরব জাতীয়তাবাদের প্রতীক ছিলেন তিনি যুদ্ধের পর নীরবতায় চলে যান। ফিলিস্তিন তখনও ছিল পরাশক্তিদের খেলনার মতোই। যুদ্ধের সময় সিরিয়া ও জর্ডানের মধ্যে সামরিক সমন্বয়হীনতা এবং নিজেদের মধ্যকার বিশ্বাসঘাতকতা ইসরায়েলের বিজয়কে আরও সহজ করে দেয়। এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, ফিলিস্তিনের প্রশ্নে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্য শুধুই লোকদেখানো ভাঁওতাবাজি।

ইসরায়েলের উত্থানের পেছনে যে পরিবারটি বরাবর ছিল ছায়াসঙ্গী, তা হলো রথচাইল্ড পরিবার। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার সময়, ব্রিটিশ ও

আমেরিকান কূটনীতিকদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব রেখেছিল লর্ড ওয়াল্টার রথচাইল্ডের নেতৃত্বাধীন ইহুদী অর্থায়নকারী মহল। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধ ছিল এই পরিবারের পুঁজিবাদী নকশার একটি ধাপমাত্র। রথচাইল্ডরা যুদ্ধের আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী অস্ত্র ব্যবসা, ব্যাংকিং ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। লন্ডনের '*The Economist*', '*Reuters*' ও '*Times of London*'-এর মতো মিডিয়াগুলো যুদ্ধের সময় যেভাবে ইসরায়েলকে 'বীর' এবং আরবদের 'সহিংস' হিসেবে তুলে ধরেছিল, তা স্পষ্ট করে এই গোত্রীয় প্রভাব।

সেই সময় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন মোশে দায়ান, যিনি রথচাইল্ডদের নিকট বন্ধু এবং অস্ত্র-ব্যবসায়ী লবি দ্বারা সমর্থিত ছিলেন। যুদ্ধের পরে ইসরায়েল পশ্চিম জেরুজালেমের পাশাপাশি গাজা, সিনাই ও গোলান হাইটস দখল করে নেয়– এই ভূখণ্ডগুলোতে পরে খনিজ ও সামরিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে, যার সুবিধাভোগী ছিল পশ্চিমা পুঁজিবাদী গোষ্ঠী ও তাদের ইহুদী লবি।

পলাশীর আম্রকাননের কথিত যুদ্ধের মতোই ছয় দিনের যুদ্ধ ছিল বিশ্বাসঘাতকতার আরেক অধ্যায়। এই সংঘর্ষের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব শুধু পরাজিত হয়নি, তারা নিজেদের গঠিত বিভেদের ফাঁদে পড়ে নেতৃত্ব হারায়। রথচাইল্ড পরিবারের মতো অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটি 'নতুন মধ্যপ্রাচ্য' বিনির্মাণে হাত দেয়। আর গড়ে উঠতে দেয় অবৈধ ইসরায়েল। যার বর্তমান ফলাফল সবার চোখের সামনে দৃশ্যমান।

ইতিহাস হয়তো একে ইসরায়েলী বিজয় বলবে কিন্তু বাস্তবতা হলো—এটা ছিল মুসলমানদের মানসিক ও রাজনৈতিক পরাজয়ের সূচনা, যা আজও চলমান। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্র নয়, বিজয় নির্ধারণ করে অর্থ, কূটনীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা। আর এসবের মালিক তখনও রথচাইল্ডরা ছিল, আজও আছে।

তথাকথিত আরবীয় দেশগুলো ফিলিস্তিনের জন্য নিবেদিত ছিল না, ছিল বিশেষ গোত্রের প্রতি নিবেদিত। এই এদের জন্যই আজ এমন অধঃপতন! এজন্যই মুসলমানরা বিশ্বনেতৃত্বের মসনদচ্যুত হয়ে গেছে। সমগ্র বিশ্ব শাসন করা মুসলমানদের পতনের জন্য অন্য জাতি নয়, এরা নিজেরাই দায়ী।

তবে আসল প্রশ্ন হলো, কেন এই যুদ্ধ ছিল এত গুরুত্বপূর্ণ? যুদ্ধের পর, ইসরায়েলের অস্তিত্ব আরও শক্তিশালী হয়, তবে এই শক্তির উৎস কী?উত্তর— বিশ্বের পুঁজি ও ব্যবসা একধরনের অদৃশ্য থাবার মধ্যে বন্দী, যা গোপনে টানা হচ্ছে। সেই থাবার নাম– এলিট পরিবার।

এদের দাবী, তাওরাত অনুসারে ফিলিস্তিন তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি এবং এর প্রকৃত অধিকারী তারা। তবে, কেন পৃথিবীজুড়ে সব সিস্টেম একে অপরের বিরুদ্ধে চলতে থাকে? এর পিছনে রয়েছে এক অদৃশ্য হাত। আমেরিকা, যে সবসময় ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ায়, প্রকৃতপক্ষে তাদের শক্তির অন্যতম উৎস। এখানে শুরু হয় একটা বিপজ্জনক খেলা, যেখানে একের পর এক আন্দোলনের মধ্যে রথচাইল্ড পরিবার অন্ধকারে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করে চলেছে।

আরও অবাক হওয়ার ব্যাপার হলো, আজ পর্যন্ত রথচাইল্ড পরিবারের সম্পত্তির কোনো হিসাব নেওয়া হয়নি। কীভাবে সম্ভব! এমন বিশাল সম্পত্তি একটি পরিবারের দখলে থেকে যায়, অথচ তার কোনো হিসাব নেই? যে পরিবারের একজন সদস্যও কখনও গণমাধ্যমের সামনে আসে না, সে পরিবার কীভাবে পৃথিবী শাসন করতে পারে? এর কারণ হলো, তারা সোনাকে নিজেদের মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে যা কখনও হারাতে পারে না। তারা সোনা জমা রাখে 'Rothschild House'-এর সোনালি ভল্টে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে। স্বর্ণ, যার দামে কখনও ভাটা পড়বে না। তার intrinsic value কখনো কমবে না।

ইরাকের দখল হওয়ার পর, ইরাকি জনগণ তাদের নোট পুড়িয়ে দেয় কারণ সেই সময় ইরাকি দীনারের কোনো মূল্য ছিল না। এর বিপরীতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যবসায়ী বা ধনীরা বিদেশি ব্যাংকগুলোতে তাদের অর্থ জমা রাখে, বিশেষ করে সুইস বা মার্কিন ব্যাংকগুলোতে কারণ সেগুলোর নিরাপত্তা বেশি। যেমন: ইরান তার তেল রপ্তানি গোল্ডের বিনিময়ে করে, ডলারের স্থলে। এটি রথচাইল্ডদের মতোই একটি প্রথা।

স্বর্ণের দাম উঠানামা করলেও পৃথিবীর কোথাও স্বর্ণের মূল্য কখনও কমে না। সেই সোনার বাজারে রথচাইল্ডরা সুইস বা মার্কিন ব্যাংকে তাদের সম্পদ রেখেছে। উদহারণস্বরূপ বলা যায়, রথচাইল্ড বা JP Morgan-এর মতো বড় জমিদারের আন্ডারে অনেক কৃষক কাজ করে আর সিস্টেমের এই প্রক্রিয়া একেবারেই রথচাইল্ডের কাছে শাসিত। তারা কোনো একক অর্থনৈতিক সিস্টেমের বাইরে নয়, বলা যায় সিস্টেমের অংশ যা পৃথিবীজুড়ে কাজ করছে। বিল গেটস বা মার্ক জাকারবার্গরা রথচাইল্ড পরিবারের সিস্টেমের অংশ হিসেবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে।

এখানে সিস্টেমের মধ্যে নিত্য পরিবর্তন হয় কিন্তু রথচাইল্ডের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। খেলা হয় কিন্তু এর খেলার নিয়ম কেউ জানে না। বিশ্বজুড়ে কারও সম্পদ

বেড়ে যায় আবার কারও কমে যায় কিন্তু রথচাইল্ডের সম্পদ সোনায় বাঁধা থাকে, যা কখনও কমবে না।

আজকের দিনে রথচাইল্ড পরিবার এতটাই আড়ালে চলে গেছে যে তাদের সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের অনেকেই তেমন কিছু জানে না। তারা এখন পুঁজিবাদী দুনিয়ার হর্তাকর্তা হিসেবে পর্দার আড়ালে থেকেই বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা সাধারণত গোপন বৈঠকেই ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেয়, যা তাদের বিরাট প্রভাব এবং প্রতিপত্তির প্রতিফলন।

তবে রহস্য এখানেই শেষ নয়। বর্ণনা করা হয় না যে, কীভাবে রথচাইল্ড পরিবার গোপনে পৃথিবী শাসন করছে? তাদের সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে গোপন বৈঠকে নেওয়া হয়? তাদের পারিবারিক কৌশল এবং রাজনৈতিক প্রভাব আজও প্রমাণিত। এই পরিবারের সদস্যরা এক প্রকার ছায়ার মধ্যে জীবন কাটায়, যেমন তাদের অন্দরমহলে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে বিচ্ছিন্নভাবে, সমাজের থেকেও বিচ্ছিন্ন। তারা যেন এক বিশেষ প্রজাতি যাদের প্রবেশদ্বার কখনও খোলা হয় না।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, রথচাইল্ড পরিবার হঠাৎ এমনভাবে আড়ালে চলে গেল কেন? আজকের যুগে তাদের সম্পর্কে জানে খুব কম মানুষ, তাদের সম্পত্তির হিসাব নেওয়ার কথা তো দূরের কথা। তবে এই রহস্যের গহীনে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। সেখানে চলে এক নতুন অধ্যায়, যেখানে রথচাইল্ডরা হয়তো আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে তাদের খেলা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে তাদের ব্যাপারে জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এক দিনের পর আরেক দিন, গোপনীয়তা বজায় রেখে তারা কীভাবে পৃথিবীকে তাদের হাতে বাঁধতে চাইছে!

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, সম্রাট ফ্রান্সিস আই-কর্তৃক রথচাইল্ড পরিবারের পাঁচ সন্তান- 'de' বা 'von' পদবী লাভ করেছিলেন, যা তাদের বংশধরেরা পরে ব্যবহার করে থাকে।

রথচাইল্ড পরিবার তাদের সদস্যদের জীবনযাত্রা খুবই গোপন রাখে।তারা প্রায় ২০০ বছর ধরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। তাদের পারিবারিক প্রাসাদগুলোর কর্মচারী নির্বাচন খুবই যত্নসহকারে করা হয় এবং এসব কর্মচারীরা সাধারণত পূর্বপুরুষদের মতোই মুখে কুলুপ এঁটে রাখেন।

সন্ধিবিচ্ছেদ

এই পৃথিবীতে কিছু কিছু দরজা আছে যেগুলো শুধু বাইরে থেকেই দেখা যায় কিন্তু ভেতরে প্রবেশের অধিকার থাকে না কারও। এমন এক দরজার পেছনে গড়ে ওঠা এক রাজ্যের নাম- রথচাইল্ড।

তাদের একেকটি প্রাসাদ যেন সরাসরি কোনো রূপকথার বই থেকে উঠে আসা গল্প। বহির্বিশ্ব চমকে উঠে যখন জানে, এই পরিবারের অভ্যন্তরীণ জীবনে নারী সদস্যদের ব্যাংকিং ব্যবসায় প্রবেশের অনুমতি নেই। এই নিষেধাজ্ঞা যেন প্রাচীন ব্রাহ্মণতান্ত্রিক কোনো গ্রন্থ থেকে উঠে আসা এক বিধান। নারীরা শুধু সমাজসেবার পর্দায়। আর পুরুষেরা, তারা ব্যবসার রাজনীতি, ব্যাংক, স্বর্ণভাণ্ডার– সব কিছুর মালিক।

বংশরক্ষার চুক্তি চলে এসেছে শতাব্দী ধরে তুতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে, নিজেদের ভেতরেই পুঁজির পুনঃসংস্থান। ধর্মীয় বিশুদ্ধতা বজায় রাখার কড়া নিয়ম ছিল, ইহুদী ছাড়া অন্য কেউ পরিবারে ঢুকতে পারত না। যদিও সময়ের সঙ্গে পরিবার বাইরের রাজ পরিবারের সঙ্গে জোট বাঁধে কিন্তু ব্যবসায়িক গোপনতা রক্ষা হয় শতভাগ কঠোরতায়। পরিবারের বাইরের কেউ, এমনকি জামাই-শ্বশুরও এ ব্যবসায় ঢুকতে পারবে না– এই ছিল অলিখিত আইন।

তবে এই পর্দার আড়ালে কিছু গল্প উঠে আসে ষড়যন্ত্র-তাত্ত্বিকদের ফিসফিসে কথায়। তারা বলে, আজও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাটি থেকে গোটা বিশ্বশাসন করে রথচাইল্ডদের সপ্তম প্রজন্ম। পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় ৫০০ -এর অধিক।

এই প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম- আলেকজান্দ্রে রথচাইল্ড। বয়স মাত্র ৩৮। কিন্তু তিনি এখন Rothschild & Co.-এর চেয়ারম্যান। শুনতে যতই আধুনিক মনে হোক, এই প্রতিষ্ঠান এখনো পুরোপুরি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বাইরের কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সব সিদ্ধান্ত শুধু পরিবারের অংশীদারদের মাধ্যমেই হয়।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস-এর প্রাক্তন সম্পাদক ডেভিড ল্যান্ডাউ এর লেখা একটি বই 'The House of Rothschild: Money's Prophets ১৭৯৮-১৮৪৮' তিনি তার লেখায় রথচাইল্ডদের পারিবারিক ব্যবসার ধরন বর্ণনা করতে গিয়ে একটা মন্তব্য করেছিলেন। যা বিখ্যাত উক্তি হিসেবে পরবর্তীতে আবির্ভূত হয়। সেই বিখ্যাত উক্তিটি:

> "Unlike modern multinational however, this is always a family firm, with executive decision making strictly monopolized by the partners."

তারা টাকা চায় না, কারণ তারা নিজেরাই টাকা।

> "Rothschilds don't need money... they are THE MONEY."

এই পরিবার সম্পর্কে সার্চ দিলে আপনি পাবেন– নাম, ইতিহাস, ছবি। কিন্তু পাবেন না তাদের সম্পদের হিসাব। উইকিপিডিয়াতে স্যার এভেলিন ডি রথচাইল্ড-এর জীবনী আছে কিন্তু সম্পত্তির কোনো হদিস নেই। ঐতিহাসিকরা বলে থাকে– তাদের সম্পদ অসংখ্য ছোট-বড় পারিবারিক ট্রাস্ট এবং কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় না। তাই তাদের ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত সম্পদের সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

তাদের বাড়িঘর? একেকটা যেন রূপকথার প্রাসাদ। চকচকে মার্বেল, বিশাল লাইব্রেরি, সোনায় মোড়ানো শয়নকক্ষ– যা দেখে আপনার প্রথম চিন্তা হবে, "এটা কি সিনেমার সেট?" না, এগুলো বাস্তব! আপনি চাইলে গুগলে সার্চ দিতে পারেন, 'Rothschild Estate', চোখ ধাঁধানো প্রাসাদগুলোর ছবি দেখে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাবেন আপনি কোন শতকে বসবাস করছেন।

এমন একটা কথাও প্রচলিত–"ইউরোপের যে-কোনো শহরে সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি খুঁজে বের করুন। যদি মালিককে খুঁজে না পান তাহলে ধরে নিন, ওটা রথচাইল্ডদেরই কোনো এক সদস্যের।"

কিন্তু এই পরিবারের সদস্যরা যে শুধুই বিলাসী জীবনযাপন করে তা নয়। তারা ধরা দেয় না কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন স্যার এভেলিন রথচাইল্ড, BBC-এর নানা

আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তাকে দেখা যেত যেন এক অদৃশ্য অথচ উপস্থিত মানচিত্রের স্থপতি।

আর আজকের দিনে? Emma Rothschild– অমর্ত্য সেনের স্ত্রী, এই পরিবারেরেই একজন। তিনি কেমব্রিজ ও হার্ভার্ডে শিক্ষকতা করেন অথচ ব্যাকগ্রাউন্ডে তিনি সেই কুলীন অভিজাত বংশের প্রতিনিধি। তার বাবা Lord Victor Rothschild, এই পরিবার তথ্যের মতোই নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছে।বিশ্বের প্রতিটি সিস্টেমে তাদের জাল রয়েছে যতটা গভীরে কেউ কল্পনা করতে পারে না।

N M Rothschild & Sons– আজও সক্রিয়। ২০২২ সালে তাদের রাজস্ব ছিল প্রায় ৩ বিলিয়ন পাউন্ড। নিট আয় ৬০৬ মিলিয়ন পাউন্ড। তাদের অধীনে রয়েছে ১০১.৬ বিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ।

এতবড় রাজত্ব, এত লুকানো সম্পদ অথচ পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করছে কিছু পরিবারবদ্ধ মানুষ। কোনো পার্লামেন্ট, কোনো রাষ্ট্র, এমনকি কোনো বিশ্ব-সংস্থাও তাদের প্রশ্ন করতে পারে না। তারা গোপনে চুক্তি করে, গোপনে সন্ধি ভাঙে।সন্ধিবিচ্ছেদ যেখানে গল্পের শেষ নেই কেবল নতুন দ্বার খোলে। "তারা শুধু দান করেনি, নিয়ন্ত্রণ করেছিল– মন, মানচিত্র এবং মঞ্চ।" ক্রমবর্ধমান দাতব্য কার্যক্রম, না কি ছদ্ম-প্রভাব বিস্তারের পথ?

নাথান রথচাইল্ডের হাত ধরে ইহুদী দাতব্য ইতিহাসে যে পর্ব শুরু হয় তা শুধু দয়া ছিল না, ছিল এক জটিল ছায়ানাট্য, যার রচয়িতা রথচাইল্ড পরিবার নিজেই। লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে এক ঐতিহাসিক সিনাগগ গড়ে উঠেছিল তাদের টাকায়। কিন্তু সেই সিনাগগে রয়েছে এক অলিখিত কোড। ছাদের নিচে খোদাই করা একটি রাশিয়ান হিব্রু বাক্য– "He who owns the walls, owns the words"– যা গবেষকদের দীর্ঘদিনের রহস্য।

পরবর্তীতে প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং লন্ডনের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু খাদ্য-আশ্রয় নয়, হয়ে উঠেছিল রথচাইল্ডদের নেটওয়ার্ক বিস্তারের নিঃশব্দ কেন্দ্র। ফ্রাঙ্কফুর্টে তাদের পরিচালিত ৩০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান– লাইব্রেরি, হাসপাতাল, বয়স্কদের বাড়ি– আসলে জনমানস নিয়ন্ত্রণের এক প্রকার নরম শক্তি চর্চা ছিল, এমনটাই ধারণা গবেষকদের একাংশের।

'ইহুদী শিক্ষা' না কি আদর্শগত পুনর্গঠন? জিউস ফ্রি স্কুলে রথচাইল্ডদের দানের পর থেকেই পাঠ্যক্রমে যোগ হয় 'ইহুদী স্বপ্ন' ও 'জায়নিস্ট রাষ্ট্র'-এর বিশেষ অধ্যায়।

যদিও এই দাবীর ঐতিহাসিক সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক ভিন্ন ধারার ঐতিহাসিক এই দাবী করেছে। পরবর্তীতে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও ইসরায়েলে যে শিক্ষাকাঠামো গড়ে ওঠে তাতে রথচাইল্ডদের দান করা ৬০,০০০ শিল্পকর্মের গোপন ভাষাও ছড়িয়ে পড়ে– চিত্রকলায়, স্থাপত্যে, ইতিহাস পাঠে।

ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের পতন ও পুনর্জন্ম- এক অর্থনৈতিক বিপ্লব

১৯৭০ সালে রথচাইল্ডদের হাতে মাত্র অল্প কয়েকটি ব্যাংক ছিল। অজানা কারণে একে একে বন্ধ হয়ে যায় বহু শাখা। ১৯৮২ সালে ফ্রান্সে তাদের ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ ছিল যেন এক ষড়যন্ত্র না কি অভ্যন্তরীণ চুক্তির অংশ? প্রেসিডেন্ট মিতেরঁর সেই সিদ্ধান্তের পেছনে গভীর নীরবতা আজও রহস্য ঘেরা।

কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ব্যারন ডেভিড ডি রথচাইল্ড Rothschild & Cie প্রতিষ্ঠা করে আবার ঘুরে দাঁড়ান। ২০০৩ সালে ফরাসি ও ব্রিটিশ শাখাকে একীভূত করে গড়ে ওঠে নতুন এক শক্তি– যা আবারও নিয়ন্ত্রণে আনে আন্তর্জাতিক অর্থ-বাজার।

রথচাইল্ডদের শতাব্দীজুড়ে সফলতার মূল মন্ত্র– ঐক্য, আগ্রাসন ও 'অদৃশ্য হাত'। তাদের শক্তির উৎস সম্পদ নয়, সংহতি। নাথানের গোপন উইলে লেখা ছিল একটি লাইন–

"Let no Rothschild divide, lest the empire fade."

পরবর্তী প্রজন্ম সেই ঐতিহ্যকে ধারণ করে। তারা অর্থ শুধু ব্যবসায় নয়, প্রভাব বিস্তারে, মিডিয়াতে এবং এক নতুন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করে 'নিয়ন্ত্রণের অর্থনীতি'।

চতুর্থ ব্যারন রথচাইল্ড: জ্যাকব- যার ছায়া আজও গাঢ়:

৮৭ বছর বয়সে মারা যাওয়া জ্যাকব রথচাইল্ড ছিলেন এক প্রচারবিমুখ ব্যক্তি। ইটনে পড়াশোনা করে অক্সফোর্ড থেকে পাশ করা এই ব্যক্তি নিজে এনএম রথচাইল্ড ব্যাংক ত্যাগ করে নিজের প্রতিষ্ঠানে আসেন। তবে ১৯৮০ সালে তার এই পদক্ষেপকে অনেকেই বলেন– "তিনি যেন ছায়া থেকে আলোয় এলেন, তবে পেছনে রেখে গেলেন এক ছায়াসম্রাজ্য।"

জায়োনবাদ ও ফিলিস্তিন সংকট- 'দানব ও দেবতার দ্বন্দ্ব'?

জ্যাকব রথচাইল্ড সবসময় ইহুদী রাষ্ট্রকে সমর্থন করেছেন।

কিন্তু সমর্থনের আড়ালে ছিল এক ভয়ঙ্কর চিত্র। ইয়াদ হানাদিব ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে তিনি যে দাতব্য করেছেন তা দিয়েই তৈরি হয়েছে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট, সুপ্রিম কোর্ট এবং জাতীয় গ্রন্থাগার। এই ভবনগুলোর স্থাপত্যে আছে গোপন প্রতীক, ম্যাসনিক চিহ্ন এবং এমন কিছু আকৃতি– যা ভিন্ন ধারার ইতিহাসবিৎদের মতে 'থার্ড টেম্পল' নির্মাণের এক শৈল্পিক সূচনা।

২০১৭ সালের এক সাক্ষাৎকারে জ্যাকব বেলফোর ঘোষণা সম্পর্কে বলেছিলেন, "এটা এক অলৌকিক ঘটনা।"

কিন্তু এই ঘোষণায় যে লাখো ফিলিস্তিনির ঘর-বাড়ি ছিনতাই হয়েছিল সেই ব্যথা তার মুখে শোনা যায়নি। তার মৃত্যুর ঠিক আগেই ঘোষণা হয়েছিল তার মেয়ে হান্না হবেন ইয়াদ হানাদিবের নতুন প্রধান। একটি উত্তরাধিকার শেষ হলো কিন্তু 'মিশন' এখনো অপ্রকাশিত।

হান্নার নেতৃত্বে এখন নতুন লক্ষ্যের দিকে যাচ্ছে রথচাইল্ড ট্রাস্ট। গুঞ্জন ছড়িয়েছে– ইসরায়েলে রেড হেফার (লাল গরু) পৌঁছে গেছে। এটা কি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত? দাজ্জালের আগমনের প্রক্রিয়া? না কি এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার ঘূর্ণাবর্তে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে শতাব্দী পুরোনো এক পরিবার?

> "রথচাইল্ডরা চলে যায় না, তারা রূপ বদলায়, ছায়া হয়। আর ছায়াই তো আলোকে সংজ্ঞায়িত করে।"

বর্ণমালা: অদৃশ্য ভাষার দৃশ্য রাজনীতি!

"তারা আমাদের ভাষা কেড়ে নেয়নি, তারা আমাদের ভাষায় নিজেদের বর্ণ ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

১৭৭৬ সালের ১লা মে, ইউরোপের অন্ধকার কোণায় জন্ম নেয় এক গুপ্ত সংগঠন- ইলুমিনাতি। জনসম্মুখে তারা ছিল দর্শন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী। আসলে তারা ছিল এক পর্দার আড়ালে থাকা জাদুকর, যারা বর্ণমালার মাঝে লুকিয়ে রেখেছিল জগৎ শাসনের সূত্র।

অ্যাডাম ওয়েইশহাউপ্ট 'অর্ডার অফ দ্য ইলুমিনাতি' (Order of the Illuminati) প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওয়েইশহাউপ্ট একজন জার্মান আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

ইহুদী বংশোদ্ভূতের হলেও এজন্মসূত্রে একজন ক্যাথলিক হিসেবে দাবী করা হয়ে থাকে। যিনি ক্যাথলিক চার্চকে ভিতর থেকে ভাঙার জন্য নিজের পরিচয় পালটে ফেলেন।

তার পৃষ্ঠপোষক কে ছিল জানেন? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আর্থিক অনুদান, নেটওয়ার্ক এবং রাজনৈতিক ছায়ার দানবিক মিশেল ঘটিয়েছিলেন মায়ের আমশেল রথচাইল্ড। তার বিনিয়োগে গড়ে উঠল এমন একটি আদর্শ, যা বিশ্বের ইতিহাসকেই রি-রাইট করবে– গোপন প্রতীক, কাবালাহিক জ্যামিতি এবং 'প্রতীক ভাষার' মাধ্যমে।

ইলুমিনাতির ভাষা ছিল বর্ণে, সংখ্যায় ও চিহ্নে। তাদের বিশ্বাস ছিল, বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শব্দ দ্বারা– 'লোগোস'।

তাই শব্দ, বর্ণ ও চিহ্ন যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় চিন্তাকে, বিশ্বাসকে, এমনকি ভবিষ্যতকেও।

তারা সৃষ্টি করল এক 'প্রতীকতান্ত্রিক যুদ্ধ'– Symbolic Warfare। যেখানে অস্ত্র নয়, জয় হয় চিহ্ন দিয়ে। তাদের চিহ্ন ছড়িয়ে গেল সবখানে। ডলারের চোখওয়ালা পিরামিড, জাদুবিদ্যার ষড়ভুজ, সোলোমনের সীলমোহর এবং মেসোনিক কম্পাস।এই চিহ্নগুলোর পেছনে কাজ করছে এক গভীর কাব্বালাহিক কোড। যারা এই কোড জানে, তারাই নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাংক, রাষ্ট্র, মিডিয়া, এমনকি ধর্মীয় প্রভাবও।

যদিও দাবী করা হয়– এসব চিহ্ন ফ্রিম্যাসনারি এবং আমেরিকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই প্রতীকগুলো ইলুমিনাতির সাথে সরাসরি যুক্ত নয়।

তাহলে কেন ভ্যাটিকান, ইসরায়েল ও লন্ডনের রাস্তার গঠন কাব্বালাহি জ্যামিতিতে তৈরি? কেন বিশ্ব ব্যাংক ও জাতিসংঘের লোগোতে জ্যোতিষচক্র? আর কেন 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা' (New World Order) কথাটা প্রায় রাষ্ট্রনেতার ভাষণে একসময় আবির্ভূত হয়? বলতেই পারেন, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে প্রকৌশলীরা এমন নকশা করেছে, যা স্বাভাবিক পন্থা। এসব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু না। এমন ভাবাতে কোনো আপত্তি নেই, ভাবতেই পারেন, ভাবার মতো স্বাধীন মস্তিষ্ক আপনার আছে। তবে সবকিছু সরলীকরণ হিসেবে নেওয়াটাও উচিত না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিতান্তই আপনার ব্যাপার।

এটা কোনো কাকতালীয় নয়, এটা 'প্রিপেয়ার্ড বর্ণগঠন'।

একটি সুপরিকল্পিত ন্যারেটিভ, যা যুগে যুগে বদলে দিচ্ছে পৃথিবীর রাজনৈতিক লিপি।

তারা জানত সবথেকে বড় শক্তি অস্ত্রে নয়, 'বর্ণে'। অর্থাৎ প্রযুক্তি। তাই তারা শব্দ তৈরি করেছে, মিডিয়া গড়েছে, শিক্ষা ও ইতিহাস লিখেছে নিজেদের ভাষায়। আর আমরা আজও সেই ভাষার মধ্যে দিয়ে বিশ্বকে দেখি, বিচার করি– তাদের চোখ দিয়ে, তাদের শব্দ দিয়ে। তাদের কাছে 'টেররিস্ট' মানে মুসলিম, 'সিভিলাইজড' মানে ইউরোপীয়, 'পিস' মানে শোষণের স্থিতাবস্থা। আপনি কেবল সংবাদ পড়ছেন না, আপনি পাঠ করছেন এক অদৃশ্য শত্রুর লেখা ইতিহাস।

"তারা যে হাত বাড়ায়, সেটা কখনোই খালি থাকে না।"

ইতিহাসে রথচাইল্ড নামটি প্রায়ই উচ্চারিত হয় পরোপকারী, দানশীল ও মানবপ্রেমিক পরিবারের প্রতীক হিসেবে।

বিপুল অর্থ ব্যয়ে হাসপাতাল, পাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি ইহুদী ও খ্রিষ্টান উপাসনালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা তাদের তুলে ধরেছেন 'ফিলানথ্রপিস্ট' হিসেবে– মানবতার সেবক, শান্তির কাণ্ডারী। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এত দানের উৎস কোথায়? আর বিনিময়ে তারা পেয়েছে কী?

১৮০০-এর দশকের শেষের দিকে লন্ডনে রথচাইল্ডদের দানপ্রবাহ এক ভয়ংকর রাজনৈতিক কৌশলের রূপ নেয়। উনিশ দশকে তা আরও দিগুণ বৃদ্ধি পায়। তারা দান করতে থাকলেন রাজপরিবারকে, চার্চকে, বিশ্ববিদ্যালয়কে, এমনকি ইহুদী ধর্মীয় সংস্থাকেও। কিন্তু বিনিময়ে চাইলেন একটিই জিনিস– বিশ্বাস এবং নিয়ন্ত্রণ।

তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত 'দান' ছিল ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণা। এ বিষয়ে আপনি ইতোমধ্যে জেনেছেন। জ্যাকব রথচাইল্ড নিজে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিল– "আমার পূর্বপুরুষরা না থাকলে আজ ইসরায়েল থাকত না।"

তাদের দানপত্র আসলে ছিল ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ইসরায়েলের জমি কেনার চুক্তিপত্র। তারা জানত একবার এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে তা হয়ে ওঠবে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের মিলিটারি ও ইকোনমিক ঘাঁটি।

তারা বিভিন্ন মুসলিম নেতাকেও দান করেছে। মসজিদ বানিয়েছে, শিক্ষাব্যবস্থা গড়েছে, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের কিছু শাসককেও অর্থ সহায়তা দিয়েছে কিন্তু এ দানেরও বিনিময় ছিল– আনুগত্য, নীরবতা ও 'পশ্চিমাপন্থী নীতিমালা' অনুসরণ।

তাদের দান ছিল না খালিস দাক্ষিণ্য। এ ছিল সফট পাওয়ার মানসিক উপনিবেশবাদ। তাদের হাতে তৈরি হয়েছে নতুন এক ভাষা– 'বচনের ভাষা', যেখানে 'শান্তি' মানে আত্মসমর্পণ, 'উন্নয়ন' মানে নিয়ন্ত্রণ, 'দান' মানে ঋণ।

এখানে 'পবিত্র ভূমি' দখল হয় 'ঐতিহাসিক অধিকার' নামে।

এখানে ফিলিস্তিনি শিশুর কান্না ঢাকা পড়ে 'সেলফ ডিফেন্স'-এর শব্দে। এখানে দানশীলতা পরিণত হয় রাজনৈতিক দাসত্বে। যেখানে বাক্য থেমে যায়, প্রতীক সেখানে কথা বলে।

সমস্ত সভ্যতায় কিছু সংকেত থাকে– চোখের আড়ালে অথচ সর্বত্র ছড়িয়ে। রথচাইল্ডদের নিয়ন্ত্রণ শুধু ব্যাংকিং-ব্যবস্থায় নয়, বলা যেতে পারে চোখে দেখা যায় না এমন প্রতীকী ভাষায়, যার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে এক 'গোপন বচনভাষা'– Symbolic Semantics.

এই প্রতীকগুলোর শুরু সেই বাভারিয়ান ইলুমিনাতির সময় থেকে যেখানে Adam Weishaupt নির্মাণ করেন একটি 'গোপন ধর্ম'– না সেটা খ্রিষ্টান, না ইহুদী, না মুসলিম। বরং একটি নতুন ধর্ম: 'জ্ঞানপূজার ধর্ম (Cult of Knowledge)। এখানে জ্ঞান মানে নিয়ন্ত্রণ, আর জ্ঞানের প্রতীক মানে প্রভুতা।

প্রথম প্রতীক ছিল– 'The All-Seeing Eye', এক চক্ষু যা উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে– পিরামিডের মাথায় বসানো সেই চোখ মেলে যা দেখা যায় মার্কিন ডলারে। প্রতীকটি এসেছে মিশরীয় হোরাস দেবতার চোখ থেকে। রহস্যময়, সর্বদ্রষ্টা, সর্বব্যাপী। কিন্তু আজকের এই 'চোখ' আসলে এক নজরদারি-ব্যবস্থার প্রতীক– Big Brother Watching You.

ইলুমিনাতি বিশ্বাস করে—প্রতিটি প্রতীক একটি কোড, একটি শক্তি। একটি Occult Formula. যেমন: উলটো পেন্টাগ্রাম (Five-point star): স্যাটানিক শক্তির প্রতীক। অগ্নিবলয় (Ring of Fire): আত্মা বন্ধনের চিহ্ন। কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া: ধ্বংসের আগমন। প্রজাপতি (Monarch Butterfly): মন নিয়ন্ত্রণের সাইন, MK-Ultra প্রজেক্টের অংশ।

'বিগ ব্রাদার ওয়াচিং ইউ' (Big Brother Watching You) ধারণাটি এসেছে জর্জ অরওয়েলের উপন্যাস Nineteen Eighty-Four থেকে যা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রীয় নজরদারির প্রতীক।

এখানেই আসে তাদের প্রবেশ। তারা জানতেন– বাণিজ্য ও রাজনীতির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ লাগবে। তাই তারা সহায়তা করলেন ম্যাসন, কাব্বালা চর্চা ও হেরমেটিক সংগঠনের বিকাশে। তাদের অর্থায়নে গড়ে ওঠে 'Bohemian Grove', 'Skull and Bones', 'Theosophical Society.' এই সংগঠনগুলো শুধু পরিকল্পনা করে না, তারা প্রতীক দিয়ে পরিকল্পনাকে চিরস্থায়ী করে।

আজকের মার্ভেল সিনেমা, মিউজিক ভিডিয়ো, ফ্যাশন ডিজাইন, এমনকি ফুটবল তারকারাও ব্যবহার করেন এই প্রতীক। আমরা যখন মনে করি অমুক ফুটবলার শুধু একজন খেলোয়াড় তখন তারা দেখাচ্ছেন Horn Sign, One Eye, কিংবা Masonic Gesture.

এইসব প্রতীক জনমনে প্রোথিত হয় অবচেতনে। কিছু ভক্ত দাসত্ব মেনে নিচ্ছে কারণ তাদেরকে বোঝানো হয়েছে– এটা স্টাইল, এটা ফ্যাশন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটা মগজ ধোলাই। একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার আগমনের আগাম রিহার্সাল। তাদের ফিনান্স আর ইলুমিনাতির প্রতীক– এই যুগলবন্দীই গড়ে তুলছে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

Horn Sign: এই প্রতীকটি মূলত 'রক অন' (rock on) বা 'ডেভিল হর্ন' নামে পরিচিত। হেভি মেটাল এবং রক মিউজিক শিল্পীরা এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন তাদের দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য। যদিও বলা হয়ে থাকে– বিদ্রোহ, শক্তি বা রক মিউজিকের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে আড়ালে এসবকে ভিন্ন বার্তা দেয় বলে মতামত দিয়েছে তাত্ত্বিকরা।

Masonic Gesture (ম্যাসোনিক অঙ্গভঙ্গি): ম্যাসনরা তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু বিশেষ অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করেন যা তাদের সংগঠনের পরিচিতি ও গোপনীয়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেলিব্রিটিদের দ্বারা ব্যবহৃত নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গিগুলো ম্যাসনিক কি না, তা প্রমাণ করা কঠিন। সরাসরি বলা যাচ্ছে, প্রকাশভঙ্গি হতেই পারে যে-কোনো রকম। এখানে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে আসলে অনেকের হাসির খোরাক হতে যে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা প্রতীকের গুরুত্ব ব্যাপক আছে এসব জগতে। আবারও বলি– বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিতান্তই আপনার উপর বর্তাবে। এসব তত্ত্ব মানার জন্য কোনো জোর দেইনি। আর দিবও না। ওই যে আদিতে বলেছি, কল্প-কাহিনি মনে করে পড়বেন।

কারুক

নিয়ন্ত্রণের কারক, পরিচয়ের বিভক্তি

> "পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বন্দী সে নয়, যার শরীর শিকলে বাঁধা। ভয়ঙ্কর সে, যার মগজ বাঁধা হয়েছে 'স্বাধীনতার' প্রতীকে।"

সে আসছে... না, কোনো সেনাপতি নয়। না, কোনো ধর্মীয় গুরু নয়। সে আসছে হাসিমাখা মুখে, জ্বলজ্বলে বিজ্ঞাপনচিত্রে, মঞ্চ আলোয় ভেসে থাকা এক মূর্ত প্রতীকে– তারকা, সেলিব্রিটি, আইকন। এই যুগের 'কারক' কে? কার দ্বারা পরিচিত হচ্ছে সত্য-মিথ্যার বিভক্তি? প্রাচীন ভারতে বলা হতো, "নাট্যশাস্ত্র হলো জীবনের দর্পণ"– আজকের বিশ্বের জন্য সেটা হয়ে গেছে "নেটফ্লিক্স, ইনস্টাগ্রাম আর সুপারবোল।"

তারা এই নতুন নাটমঞ্চ গড়লেন নিঃশব্দে। গুপ্ত সংঘের প্রতীকগুলোকে ঢুকিয়ে দিলেন গানের ভিডিও-শোতে, সিনেমার ক্লাইম্যাক্সে, ফুটবলের গোল উদযাপনে। আমরা? আমরা মুগ্ধ দর্শক। নাটকের 'কারক' হয়ে উঠলাম নিজের অজান্তেই।

কোনো তারকা ফুটবলার যখন গোল করে দুই আঙুল তুলে চোখের সামনে দেয়– এটা কি শুধু উদ্‌যাপন? Beyoncé যখন চোখের ওপর হীরে বসিয়ে হাসেন, এটা কি নিছক ফ্যাশন? Elon Musk যখন X নিয়ে টুইট করেন, সেই X কি কেবল লোগো? এসব একেকটি সাইনচিত্র, একেকটি কারক-চিহ্ন, যা ইঙ্গিত করে এক বৃহৎ নিয়ন্ত্রক কাঠামোর দিকে– সাইলেন্ট অথরিটি, যাদের নাম নেই, মুখ নেই, তবুও প্রতিটি চোখের পেছনে তাদের নজর, প্রতিটি ভক্তের হৃদয়ে গেঁথে দেয় এক অদৃশ্য আজ্ঞা।

এই আধুনিক তারকারা হয়ে উঠেছে, 'অর্থে প্রতিষ্ঠিত পুরোহিত'। Priests of Influence. তারা গান গায়, কিন্তু গানের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় প্রোগ্রামড মেসেজ, তারা নাচে কিন্তু পায়ের ছন্দে থাকে মেসোনিক গ্রিড, তারা বক্তব্য দেয়, যেখানে ধর্ম

হয় 'ব্যাকডেটেড', আর সততা হয় কাল্পনিক চরিত্র। সেলিব্রিটি বা তারকারা, তারা কেবল অ্যাথলেট নয়। তারা হলেন 'Brand Vessels', যাদের শরীরে উল্কি করা হয় Eye of Horus, যাদের সোশ্যাল মিডিয়া চালায় AI-ভিত্তিক Propaganda Lab.

এবং এইসব তারকার পেছনে যারা বিনিয়োগ করে, তারা শুধু বিনিয়োগ করে না, তারা নিয়ন্ত্রণ করে। এলিট ওইসব পরিবার endorse করে সেই তারকাদের, যারা 'Cultural Shift' ঘটাতে পারে। তারা খোঁজে এমন মুখ, এমন ফ্যাশন, এমন ভয়েস– যারা প্রজন্মকে ভুল পথে চালিত করবে, কিন্তু তা এমনভাবে, যেন তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছে সে পথ।

এইটাই কারক বিভক্তি। আমার হাতে মোবাইল, কিন্তু আমার আঙুলে বন্দী হয়ে আছে আমিই। আমার চোখে স্বাধীনতা, কিন্তু আমার মনে বসে আছে 'দৃষ্টিনিয়ন্ত্রক'।

ধ্বনি, বর্ণ ও বাগ্‌যন্ত্র- শব্দের সুরে শয়তানের সূচনা

"যে কণ্ঠে ছিল শান্তির গান,
আজ তারই স্পন্দনে শোনা যায় যুদ্ধের আহ্বান।"

রাত্রির নিঃশব্দে যখন শহর ঘুমায়, তখন ঘুমায় না এক নীরব প্রকৌশলী- ধ্বনি। শব্দের সেই রহস্যময় কারিগর, যার তরঙ্গে তরঙ্গে লেখা থাকে আত্মার কোড।

আজকের বিশ্বে আমরা যা শুনছি- তা কেবল বিনোদন নয়। তা একধরণের অস্ত্র। আর এই অস্ত্রের প্রকৌশলী? ওই তারা ও তাদের ছায়াসঙ্গীর মিডিয়া জোট। ধ্বনি মানে শুধু শব্দ নয়। ধ্বনি মানে কম্পন। কম্পন মানে তরঙ্গ। আর তরঙ্গ মানেই- মস্তিষ্কে সরাসরি বার্তা প্রেরণ।

Low Frequency Sound দিয়ে অনুভব নিয়ন্ত্রণ, High BPM Beat দিয়ে হৃদস্পন্দন বাড়ানো, Reverse Audio দিয়ে সাবলিমিনাল বাণী প্রেরণ– সবই বিজ্ঞান, আর এই বিজ্ঞানে ঝুঁকে পড়েছে তাদের মালিকানাধীন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি। গানগুলো আর শুধু প্রেম কিংবা প্রতিবাদের গল্প নয়। "Lucifer, come and set me free."– এই বাক্যটি পেছন থেকে শুনলে, কোন্ জনপ্রিয় পপসংগীতে এটা লুকানো? অথবা যে বাচ্চাদের কার্টুনে মাঝেমধ্যে শোনা যায় অস্পষ্ট হাহাকার– সেগুলো কি শুধুই শব্দ বিভ্রম?

না... এসব হলো বাগ্‌যন্ত্রের অভিশাপ। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, কিছু মিউজিক ভিডিয়োতে ব্যবহৃত ফ্রেম প্রতি সেকেন্ডে (FPS) এমনভাবে সাজানো, যা মানুষ চোখে ধরতে পারে না, কিন্তু অবচেতন মন তা পড়ে ফেলে। এক সেকেন্ডেরও কম সময় ধরে দৃশ্যমান Eye of Horus, inverted cross, goat-headed Baphomet, আর এগুলোই তৈরি করে ধীরে ধীরে এক মানসিক ধর্মান্তর।

অ্যালবাম কভার, স্টেজ ডিজাইন, পোশাকের রঙ- সবকিছুতেই একধরনের কাব্বালাহিক চিত্রভাষা। আমরা যখন শুনছি- 'freedom', তারা বলছে 'control'; আমরা ভাবছি, 'party', তারা পাঠাচ্ছে 'ritual'; আমরা দেখছি মঞ্চ, তারা আঁকছে সন্দেহের ছায়াপথ।

বর্ণ, ধ্বনি আর বাগ্‌যন্ত্র- এই তিনটি এখন আর শুধু সংস্কৃতির বাহক নয়, এরা হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী এক নতুন ধর্মের প্রচারক। এই ধর্মের নাম নেই, গ্রন্থ নেই, কিন্তু রয়েছে এক অদৃশ্য ঈশ্বর- যার প্রতীক ত্রিভুজ, যার চোখ সর্বত্র, আর যার নাম মুখে আনা মানেই সমাজের বিদ্রোহী হওয়া।

আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছি- সবকিছু বিশ্বাস করার কোনো দরকার নেই। কল্প-কাহিনি বা রূপকথার অতিরঞ্জিত গল্প হিসেবে পড়বেন। যা ঘটে, তাই রটে। অবিশ্বাস্য মনে হলে, এটা তাই। গল্প পড়ার মতো করে পড়ুন আর গল্প হিসেবেই চিহ্নিত করুন এই কথামালা। এখানে অনুগ্রহপূর্বক সিরিয়াস হবেন না। আমি কখনোই বাধ্য করব না আপনি এসবকিছু গিলে ফেলেন। তবে অনুরোধ থাকবে, এসব বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন। তো কথা না বাড়িয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া যাক।

পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় শক্তির নাম যদি একটায় সীমাবদ্ধ করতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে 'গুপ্ত সংঘ' শব্দটি উচ্চারিত হবে। হাজার বছরের রাজনীতির পেছনে, যুদ্ধের ইন্ধনে, প্রযুক্তির উদ্ভাবনে কিংবা সংস্কৃতির ছাঁচে যারা থেকেছে ছায়ার মতো, তারা যেন রূপ বদলানো এক ভয়ঙ্কর ছায়াপথ। এরা কারা?

আমরা তাদের চিনি— ভিন্ন নামে, ভিন্ন রূপে, ভিন্ন মুখোশে। অনেকটা যেন বাংলার এক অঞ্চলে যেই ফল 'বেতফল' নামে পরিচিত, অন্য অঞ্চলে তা 'লটাবড়ই'। কিন্তু ফল সেই একটাই। নাম যতই আঞ্চলিক ভেদে ভিন্ন হোক জিনিস একটাই তেমনি

এলিট পরিবারগুলোর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা এই সিক্রেট সোসাইটিগুলোর কেন্দ্রবিন্দু এক– ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, আর বিভ্রান্তির রাজনীতি।

আজ যে নামটি সর্বাধিক আলোচিত তা ইলুমিনাতি। এটা আদতে সেই পুরনো পরিবারটিরই ভিন্ন পরিচয়। শুধু মুখোশ বদলেছে, চরিত্র নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে এই নামটি নিয়ে শতশত বই, প্রবন্ধ, ভিডিও ঘুরে বেড়ায়। কেউ একে বানানো গল্প বা গাঁজাখুরি কথা বলে হেসে উড়িয়ে দেয়, কেউ আবার গভীর বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু সত্য কী?

ইলুমিনাতি শুধু একটি নাম নয়, এটা একটি চিহ্ন, একটি প্রতীক, একটি পরিকল্পনা। তাদের প্রতীকী চিহ্ন: The All Seeing Eye– সব কিছু দেখতে পাওয়া এক চক্ষু। Pyramid– ক্ষমতার স্তরবিন্যাস। Owl of Minerva– জ্ঞান ও ছায়ার দেবী, গোপন বুদ্ধির প্রতীক। একচক্ষু হিসেবে আমরা কাকে চিনি? ঠিক ধরেছেন।

এই প্রতীকগুলো শুধু মুদ্রায়, সিনেমায়, নাটকে নয়– আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে ঢুকে পড়েছে। কে পরিচালনা করছে ইলুমিনাতি-সহ গুপ্ত সংঘগুলো? ১৩টি পরিবার– বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্লাডলাইন, যারা 'ব্ল্যাক এলিট চক্র' নামে পরিচিত। এদের মূল অস্ত্র দুইটি: Occult Science এবং Economic Dominance.এই পরিবারগুলোই যুগযুগ ধরে ইলুমিনাতির মতো অসংখ্য সোসাইটিকে পুষ্ট করে এসেছে এবং এদের অনেকেই রথচাইল্ডের মতো এলিট পরিবারের সাথে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত।

তাদের লক্ষ্য? বিশ্বব্যাপী দাজ্জালের আগমনকে সুগম করা। প্রতিটি ধর্মই যাকে একভাবে না একভাবে পূর্বাভাস দিয়েছে। খ্রিষ্ট মতে— যীশুর দ্বিতীয় আগমন ও অ্যান্টিক্রাইস্ট-এর আবির্ভাব। হিন্দু মতে— কল্কি অবতার। ইসলাম মতে: ইমাম মাহদী, ঈসা (আ.) এবং দাজ্জাল। আর ইহুদীদের মতে—দ্য ফাইনাল মসীহ, যে জন্ম নিয়ে আসবেন তাদের মধ্য থেকেই; দাজ্জাল।যখন এতগুলো ধর্ম এক সুরে কথা বলে, তখন সেটাকে "কথার কথা" বলে উড়িয়ে দেওয়া আর নিজের চোখ বুজে থাকা একই কথা। এখানে আবার সকল ধর্মকে সত্য বলেছি সেটা মনে করিবেন না; পূর্ণাঙ্গ সত্য শুধু ইসলাম, এটা শুধু ধর্ম নয় আমাদের জীবন ব্যবস্থা!!

গুপ্ত সংঘগুলো সেই 'সুরক্ষিত দ্বার', যার পেছনে অপেক্ষা করছে দাজ্জালের পর্দা উন্মোচনের প্রস্তুতি।রাত যত গভীর হয়, পৃথিবীর সত্য তত লুকিয়ে পড়ে কালো

চাদরে। মানুষ ঘুমায় অথচ কিছু মানুষ জেগে থাকে– নয় চোখে, নয় আলোয়, বরং গোপন গুহার অন্ধকারে, ঠান্ডা পরিকল্পনার টেবিলে। এই পৃথিবীর মোড় ঘোরানো যত বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত, তার নেপথ্যে এক অদৃশ্য আঁচড়– গুপ্ত সংঘের ছায়া।

আমরা Illuminati-কে জানি। জানি বলে ভাবি আমরা বুঝি। কিন্তু ইলুমিনাতি কখনো একা ছিল না। সে ছিল শুধুই একটি রূপ– একটি শুরুর নাম। ছায়া জগতের দরজা খুললেই দেখা মেলে বহুরূপী সাম্রাজ্যের যেখানে প্রতিটি গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে টার্গেট করে নিয়ন্ত্রণে নেয় মানব সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্তর। ১৩টি পরিবারের সাথে আছে ১৯টি গুপ্ত সংগঠন। নিচে সংক্ষেপে সেই সংঘগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

১. Freemason: শয়তানি নকশার স্থপতি:

সদর দরজা খোলার পথ ফ্রিমেসন। ফ্রি মানে স্বাধীন, আর মেসন মানে একজন নির্মাতা। তারা নিজেকে 'আধ্যাত্মিক নির্মাতা' দাবী করে, কিন্তু বাস্তবে? তারা আত্মাকে দাস বানায় নফসের। এটা ধর্মীয় চেহারার একটি ফাঁদ যেখানে ঈশ্বর নেই, আছে কেবল আত্মম্ভরিতা। এরা বলে, "তুমি নিজেই তোমার ঈশ্বর"– এ এক দানবীয় চিন্তা, যা আদিপাপের পরম্পরায় নতুন করে ফিরিয়ে আনে ইবলিসকে। আপনি এই সংঘ নিয়ে অন্তর্জালে অনুসন্ধানে পাবেন– ফ্রিমেসনরি একটি প্রাচীন ভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠন। এটা মূলত নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সমাজসেবামূলক কাজের উপর ভিত্তি করে গঠিত। অর্থাৎ এরা সেবামূলক একটা নিরীহ সংগঠন। এমনই বলা আছে। কেউ তো আর বলে বেড়াবে না জনসম্মুখে যে তারা লুসেফার গোত্রীয়।

২. Skull and Bones: রাজনীতির করাল ছায়া:

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন গুহার ঘন কুয়াশায় জন্ম নেয় 'স্কাল অ্যান্ড বোনস'। প্রতি বসন্তে মাত্র ১৫ জন তরুণের উপর পড়ে দৃষ্টিপাত– এ যেন নিয়তির টান। এর সদস্য ছিলেন জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ, জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফটের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরা। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বলে, তারা সিআইএ-এর চেয়েও শক্তিশালী। আফগানিস্তান থেকে মেক্সিকো যেখানেই মাদক, যেখানেই দেহপাচার– সেখানেই নাকি তাদের ছায়া! এবং বিশ্বাস করুন বা না করুন যুদ্ধের সিদ্ধান্তও এই গোষ্ঠীর বৈঠকে পরিণত হয় বিনোদনের বিষয়। যদিও এসব তথ্য বিবেচিত করা হয়

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও অতিরঞ্জিত গল্প হিসেবে। তবে অতীতে ঘটা অঘটন ও সাম্প্রতিক ঘটা অঘটন সবকিছু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

৩. Bohemian Club: শিল্পীর ছদ্মবেশে শয়তান:

'বোহেমিয়ান ক্লাব বা বোহেমিয়ান গ্রোভ'– সান ফ্রান্সিসকোর এক অরণ্যতল ধ্যানস্থল, যেখানে নাট্যকারদের ঢোকার নাম করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় শকুনদের। এই ক্লাবে চলচ্চিত্র পরিচালক, সাংবাদিক, আইন প্রণেতা আর রাষ্ট্রপ্রধানেরা নাটক করেন কিন্তু মঞ্চের পর্দার পেছনে চলে বাস্তব নাটক– মানবজাতিকে প্রজেক্ট বানানোর মহাপরিকল্পনা। এখানে রয়েছে অদ্ভুত রিচ্যুয়াল, বিশাল পেঁচা-মূর্তি এবং আগুনের মধ্য দিয়ে পাশবিক আত্মাহুতি। তারা একে বলে– 'Cremation of Care'। তবে অন্তর্জাল ও বই ঘাটলে তাদের বিষয়ে এভাবে জানা যায়– এই সংঘ সান ফ্রান্সিসকোর একটি বেসরকারি ক্লাব যেখানে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একত্রিত হন। তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'Cremation of Care' নামে একটি প্রতীকী অনুষ্ঠান হয় যেখানে তারা জীবন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করার প্রতীক হিসেবে একটি কুশপুত্তলিকা পোড়ায়। এটা একটি নাট্যমূলক অনুষ্ঠান। তথা স্বীকার করা হয় না তারা শয়তানী রিচ্যুয়াল করে। এসবকে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে আবির্ভাব করে তারা উড়িয়ে দিতে চায়। এখন যদি বলি আপনিও তাই করবেন। তাহলে মনে হয় না ভুল বলা হবে। এসব বিশ্বাসের থেকে অনেক দূরে আপনারও অবস্থান।

৪. Knights Templars: সন্ত্রাসী ধর্মের মুখোশ:

ক্রুসেড যুদ্ধের ছত্রছায়ায় জন্ম নেয় 'নাইটস টেম্পলার'। প্রথম চেহারায় তারা ছিলেন খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের রক্ষক। কিন্তু শীঘ্রই তারা হয়ে ওঠে মধ্যযুগের সবচেয়ে ধনী ও সংগঠিত মিলিটারি অর্ডার। তাদের হাতে জমা হয় ব্যাংকিং, রাজনীতি, এমনকি খ্রিষ্টান ধর্মেরও নিয়ন্ত্রণ। কথিত আছে তারা জেরুজালেম 'সোলোমনের গোপন জ্ঞান' খুঁজে পেয়েছিল– কাব্বালাহ, সিগিল, আলকেমি। এরা নাকি গোপনে সেই জ্ঞান আজও বয়ে বেড়ায় বর্তমান এলিট সমাজে।

৫. Bilderberg Group: আধুনিক বিশ্বের ছায়া সরকার:

এই গোষ্ঠীর নামই যেন এক শ্বাসরোধ করা শব্দ। বিল্ডারবার্গ– যেখানে সারা পৃথিবীর অতিধনীর দল বসে ঠিক করে আগামী নির্বাচনে নিয়ন্ত্রিত কোন দেশ কোন পথে যাবে। এনজিও-ব্যাংক সবই তাদের হাতের পুতুল। এদের বৈঠক হয় বার্ষিক কিন্তু গোপনীয়তায় এমন মোড়ানো যেন সেখানে ঢুকতে পারা মানেই ঈশ্বর হওয়ার

মতো কিছু। রথচাইল্ড পরিবার এখানেও ছায়া দিয়ে গেছে তাদের সিগনেচার সিলমোহর। কেউ বলেন, গাজা-ইসরায়েল যুদ্ধ, কেউ বলেন ব্রেক্সিট, কেউ-বা করোনা ভাইরাস এবং নানা ভাইরাসজনিত রোগ– সবই বিল্ডারবার্গ টেবিল থেকে নির্দেশিত পরিকল্পনা। অবিশ্বাস্য লাগতেই পারে। টিকা, ঔষধ তথা মেডিক্যাল সরঞ্জাম– সবকিছু মধ্যে আছে টাকা নামক এক ঈশ্বর এবং নিয়ন্ত্রণের এক জঘন্য পন্থা। করোনা ভাইরাস এসে তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে এমন একটা নিয়ন্ত্রক শয়তান সংঘ আছে– যারা ভাইরাস সৃজন করে ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর টিকা, ঔষধ তথা চিকিৎসার নামে ডলার ও মানুষ– দুই-ই নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেকের মধ্যে বাজেভাবে আক্রমণ করেছে বলে বিশ্বের গণমাধ্যমের সুবাদে জানা গেছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়।

৬. Society of Jesus (Jesuits): ধর্মের নামে গোপন খেলোয়াড়:

এই সংগঠন জন্ম নেয় খ্রিষ্টধর্মকে বিশ্বজয় করার ব্রত নিয়ে। কিন্তু তারা কেবল প্রচারক নয়, তারা সর্বাধিক রাজনৈতিক মনোবৃত্তির পাদ্রীসমাজ। অনেক বিশ্লেষক বলেন, ভ্যাটিকানের ছায়া সরকারও মূলত জেসুইটদের হাতে। এই সংগঠন শিক্ষা, জ্ঞান ও কথার জাদু দিয়ে বিশ্বব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে। (এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা পেয়ে যাবেন।)

৭. Black Nobility: রক্তে লেখা অভিজাত অন্ধকার:

এই গোষ্ঠীর নামেই আছে ভয়। 'ব্ল্যাক নোবিলিটি'– একটি ছায়া অভিজাত শ্রেণি, যারা ইউরোপের মধ্যযুগীয় রাজপরিবারের উত্তরসূরি। প্রাচীন রোমের তথা ইতালির প্রভাবশালী প্রাচীন অভিজাত পরিবার। কিন্তু এরা আর রাজদণ্ড হাতে থাকে না বরং ব্যাংক, মিডিয়া, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বসে চালায় যুদ্ধ ও শান্তির বোতাম। পোপদের পেছনের পুতুলদাতার নাম যদি জানতে চান, অনেকেই ইঙ্গিত করে 'Black Nobility'-এর দিকে। কিছু সূত্র বলছে, Rothschild ও Orsini পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এই গোষ্ঠীর সাথে। ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও ভিন্ন স্রোতের তাত্ত্বিকরা তা অসংখ্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। (এই পরিবার নিয়ে পরবর্তী অন্য অধ্যায়ে আরও কিছু জানতে পারবেন।)

৮. Rosicrucians: গোপন জ্ঞান ও গোলাপের সিলমোহর:

একটি গোলাপ আর একটি ক্রুশ– এটাই তাদের প্রতীক। Rosicrucian Order এক রহস্যময় দার্শনিক সমাজ যার জন্ম ১৬শ শতাব্দীতে। তারা বলে, "আলো

আসবে গোপন জ্ঞান থেকে।" কিন্তু সেই আলো কতটা ঈশ্বরীয় আর কতটা লুসেফেরীয় তা আজও বিতর্কিত। তাদের দাবী– তারা জানে আত্মা কীভাবে স্থায়ী করা যায়, দেহ্ কীভাবে নিরাময় হয় এবং মানবজাতিকে 'ঈশ্বরতুল্য' করে তোলাই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু অতিরিক্ত জ্ঞানই্ যখন ধ্বংস ডেকে আনে?

৯. Opus Dei: ঈশ্বরের নামে রক্তাক্ত শাসন:

'ঈশ্বরের কাজ'– এই্ নামে জন্ম নেয় Opus Dei, রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভেতর একটি বিশেষ গোষ্ঠী। তাদের বলা হয় 'চুপিসারে ঈশ্বরের সেনাবাহিনী'। তারা ধর্মীয় অনুশাসনের নামে চালায় মানসিক নিয়ন্ত্রণ, দেহকে শাস্তি দেওয়া হয় পবিত্রতার পরীক্ষায়। এমনকি কথিত আছে, ভ্যাটিকান রাষ্ট্রের অনেক সিদ্ধান্তের পেছনে Opus Dei-এর চাপ থাকে। এই্ গোষ্ঠীকে নিয়ে ফিকশন তথা ব্রাউনের উপন্যাসে 'The Da Vinci Code'-এ উঠে এসেছিল ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ। ফিকশন হলেও ব্রাউনের তথ্যগুলো ছিল খুবই্ ভয়ংকর। ঘটনা থেকেই্ ফিকশন হয়েছে।

১০. Club of Rome: জনসংখ্যা-সাম্রাজ্যের রূপকার:

১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Club of Rome, মূলত বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে গঠিত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট– এই পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। আর সেই অনুপাতে বাড়ছে বিপদ। কিন্তু এর সমাধান কী? জনসংখ্যা হ্রাস? পরিবেশ ধ্বংসের দোহাই দিয়ে এই গোষ্ঠী নাকি গোপনে সমর্থন করে mass depopulation policy. কেউ কেউ বলেন— আফ্রিকায় ভ্যাকসিন ট্রায়াল, খরা, দুর্ভিক্ষ এসব 'প্রাকৃতিক' নয়, এসব পরিকল্পিত 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ' এবং আর্থিক বাণিজ্য।

১১. Trilateral Commission: ত্রিমুখী শাসনের পরিকল্পনাকারী:

১৯৭৩ সালে David Rockefeller এবং Zbigniew Brzezinski মিলে গঠন করেন Trilateral Commission– আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানের নেতৃত্বে একটি সুদৃঢ় গ্লোবাল এলিট প্ল্যাটফর্ম। তারা বিশ্বাস করে– জাতিসংঘ পর্যাপ্ত নয়, মানবজাতির উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য চাই আলাদা কৌশলী সংস্থা। অর্থনীতি, গণমাধ্যম, জলবায়ু সবকিছুর নেপথ্যে তাদের পদচিহ্ন। অনেকে বলেন এই সংগঠনই্ মূলত নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করেছে– New World Order-এর রূপরেখা।

১২. New Age Movement: এক নতুন ধর্ম যার ঈশ্বর সে নিজেই:

নিউ এজ মুভমেন্ট প্রথমে এসেছিল 'আধ্যাত্মিক মুক্তির' মুখোশ পরে। কাগজে-কলমে একে একটি ধর্মীয় বা দর্শনভিত্তিক আন্দোলন বলা হলেও আদতে এটা হলো এক বিধর্মী সংস্কৃতির খোলসে মোড়া লুসেফারীয় চিন্তার বিস্তার। নিউ এজ অনুসারীরা বলে– "সব ধর্মই এক", "তোমার মধ্যে আছে দেবত্ব", "মেডিটেশনই পরিত্রাণ" এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা– "ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই, সবই অভিজ্ঞতা।"

এদের মন্ত্র হলো: Truth is what you believe অর্থাৎ সত্য আর সত্য নয়, বিশ্বাসই সত্য। এটা দাজ্জালী চিন্তার হুবহু ছায়া। স্রষ্টা নয়, 'তুমি'-ই পরম! যে-কোনো সীমার লঙ্ঘন এদের কাছে মুক্তির পথ। তবে প্রচলিত ইতিহাস এসব স্বীকার করে না। তারা তথ্য দেয় এই নিউ এজ মুভমেন্ট একটি আধ্যাত্মিক এবং স্ব-উন্নয়নের বিভিন্ন বিশ্বাস এবং অনুশীলন নিয়ে গঠিত একটি বিস্তৃত আন্দোলন। ২০২৫ সালেই হলিউডে নির্মিত হয়েছে একটা সিনেমা। নাম: 'টুগেদার'– এই সিনেমার গল্পের মধ্যে নিউ এজ-এর পুরাতন পরিত্যক্ত মন্দির, গুহা ইত্যাদি এনে একটা আধিভৌতিক তত্ত্ব আনা হয়েছে। Tim এবং Millie একদিন হাইকিং করতে গিয়ে আবিষ্কার করে একটি পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির। এটা একসময় ছিল একটি নিউ এজ কাল্ট-এর উপাসনালয়, যেখানে অনুসারীরা বিশ্বাস করত– "মানুষের মূল স্বরূপ একত্ব; আমাদের শরীর বিভক্ত হওয়ায় আমরা অসম্পূর্ণ।"

মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে অদ্ভুত ভাস্কর্য, ভগ্ন প্রতিমা, পুরনো লিপি এবং একটি রহস্যময় পানির উৎস। Jamie নামের এক স্থানীয় ব্যক্তি তাদের জানান যে এই কাল্ট দম্পতিদের জন্য বিশেষ আচার পালন করত যেখানে পবিত্র পানি স্পর্শের পর শরীর ধীরে ধীরে মিশে যেত, যাতে তারা প্রাচীন একত্বে ফিরে যেতে পারে।

পরিত্যক্ত গুহার মন্দিরের পাশের ঝরনার পানি পান করার পর Tim এবং Millie সকালে দেখে– তাদের পা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। প্রথমে তারা ভয় পায়, ভাবে হয়তো কোনো ছত্রাক বা সংক্রমণ। কিন্তু ধীরে ধীরে শরীরের আরও অংশ একত্রিত হতে থাকে– প্রতিটি টিস্যু, পেশি ও হাড় একে অপরের সাথে মিশে যায়।

এই প্রক্রিয়াটি শারীরিক দিক থেকে ভীতিকর কিন্তু একইসাথে সিনেমাটি গভীর প্রশ্ন তোলে: "যখন দুইজন সত্যিই এক হয়ে যাবে তখন কী ভালোবাসা টিকে থাকবে নাকি ব্যক্তি সত্তা বিলীন হয়ে যাবে?"

এই সিনেমাটা 'নিউ এজ মুভমেন্ট সংঘকে প্রমোট করে সিনেমায় বলতে চেয়েছে– আমরা কি সত্যিই এক হওয়ার জন্যই জন্মেছি নাকি স্বাধীন সত্তা হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য? সম্পর্কের পূর্ণতা কি অন্যকে গ্রাস করা নাকি অন্যের অসম্পূর্ণতাকে মেনে নেওয়া? ভালোবাসা কি স্বাধীনতা নাকি অস্তিত্বের বিলুপ্তি? অর্থাৎ পুরো এজের কাল্ট তত্ত্ব এখানে আনা হয়েছে।

১৩. Theosophical Society: পূর্ব-পশ্চিম রহস্যের মিলনমঞ্চ:

১৮৭৫ সালে হেলেনা ব্লাভাটস্কি নামের এক রহস্যময় নারী প্রতিষ্ঠা করেন Theosophical Society. এর লক্ষ্য ছিল– পুরাতন ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে একত্র করে 'নতুন জ্ঞান' আবিষ্কার করা। বাস্তবে এটা ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ ও লুসেফারীয় আধ্যাত্মিকতার এক মহামিলন।

এদের বিশ্বাস– মানুষ এক বহুমাত্রিক আত্মা, পুনর্জন্ম সত্য, আত্মা একসময় ঈশ্বরতুল্য হয়ে যাবে। অথচ এর গভীরে আছে খ্রিষ্টবিরোধী চিন্তা, কাব্বালাহ, ওককাল্ট ও সিগিল ম্যাজিক। অনেক গবেষক বিশ্বাস করেন, আজকের নিউ এজ মুভমেন্টের বীজ রোপণ হয়েছিল এই 'থিওসফিকাল সোসাইটি'-র মাধ্যমে।

এই সংগঠন নিয়ে উইকি করলে বা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানতে গেলে জানবেন, তা বলেছে– এটা একটি দার্শনিক আন্দোলন যা হেলেনা ব্লাভাটস্কি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এটা বিভিন্ন ধর্মের রহস্যময় দিকগুলো একত্রিত করার চেষ্টা করে ইত্যাদি আরও কিছু ধারণা দেওয়া।

১৪. Tavistock Institute: চিন্তা-নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দু:

মনের গভীরে ঢুকে মস্তিষ্ককে বদলানো– এটাই Tavistock Institute-এর কাজ। ১৯২১ সালে লন্ডনে গঠিত এই ইনস্টিটিউট মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'মানসিক যুদ্ধ' নীতি বাস্তবায়নের জন্য তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ইনস্টিটিউট নিয়ন্ত্রণ করেছিল ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের মনোবল।

কিন্তু যুদ্ধের পর এরা সরে যায় মাঠ থেকে এবং ঢুকে পড়ে সংস্কৃতি, গণমাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থায়। তারা পরীক্ষা চালায় সংগীতের মাধ্যমে কীভাবে এক প্রজন্মকে বিপথে নেওয়া যায় (রক মিউজিক, ড্রাগ কালচার) তারা তৈরি করে মন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত সামাজিক থিউরি। যেমন: gender fluidity, identity crisis, hyper-individualism, হিপি কালচার, অবাধ যৌনতা, ও লিঙ্গ রাজনীতির বিস্তারে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে বহু গবেষক মত দিয়েছেন।

এদের হাতে তৈরি হয় 'সোশ্যাল কন্ডিশনিং' -এর ম্যানুয়াল। আপনি কী খাবেন, কী পরবেন, কী নিয়ে ভাববেন– সবকিছু যেন পূর্ব নির্ধারিত। উইকি-সহ বিভিন্ন ওয়েবসাইট এসব তথ্য উল্লেখ করে না। তারা লিখে রেখেছে, এটা একটি অলাভজনক সংস্থা যা মূলত সামাজিক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে।

১৫. Council on Foreign Relations (CFR): নীতিনির্ধারকদের ছায়া সরকার:

আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির অলিখিত মালিক বলা হয় CFR-কে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের মূল কাজ– বিশ্বরাজনীতিকে এমনভাবে প্রভাবিত করা, যাতে আমেরিকান এলিট শ্রেণি তার কাঙ্ক্ষিত নীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে। CFR-এর সদস্যরা শুধু সরকারে নয় রয়েছে মিডিয়া, একাডেমিয়া ও কর্পোরেট দুনিয়ার শীর্ষে। তাদের সদস্যপদের তালিকায় ছিল:

- হিলারি ক্লিনটন।
- জর্জ সরোস।
- হেনরি কিসিঞ্জার।
- বারাক ওবামা।

তাদের প্রকাশিত সাময়িকী, 'Foreign Affairs' নাকি আসলে সেটা গোপন বিশ্বনীতির ব্লুপ্রিন্ট। অনেকেই বিশ্বাস করেন ফিলিস্তিন আগ্রাসন, ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তান, আরব বসন্ত– এসব নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সিআরএফ-এর টেবিলে। তবে তারা এসব কখনোই স্বীকার করে না। তারা তাদের বিষয়ে বলে— তারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে গবেষণা করে। এটাই নাকি তাদের কাজ।

১৬. Lucis Trust: জাতিসংঘের ভিতর এক অলক্ষ্য লুসেফারীয় শক্তি:

Lucis Trust– প্রথমে এর নাম ছিল 'Lucifer Publishing Company' (১৯২২ সালে). পরবর্তীতে তারা বুঝেছিল Lucifer নামটা জনসমক্ষে একটু ঝুঁকিপূর্ণ তাই নাম বদল করে রাখা হয় Lucis Trust.

এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Alice Bailey– এক থিওসফিস্ট, যিনি দাবী করেন- তিনি "তিব্বতীয় একজন উচ্চ আত্মা" (Djwhal Khul)-এর কাছ থেকে টেলিপ্যাথিক বার্তা পেতেন। তিনি লিখে ফেলেন ২৪টি বই যেখানে উল্লেখ থাকে–

বিশ্বব্যবস্থার একটি নতুন ধর্ম আসছে। দাজ্জাল (তিনি যাকে Maitreya বা Christ Consciousness বলেছেন) আসবে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিতে। জাতিসংঘ হবে সেই ধর্ম ও প্রশাসনের কেন্দ্র।

বিস্ময়ের বিষয়– আজও 'Lucis Trust' হলো জাতিসংঘের '*ECOSOC*' বিভাগের 'আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা'। জাতিসংঘের মেডিটেশন রুম, 'world goodwill' ইনিশিয়েটিভ এবং বেশ কিছু এনজিও তহবিলের মূল চাবিকাঠি এই সংগঠনের হাতেই।

Lucis Trust বিশ্বাস করে, বিশ্ব এক কেন্দ্রীভূত ধর্ম, সরকার ও শিক্ষা কাঠামোর অধীনে আসবে। কিন্তু সেই 'ধর্ম' হবে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরসত্ত্বার জাগরণ (ঠিক দাজ্জাল যেমন দাবী করবে...)।

১৭. UN Agenda ২০৩০: মানবাধিকারের মুখোশে বৈশ্বিক দাসত্বের রূপরেখা:

'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG)'– এই শব্দগুলো শুনলে মনে হবে, কত সুন্দর! মানবকল্যাণকর উদ্যোগ। কিন্তু আমরা যদি UN Agenda ২০৩০-এর ভেতরটা খুলি সেখানে বেরিয়ে আসবে এক চরম বাস্তব— A total global surveillance society.

এই এজেন্ডার মূল লক্ষ্য: খাদ্য, পানি, জমি, শিক্ষা, প্রযুক্তি, এমনকি সন্তান পালনের অধিকার পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ও কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে নেওয়া। সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করে 'shared economy' চালু করা যেখানে আপনি কিছুই নিজের বলতে পারবেন না, শুধু ভোগ করতে পারবেন। Digital ID, carbon credit score, Central Bank Digital Currency (CBDC)– এগুলোর মাধ্যমে মানুষকে বায়োমেট্রিক-নিয়ন্ত্রিত দাসত্বে পরিণত করা।

নির্বাচন, নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা– সবই এই 'উন্নয়নমূলক' টার্গেটের আড়ালে গলাটিপে হত্যা করা হচ্ছে। এটা একটা শান্তিপূর্ণ প্রযুক্তিভিত্তিক ফ্যাসিবাদের পরিকল্পনা। তবে আপনি এদের বিষয়ে অন্তর্জালে জানতে পারবেন, জাতিসংঘের এই এজেন্ডাটি মূলত দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্য নিয়ে গঠিত। তাদের কাজ মানবিক, তারা বিশ্বের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষার কাজ করে। সামনে এক কাজ হলেও ভিতরে ভিন্ন কাজই করে যাচ্ছে।

১৮. World Economic Forum (WEF): আধুনিক যুগের নায়কবেশী দানব:

ডাভোসে প্রতি বছর হয় একটি গোপন সামিট- World Economic Forum এর বৈঠক। এখানে যোগ দিতেন:

- বিল গেটস,
- ক্লাউস শোয়াব,
- ক্রিস্টিন লাগার্দ,
- জাকারবার্গ,
- ট্রুডো,
- গুগল, মডার্না, ফাইজার, ব্ল্যাকরক, ন্যাটো– প্রায় সব প্রধান খলনায়ক।

এই ফোরামের প্রধান, *Klaus Schwab*, তার বই 'The Great Reset' -এ সরাসরি বলেন:

"You will own nothing, and you will be happy." অর্থাৎ, মানুষ সবকিছু হারাবে কিন্তু তাকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হবে যেন সে সেটাই চায়।

এরা AI, Bioengineering, Transhumanism, Digital Surveillance -এর মাধ্যমে এমন এক সমাজ গড়তে চায়, যেখানে মানুষ আর মানুষ থাকবে না– একটা ডেটা পয়েন্ট হয়ে যাবে।

তাদের লক্ষ্য: শরীরে চিপ বসানো। জিন এডিটিং করে মানুষকে পরিবর্তন। ইমোশন কন্ট্রোল করে গণচেতনা পরিচালনা। আর শেষমেশ, "*Singularity*" যেখানে মানুষ ও মেশিন মিলিয়ে এক নতুন প্রাণীর উদ্ভব হবে– নতুন 'ঈশ্বর'।

আপনি তাদের নিয়ে অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন– তাদের "The Great Reset" এবং "You'll own nothing, and you'll be happy"– এই স্লোগানগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি নয় বরং একটি 'শেয়ারিং ইকোনমি' এবং টেকসই জীবনযাত্রার ধারণাকে নির্দেশ করে। তথা সবকিছু সরল করে বলে রেখেছে ও দেখিয়ে থাকে।

১৯. Club of Budapest: পরিবেশ ও মানবতাবাদের নামে মানসিক শাসন:

এই গোষ্ঠী শান্তির বার্তা দেয় পরিবেশ রক্ষা আর মানবতাবাদের গল্প শোনায়। কিন্তু তাদের মূল এজেন্ডা? 'Global Consciousness Shift'– অর্থাৎ সব জাতি, ধর্ম

ও সংস্কৃতিকে ভেঙে দিয়ে এক সর্বজনীন মানসিক কাঠামো তৈরি করা, যেখানে কোনো আলাদা বিশ্বাস থাকবে না।

তাদের দাবী— পৃথক ধর্ম বা জাতির ধারণা মানবসভ্যতার অন্তরায়। একজাতিক সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের নেতৃত্ব থাকবে নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞানী বা এলিটদের হাতে।এই ধারণা আবার ঘুরে ফিরে Lucis Trust, UN Agenda ও WEF-এর সাথেই মিলে যায়।

আর কে বাকি? কেউই না। কারণ সবকিছুকেই ঢেকে রেখেছে একটা নেটওয়ার্ক– একটি মাকড়সার জাল, যার প্রতিটি সুতো একেকটি সংঘের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। মানবজাতি ভাবে সে স্বাধীন, অথচ প্রতিটি ধারণা, বিশ্বাস, নির্বাচন, যুদ্ধ– সবই তন্ত্রনায়কের অনুরণন।

এটাই নতুন পৃথিবীর সংবিধান, এটাই নতুন এক অদৃশ্য রাজত্বের ইঙ্গিত।

অধিকরণ

একটা অদ্ভুত সত্য আছে: জন্ম থেকেই আমাদের বলা হয় আমরা স্বাধীন। অথচ এই স্বাধীনতার ভিত জন্ম নেয় গোপন চুক্তিতে যা লেখা হয় আঁধারের কালি দিয়ে। আর সেই অদৃশ্য কালি দিয়ে যারা লেখে তারা কেউ নির্বাচিত নয়, জনতার কাছে জবাবদিহিতার প্রয়োজন নেই। তারা নীরব খেলোয়াড়– ব্ল্যাক নোবিলিটি থেকে ট্রায়লেটারাল কমিশন পর্যন্ত বিস্তৃত।

কে কার পুতুল?

এখন ভাবছেন– এইসব সংঘ তো আলাদা তাহলে যোগসূত্র কোথায়? সবই একটি গাছের ডালপালা। মূলত একটি কেন্দ্রীয় বীজ থেকে জন্ম নেওয়া। একদিকে রথচাইল্ডদের ফিনান্সিং, অন্যদিকে Jesuits ও Opus Dei-এর মাধ্যমে ধর্মনির্ভর নিয়ন্ত্রণ, মিডিয়া ও চলচ্চিত্রে Bohemian Club ও Rosicrucians-এর চিন্তাজনিত আগ্রাসন, আর রাজনৈতিক কাঠামোয় Skull and Bones, Trilateral Commission, Bilderberg Group– সবাই একসাথে কাজ করছে। এ যেন এক এলিয়েন (জ্বিন) ইন্টেলিজেন্সের মতো– যারা দেখায় না নিজেকে কিন্তু পরিচালনা করে আপনার প্রতিটি জীবনবিন্দু। আপনি যাকে ভোট দেন সেই প্রার্থী আসলে কার প্রতিনিধি? যে ভ্যাকসিন নিচ্ছেন তার পেছনের গবেষণা আসলেই জনকল্যাণমূলক? যে যুদ্ধ টিভিতে দেখছেন তা কি প্রকৃত যুদ্ধ? না কি আগেই ঠিক করা এক অদৃশ্য চুক্তি? এখানে শেষ নেই। বলা যায় এখানেই শুরু।

এবার আমরা ঢুকছি মানুষের আত্মা ও মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ-ঘরে। এখানে যুদ্ধ হয় না বন্দুক দিয়ে, হয় ধারণা দিয়ে। এখানে বুলেট নয়, ব্যবহৃত হয় বক্তব্য। আর এই নতুন যুদ্ধের সেনাপতি? নামটা শুনলেই আপনি হয়তো ভাববেন, বড়জোর একটি এনজিও। কিন্তু না, এরা 'উন্নয়ন' নয়, করে উন্মাদনার বাণিজ্য।

যখন আপনি কোনো গান শুনে আবেগে ভেসে যান, বুঝবেন Tavistock আপনার মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে। যখন আপনি বলেন, "সব ধর্মই এক"– বুঝবেন Theosophy আপনাকে দখলে নিয়েছে। যখন আপনি নিজের মধ্যেই ঈশ্বর খুঁজতে শুরু করেন, বুঝবেন New Age আপনার বিশ্বাসকে প্রতিস্থাপন করছে। আর যখন আপনি খবর পড়ে ভাবেন, "হয়তো এটা ভালোই"– তখন CFR আপনার মস্তিষ্কে consent manufacturing চালিয়ে যাচ্ছে।

এরা যুদ্ধ করে না অস্ত্র দিয়ে, এরা যুদ্ধ করে চিন্তা দিয়ে। এরা শাসন করে না গদি থেকে, করে পাদদেশ থেকে।

প্রাধান্য

আমরা যদি ভাবি, দুনিয়াটা সরকার চালায় তাহলে ভুল ভাবব। যদি ভাবি, জাতিসংঘ মানবতার জন্য কাজ করে তবে তা হবে বিভ্রম। কারণ এদের মঞ্চে যারা মুখোশ পরে আসেন তাদের পেছনে লুকিয়ে থাকে কয়েকটি সুদূরপ্রসারী সংঘ, যারা মানবজাতিকে আবারও তৈরি করতে চায়– তাদের মতো করে।

তাহলে? আমরা এখন এমন এক সময়ের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে– জাতিসংঘ ঈশ্বরের নামে নয়, 'মানব-ঈশ্বর' গড়ার প্ল্যাটফর্ম। WEF আর UN মিলে তৈরি করছে নতুন এক ধর্মহীন সভ্যতা। Lucis Trust দিয়ে সেই সভ্যতার আত্মাকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আর মানুষ? সে স্রেফ হয়ে যাচ্ছে ডেটা ফাইল, বায়োমেট্রিক সত্তা, চিপযুক্ত প্রাণী। এই যদি হয় সভ্যতা, তাহলে বর্বরতাই শান্তি।

বিপ্রতীপ

রাত্রি গভীর হতে হতে যেন একটি অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে পৃথিবী গিলতে শুরু করল। আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে নীরবতার এক ভয়াল যন্ত্রণা। আধুনিকতার আলোয় সেজে থাকা শহরগুলো বাইরে থেকে যতটা জ্বলজ্বলে, ভেতরটা ততটাই ফাঁপা– নৈঃশব্দ্যের ফাটলে লুকিয়ে আছে এক ভয়াবহ যন্ত্রণা। আমরা প্রবেশ করব সেই গভীর দ্বন্দ্বে যেখানে আধুনিক সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আধ্যাত্মিকতার প্রতিরোধ। যেখানে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে শেষ দিনের খিলাফাহ।

মনে করুন এক বিশাল দাবার বোর্ড। একদিকে আছে ব্ল্যাক রক, রথচাইল্ড, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, ইউএন, ন্যাটো, ইসরায়েল এবং তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর ভবিষ্যৎ-দাসত্বের রোডম্যাপ। অন্যদিকে আছেন অদৃশ্য একজন– যাঁর নাম ইতিহাসের গহ্বরে অচিরেই উচ্চারিত হবে তিনি আমাদের ইমাম মাহদী। এই খেলায় কোনো রক্ষাকবচ নেই কেবল বিশ্বাস আর প্রতিরোধ।

আধুনিকতা আমাদের কী দিয়েছে? একটি আয়না: যেখানে আমরা নিজেদের দেখতে পাই কিন্তু নিজেকে ছুঁতে পারি না। একটি ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে বলে– "How can I help you?" কিন্তু কখনো হৃদয়ের যন্ত্রণা বোঝে না। একটি মেটাভার্স: যেখানে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয় শরীর থেকে শুধু মডেলিং করে একাকিত্বের ডিজিটাল শূন্যতায়।

কিন্তু একই সময়ে পৃথিবীর কোথাও একজন বালক চোখ মেলে তাকাচ্ছে মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসে। তার হৃদয় জানে এ বিশ্ব এক দাসত্বের ফাঁদে বন্দী। তার নাম ইতিহাস জানে না কিন্তু আকাশ জানে। সে সেই বিপ্রতীপ শক্তির প্রতীক যিনি আসবেন প্রতিটি প্রজন্মের নির্যাতনের হিসেব মেলাতে।

তাঁর হাতে থাকবে না AI, থাকবে আল্লাহর ইলহাম।তাঁর সাথে থাকবে না সেনেট থাকবে সাহাবীদের রুহানী ছায়া। তাঁর বাহিনী হবে না নিউক্লিয়ার, হবে সিজদাহরত যুবক-যুবতীদের দোয়ার বাহিনী।

আমরা কোন পক্ষে? নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রযুক্তিগত বন্দীত্ব, না আখেরী যুগের আধ্যাত্মিক মুক্তি?

চোখের সামনে এক ভয়াল যুদ্ধের ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে। সেখানে অস্ত্র হবে না শুধু গুলি, এখানে তথ্য, মনস্তত্ত্ব, ডিএনএ, ভাষা, স্মৃতি– সবই অস্ত্র। এবং সেই যুদ্ধে আপনিই একজন যোদ্ধা।

যৌগিক বাচ্য

রাত যত গভীর হয় অদৃশ্য শত্রুরা তত নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। তারা গুলি ছোঁড়ে না, যুদ্ধ করে না খোলা ময়দানে। তারা আক্রমণ করে মনে, ভাষায়, চেতনায়– তথ্যের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় বিষাক্ত মতাদর্শের সূক্ষ্ম সুচ। যেখানে শত্রু আছে কিন্তু অস্তিত্ব নেই; গোলা-বারুদ নেই কিন্তু রক্ত ঝরে মনোজগতে।

রথচাইল্ডদের ব্যাংক যেমন নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি তেমনি তাদের মিডিয়া কন্সোরটিয়াম নিয়ন্ত্রণ করে জনমত। CNN, BBC, FOX, Al Jazeera, Netflix, Disney, Meta– সবই যেন এক বিশাল Mind Architecture কোম্পানির শাখা অফিস। লক্ষ্য একটাই– কী দেখব, শুনব, ভাবব– সব নিয়ন্ত্রণে রাখা।

এই তথ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে কিন্তু এখন তা রূপ নিয়েছে এক নতুন রূপকথায়। সোশ্যাল মিডিয়া হলো সেই 'দৈত্যের কুয়ো' যেখানে মানুষ নিজেরাই নেমে যায় আত্মপরিচয়ের চূর্ণবিচূর্ণ পানিতে।

প্রতিদিন, প্রতিটি পোস্ট, প্রতিটি হ্যাশট্যাগ, প্রতিটি মিম– একটি করে সূক্ষ্ম অস্ত্র। 'ফেমিনিজম', 'LGBTQ Rights', 'Climate Emergency', 'Free Speech', 'Cancel Culture'– এগুলোর পেছনে যদি থাকে একটিই গোপন হাত তবে সেগুলো হয়ে দাঁড়ায় মন-মগজ বদলের অস্ত্র।

আর এখানেই 'যৌগিক বাচ্য'-র ভয়াবহতা। একটা বাক্য– "ইসরায়েল আত্মরক্ষার অধিকার রাখে।" দেখতে নিরীহ কিন্তু এর পেছনে রয়েছে হাজার বছর ধরে চলা এক জেনোসাইডকে বৈধতা দেওয়ার প্রচারযন্ত্র। আরেকটা উদাহরণ: "ইসলামীক টেরোরিজম"। এটাও একটি বাক্য কিন্তু এতে এক হাজার বছরের সভ্যতাকে বানানো হয় 'হুমকি'।

তথ্য আজ অস্ত্র। সবই একটি Mind-Warfare এর অংশ।

বিধেয় পদ

আমরা বলি– 'আইন' যা বলছে তা আমাদের মানতে হবে। বলেছে সেটা করতে, তাই করতে হবে।'আইন' পবিত্র কোনো গ্রন্থের চেয়েও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক সমাজে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে– এই আইন কে তৈরি করে? কারা ঠিক করে,কাকে ভালো বলা হবে আর কাকে অপরাধী?

বিশ্বব্যাপী এক 'Rule Engine' কাজ করছে যা শুধু রাষ্ট্রীয় সংবিধান নয়– আমাদের চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস, সম্পর্ক, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক এমনকি শিশুর নাম পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে এগুলো *'engineered choices'*. নতুন এই বিশ্বব্যবস্থায় আইন হচ্ছে একেকটি *command-line instruction*, যার রচয়িতা সেই শক্তিধর গোষ্ঠী– যাদের নাম কেউ স্পষ্ট করে বলে না। তবে আমরা জানি– তারা The Architect Families, রথচাইল্ড, রকফেলার, ওয়ারবার্গ, হ্যাভার্ড-কার্নেগি ও তাদের ছায়াবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার এক অলিখিত চুক্তির খেলা।

উদাহরণ: কাগজে লেখা আইন বলে 'গণতন্ত্র' কিন্তু বাস্তবে আমরা ভোট দেই তাদের মধ্যেই কাউকে যাদের মনোনয়ন আসে কর্পোরেট ডিল থেকে। আইন বলে 'Speech is Free' কিন্তু প্ল্যাটফর্ম ও অ্যালগরিদম বলে দেয়– কোন কথা ভাইরাল হবে আর কোন কথা চেপে যাবে। শিক্ষাব্যবস্থায় আইন আছে 'Critical Thinking'-এর কিন্তু পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে সাজানো যাতে প্রশ্ন করা শেখা যায় না, শুধু মুখস্থ করে পাস করা শেখা যায়।

পৃথিবীতে এমন কিছু আইনি চুক্তি আছে যা কোনও পার্লামেন্টে পাস হয়নি কিন্তু তা মান্য হয় প্রতিটি রাষ্ট্রে।

উদাহরণ: IMF, World Bank, WHO, WEF, WTO, NATO– তারা কোনো দেশের নাগরিক নয় কিন্তু দেশগুলো তাদের কথা মানে। কারণ এগুলো হলো Shadow Legislators– যাদের হাতে রয়েছে De Facto Power of Law.

এখনকার আইন আর নৈতিকতা নয়, আইন এখন compliance tools– যার কাজ হলো মানুষকে গৃহপালিত করে রাখা। শেখানো হয়– সফল হতে হলে 'নিয়ম মানো' কিন্তু তারা বলে না, নিয়ম তৈরি করা হচ্ছে এক গোপন গোলটেবিলে যেখানে মানবতা নয় বরং মুনাফা ও নিয়ন্ত্রণই একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাই বলা যেতে পারে, আমরা আইনের অধীনে নই। এক গভীর ষড়যন্ত্রের অধীনে। আইন এখন নিয়ন্ত্রণের ভাষা, আজ্ঞার শেকল। সে কেমন? এটা হলো আধুনিক দাসত্ব। যা আমরা কমবেশি সবাই প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছি। কীভাবে করে যাচ্ছি?

এ কেমন আধুনিক দাসত্ব?

১. নয়টা-পাঁচটা নয়, এখন চব্বিশ ঘণ্টার দাসত্ব: ছুটির দিনেও মেইল চেক করতে হয়, বার্তায় সাড়া দিতে হয়, Zoom-এ ঢুকতে হয়। কোনো শৃঙ্খল নেই কিন্তু 'ডেডলাইন' নামক চাবুক আমাদের ঘাড়ে।

২. চুক্তিপত্রে বেতন লেখা কিন্তু আত্মাবিক্রি হচ্ছে: আমাদের চিন্তা, সৃজনশীলতা, স্বাধীনতা– সব চলে যায় কোম্পানির মালিকানায়। আমরা কাজ করি, তারা মালিক হয় আমাদের সৃষ্টি ও সময়ের।

৩. Performance Review নামের এক আধুনিক আদালত: আমাদের বিচার হয় প্রতি ছয় মাসে– আমরা কতটা নতজানু হতে পেরেছি তার পরিমাপে। আমাদের 'initiative', 'ownership', 'team spirit'– সব মানে একটাই, আমরা কতটা নিশ্চুপ!

এই দাসত্বের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো, আমরা এটা উপভোগ করতে শিখে গেছি। আমাদের বোঝানো হয়েছে– এই চাকরিই সাফল্য, এই ক্লান্তিই পূর্ণতা, এই ক্লান্তিময় 'Woke Culture'-ই সভ্যতার উন্নতি, পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি। আসলে আমরা কী নিজের জন্য কাজ করছি, না কি এমন কারও জন্য যার নাম পর্যন্ত আমরা জানি না?

"Work is Worship"– এই শ্লোগান এখন এক কর্পোরেট মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কাকে পূজা করি? উত্তর: জানি না। শুধু জানি, প্রতিদিন এক অনুজ্ঞার শিকার। যেখানে আমরা করণও, কৃতও, ক্রিয়াও– কিন্তু আমরা নিজেই নেই।

অব্যয় পদ: *ভাষার ছলনায় সত্য বিকৃতি*– 'But', 'However', 'Actually' -এর গোপন হাতিয়ার:

বলা যেতেই পারে, 'অব্যয়' মানে তো নিরীহ কিছু শব্দ– তাদের কোনো ব্যাকরণগত প্রভাব নেই, তাদের কোনো রূপান্তর নেই। তবে এই 'অব্যয়' শব্দগুলোই আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী *ভাষাত্মক অস্ত্র* হয়ে দাঁড়িয়েছে?

একটা বাক্য দেখুন:

- "ইসলাম শান্তির ধর্ম, 'কিন্তু'......"
- "ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি আছে, 'তবে'..."
- "আমি মুসলিম বন্ধুদের শ্রদ্ধা করি, 'আসলে'..."

এই 'কিন্তু', 'তবে', 'আসলে'– এই শব্দগুলো সত্যের পিঠে বসে থাকা বিষের বর্শা। এই একটি মাত্র অব্যয় দিয়েই কীভাবে পালটে যায় পুরো বাক্যের উদ্দেশ্য, কীভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একজন মানুষের বিশ্বাস, জাতি, ইতিহাস?

আধুনিক 'স্পিচ স্ট্র্যাটেজি'-র সবচেয়ে প্রভাবশালী যন্ত্র হলো, এই অব্যয়গুলো। পশ্চিমা মিডিয়া, কর্পোরেট ভাষা, একাডেমিক কনফারেন্স, এমনকি বিজ্ঞাপনের ভাষাতেও, এই শব্দগুলো ব্যবহার করে– তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সত্যকে অস্বীকার না করে দুর্বল করা হয়। মৌন আপস তৈরি করা হয় দর্শকের মনে। এটা একধরনের "*প্রাকৃতিক মানসিক রীতিনীতির ম্যানিপুলেশন*"।

আপনি শুনলেন: "The Israeli response is excessive but they are defending themselves." অথবা "I believe in religious freedom, however Islam needs reform."– এইসব বাক্য হচ্ছে আধুনিক যুদ্ধের গোলা-বারুদ। আমাদের মনে একসাথে সহানুভূতি ও সন্দেহ, সমর্থন ও সংশয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

এই 'অব্যয়'-এর রাজনীতি বুঝতে হলে, বুঝতে হবে 'Discourse Engineering' কাকে বলে? একটা জাতির বিশ্বাস কীভাবে বদলায়? একটি প্রজন্ম কীভাবে নিজের ধর্ম, ইতিহাস, পরিচয় নিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে? তার পেছনে যে সরঞ্জাম ব্যবহার হয় তার অন্যতম হলো এই শব্দগুলো।

কেউ একজন বলল– "আমি মুসলমান, কিন্তু আমি সহিংস না।" বা "আমি ইসলামী ভাবধারায় চলি, নামাজ আদায় করি, টুপি-পাঞ্জাবি পরি এবং দাড়ি রেখেছি বলেই কিন্তু আমি জঙ্গি বা টেরোরিস্ট নই। আমি উগ্রপন্থী দলের কেউ নই।"সে নিজেই সেখানে নিজের পরিচয়কে অপ্রমাণ করতে বসে গেছে। 'কিন্তু'–এর পরে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবচেতন সাফাই দিচ্ছে। এজন্যই এই ভাষার স্বাধীনতা তখনই

বিপজ্জনক যখন শব্দগুলো হয়ে ওঠে শৃঙ্খল। কেন এসব বলতে যাব? আত্মপরিচয়ের প্রকাশ এভাবে কেন করব? এসব বলে কি আমরা পশ্চিমাদের তকমাকে গ্রহণ করে নিচ্ছি না?

সংখ্যাবাচক পদ

"একটি মৃত্যুই ট্র্যাজেডি, হাজার মৃত্যু পরিসংখ্যান।"

—স্ট্যালিনের এই কথাটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনই বাস্তব। কারণ এই পৃথিবীতে সংখ্যাই এখন সবচেয়ে বড় যুক্তি। যেখানে হৃদয় ব্যর্থ সেখানে 'data' জিতে। একসময় মানুষ সত্য বিচার করত বিবেক দিয়ে। এখন সত্য মাপা হয় সংখ্যা দিয়ে:

- GDP কত?
- Followers কয়জন?
- View কত লাখ?
- Growth rate কত?
- Fact-check score কত শতাংশ?

সব যেন গণিত। সব যেন নিছক সংখ্যা। পবিত্র বললে যারা হাসে ভাইরাল বললে তারা বিশ্বাস করে। সংখ্যা এখন নতুন ঈশ্বর। একটা উদাহরণ দিই– পশ্চিমা মিডিয়ায় প্রতিদিন ফিলিস্তিনে শহীদ হচ্ছে শতশত নারী-শিশু তবুও হেডলাইন হয়– "১০০ রকেট লঞ্চ, ৩ জন নিহত, ১৭টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত।"– এই সংখ্যাগুলো মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করে মানুষকে। কারণ যখন সংখ্যায় বিচার করা হয় তখন সহানুভূতির স্থান নেয় পরিসংখ্যানে।

সংখ্যা এখন সত্য চাপা দেওয়ার প্রাচীন জাদু। একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া? তাদের 'growth' ৬.৩% দেখান। একজন ব্যক্তি প্রশ্ন তুলছে? তাকে দেখান– "মাথাপিছু আয় বেড়েছে ২৩%।"এই বৃদ্ধির গন্ধ কি সব মানুষের পাতে যায়? এই সংখ্যা কী মানুষের চোখে ঘুম আনে, না আনে মস্তিষ্কে বন্দীত্ব?

আধুনিক দাসত্বে সংখ্যাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বেতন দিয়ে মূল্যায়ন, CGPA দিয়ে বিচার, Follower দিয়ে প্রভাব, Poll দিয়ে মতামত।

রথচাইল্ড, রকফেলার, ওয়ারবার্গরা সংখ্যার নিয়ন্ত্রক। তারা ঠিক করে- কোন তথ্য সামনে আসবে, কোনটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে তথ্যের সমুদ্রে।

এটা শুধু সংবাদ নয়, এটা Narrative Management by Numbers. তথ্য হয়ে যায় Narrative, আর সত্য হয়ে যায় 'interpretation under construction.'

বর্তমান শিক্ষার্থীরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪-১৭ ঘণ্টাই পড়াশোনা করে। ডুবে থাকে একাডেমিক বইয়ের পাতায়। ক্লাসের বাইরেও একাধিক কোচিং আবার বাড়িতেও পড়তেই থাকে। এতে তারা ভালো ফলাফল করছে। কেউ কেউ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সর্বোচ্চ স্থান নিয়ে সুযোগ পেয়ে শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাচ্ছে। এটাই তাদের জীবন।

বুয়েটে প্রথম স্থান পাওয়া একজন শিক্ষার্থী অধিকার করে নিজের মেধার জানান দিয়েছিল কিছুদিন আগে। সে তার সাক্ষাৎকারে বলেছিল, নামাজ, ঘুম, খাওয়া, গোসল বাদে সবসময়ই পড়ত। সিনেমা দেখত না, নন-একাডেমিক বই পড়ত না, দেশের সমস্যা বা ভালোমন্দের খোঁজ রাখত না। আবার আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতির বিষয়ে খবর নিত না, গান-বাজনা ইত্যাদি সবকিছু থেকে বিরত থেকেছে। শুধু নোট বই পড়েছে।

তার স্বপ্নের কথা জানতে চাওয়াতে বলেছিল, সে বিদেশি টেক কোম্পানিতে চাকরি করবে। এটাই তার স্বপ্ন। সে তার গণ্ডিতে আবদ্ধ। তার জীবনের মানে হলো, পড়াশোনা ও সাফল্য এরপর একটা তথাকথিত চাকরি– সেই চাকরিতে যন্ত্রের মতো ১০-১২ ঘণ্টা খেটেখুটে কিছু কাগজের ডলার প্রাপ্তি। অতঃপর নিজের সারাটা জীবন যন্ত্র-মানবের মতো পার করে দেওয়া।

না আছে সেখানে প্রান্তিক মানুষের জন্য দায়িত্ববোধ, না আছে হৃদয় গহ্বরের ভালোবাসা। না আছে সমাজ ও প্রিয়জনের কাছে দায়বদ্ধতা। তার সবটুকু ধ্যান ও ভালোবাসা তার নিজস্ব ক্যারিয়ার নিয়ে। এটাই তার প্রতিভা। বাকি সবকিছু তার কাছে উহ্য! রোবটের মতো খেটে, সেই অর্থ দিয়ে ভোগবিলাসে জীবন পার করবে। কারণ সে পরিশ্রম করেছে। এটা তার প্রাপ্য। তবে তার এই বিষয় আমার ভালো লাগেনি।

আর আমার ভালো লাগা না লাগাতে তার কিছু আসে যায় না। সে এখন কথিত সফলকামী। প্রকৌশলী হয়ে সে রাষ্ট্র ও বিশ্বের উন্নয়ন সাধনে বিরাট ভূমিকা পালন করবে। মেধাবীদের কাছে সাফল্য পানির মতোই সহজ বস্তু। যার যার কাছে তার তার জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে। এটাই তার লক্ষ্য ছিল, সে সেই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে– তাকে অভিনন্দন!

সিরাজগঞ্জের একজন রেপার আছে। সে নিজেকে 'জাইরালোক' বলে নামকরণ করেছে। ছেলেটা ভালো র‍্যাপ করে। তার একটা লিরিক্স আমার বেশ ভালো

লেগেছিল। তার সেই লিরিক্সটা এমন, "ঘুম থেকে ওঠার পর কেমন লাগে জানো? দুনিয়াতে আমার জন্ম হইছে কেন?"

হাসাহাসি ও ছেলেটাকে গালাগাল করতেই পারেন। অপসংস্কৃতি ও সমাজের আগাছা বা জোকার, টিকটকার বলতেই পারেন। তবে তার প্রশ্নটা মারাত্মক! ঘুম থেকে ওঠার পর যেমনই লাগুক। কিন্তু প্রশ্ন ওটাই আমার জন্ম হয়েছে কেন? জন্ম কেন হয়েছে সেই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে যখনই যাবেন তখনই নতুন দুনিয়ায় আপনার আগমন ঘটবে। ওই ছেলেটাকে কটাক্ষ করে লাভ নেই। বুয়েটে প্রথম হওয়া সেই শিক্ষার্থী যেমন তার জীবন মানে বিদেশি টেক কোম্পানিতে চাকরি দিয়ে অর্থ কামানো বোঝে, ওই র‍্যাপার ছেলেও তার এই প্রতিভা দিয়ে অর্থ কামানোই বোঝে। যার যার ভিন্নতা আছে, সবাই এক হবে বা একই চিন্তা করবে– এমনটা নয়। ওর গণ্ডিতে ও ঠিকঠাক। তার ঘরনার লোকদের সাথে সে যথাযথ। সুইপার যেমন তার পেশায় সঠিক, তেমনই একজন ব্যারিস্টারও তার পেশায় সঠিক। যে যা পারে, সেটাই তার কর্ম, সেটাই তার প্রতিভা। এখানে ছোট-বড় বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। তাই আপনার ও আমার ভালো লাগা ও না লাগা দিয়ে ওদের কিছু আসে যায় না। এদের দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

"ঘুম থেকে ওঠার পর কেমন লাগে জানো? দুনিয়াতে আমার জন্ম হয়েছে কেন?" এই লাইনগুলোর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে। ওই র‍্যাপার কোনভাবে তা বলেছে, এটা জানা নেই। তবে আমি এমনই কিছু আভাস পেয়েছি। মানুষ যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন সে কয়েক মিনিট ধ্যানে ও জ্ঞানে থাকে না। ওইসময় যদি এই কথাটা মনে আনা যায় তখন এমন একটা ভাবনার সৃষ্টি হয়। তা মানুষকে আধ্যাত্মিক জগতেই প্রত্যাবর্তন করায়। কেন জন্ম হয়েছে আপনার? নিজেকে একবার প্রশ্ন করুন? আপনার দুনিয়ায় জন্ম নেওয়ার কারণ কী? ফকির লালনের পদে বলা আছে এভাবে–

> “পোনামাছ লাফ দিল পুকুরে, শনিবার বারো বেলায় দুপুরে।
> তাই তো ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে জলে, মনের পাখি পালায়
> বনে, কে জানে কীসের ছলে!”

এই পদে রূপকে জোড়া লাগিয়ে এক অদ্ভুত অর্থময়তার সৃষ্টি করেছেন লালন। রূপক দুটি হলো, 'দুপুর' আর 'পুকুর', এই দুইটা শব্দের সাথে প্রচুর অতিরিক্ত দ্যোতনা যুক্ত আছে।

"পোনামাছ লাফ দিল পুকুরে"– এখানে পোনামাছ দেহরূপী পুকুরে আত্মার আগমনকে বোঝাচ্ছে। মানুষ জন্মগ্রহণ করলেই দেহপুকুরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

"শনিবার বারো বেলায় দুপুরে"– বার বেলা মানে জীবনের পূর্ণতা। শৈশব, কৈশোর, যৌবন শেষে জীবনের মধ্যাহ্ন– অর্থাৎ মৃত্যুর দিকেই যাত্রা। এজন্যই বোধহয় বাঙালি সমাজে বিপদ ও অসহায় অবস্থাকে বলা হয়– বারোটা বেজে গেছে। মধ্যাহ্ন মানবজীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের মধ্যাহ্ন এমনই অবস্থার নির্দেশ করে। লালন এজন্য দুপুরের আগে 'বারো' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

"তাই তো ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে জলে"– জীবনে যত জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, দোলাচল– সবই একের পর এক ঢেউয়ের মতো আসে ও কেটে যায়।

"মনের পাখি পালায় বনে, কে জানে কীসের ছলে!"– আত্মা (মনের পাখি) মৃত্যুর পরে দেহ ত্যাগ করে অজানা গন্তব্যে চলে যায়। কেমন করে যায়, কোথায় যায়– এ রহস্য সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না।

লালন বোঝাতে চেয়েছেন– মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী ও অস্থির, পুকুরের ঢেউয়ের মতো। আত্মা দেহে আসে যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে তেমনি হঠাৎ করেই চলে যায়। মানুষ জানে না মৃত্যু কখন আসবে, আত্মা কোথায় যাবে। তাই আত্মার আসল পরিচয় ও গন্তব্য জানতে হলে ভেতরের সাধনা প্রয়োজন, বাহ্য আচার বা কুসংস্কার নয়।

পোনামাছের লাফ– আসলে মানুষের হৃদয়ের আকস্মিক আলোড়নের রূপক। শনিবার বারো বেলা– সময়ের অনিত্যতা ও দেহঘড়ির ইঙ্গিত। ঢেউয়ের পর ঢেউ– মানসিক আলোড়নের প্রতীক। মনের পাখি পালানো– আত্মার অস্থিরতা বা মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করছে।

দুপুর শব্দটা আক্ষরিকভাবে মধ্যাহ্ন হলেও বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও নানান দ্যোতনা বহন করে। শহর হোক বা গ্রামে, দুপুর মানেই কর্ম-ব্যস্ততা থিতিয়ে আসা, মনে একটা অলস, নিশ্চিন্তির ভাব, আর একটা গা-এলিয়ে আনা আমেজ। দুপুরের এই মুহূর্তগুলোতে প্রায়সই, ব্যস্ততার অভাবে আর চারিপাশে ঘটনা-জগৎ জুড়িয়ে এলে, আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার মুখোমুখি হই। এই সুন্দর অলস জাগরণের মূহুর্তগুলি অনেকেই বিবৃত করেছেন নিজস্ব কায়দায়। জীবনানন্দ, ফররুখ আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, আল্লামা ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি অসংখ্য কবি দুপুর নিয়ে কবিতা লিখেছেন। যার প্রতিটা কবিতায় অর্থবহ।

'পুকুর' শব্দটা বাউল-তত্ত্বে খুবই গভীর আর পূজিত একটা শব্দ। সম্ভবত বাউল ঘরানার আরও কয়েকশ বছর পূর্বে বাংলার তন্ত্র আর দেহাত্ম চিন্তাধারার উদ্ভব। 'পুকুর' বলতে দেহ-মন-চেতনার কোনো অজ্ঞাত স্তরের কথা বোঝায়। দৃষ্টির অগোচরে, আর নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষণের বাইরের কোনো জগৎ, কিন্তু শরীর মনের মধ্যেই বিরাজমান। লালনের ভাষায়, খাচার পাখির মতো মাঝে মাঝে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। সহজীয়াদের ভাষায়, 'সহজ' বা অন্তর্লীন একটা মানবের বিচরণ সেখানে। এই পুকুরে ডুব দিলে আর ভেসে ওঠা যায় না, ডুব দিতে পারাটাই সাধনার অংশ। বাউলরা আত্ম-বিদ্রুপ করে বলে, "ডুব দিতে শিখলি না বাবার পুকুরে!"

লালনের কথায় পুকুর বা ডুব দেওয়ার এরকম অনেক নমুনা আছে, অতি সহজ ভাষা, অতিশয় গভীর মানে, যেমন: "গেড়ে গাঙ্গের ও ক্ষ্যাপা, তুই হাপুর হুপুর ডুব পাড়িলি, এবার মজা যাবে বোঝা কার্তিকের উলানির কালে..."

'দুপুর' আর 'পুকুর'-এর এই ভারি ব্যাঞ্জনাগুলো মাথায় রেখে একটা ছবি কল্পনা করা যাক–

একটা অলস, নিরিবিলি, নিস্তরঙ্গ দুপুরে হঠাৎ নিস্তব্ধতাটা খানিক ভেঙে একটা মাছ হঠাৎ ঘাই মারল। মাছটা টুপ করে লাফ মেরেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন নিথর পুকুরের গভীর তলদেশের আবছা জানান দিয়ে গেল। মাছটা মিলিয়ে যাওয়ার পরেই শুরু হলো স্থীর পুকুরের গায়ে মৃদু মৃদু ঢেউয়ের রোল।

এখন পড়ে মনে হবে যে লালন একটা অদ্ভুত মানসিক জাগরণের কথা বর্ণনা দিচ্ছেন। 'বাউল' বা 'বাউলা' কথাটার মানে হলো, "যাকে ভর করেছে", বা যার গায়ে "বদ-হাওয়ার ছোঁয়া" লেগেছে। এমনই একটা মনের গভীরে পোকা নড়ে ওঠার খবর এখানে হাজির হয়, এই শব্দ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে।

রুশ সাহিত্যতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন, কবিতা আর উপন্যাসের মধ্যে ফারাক বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "উপন্যাসে ভাষার বা শব্দের ব্যবহার তার পরিচিত অনুষঙ্গের মধ্যেই বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে। অন্যদিকে কবিতার কাজই হলো, কোনো শব্দ বা দ্যোতক-কে তার অনুষঙ্গ থেকে বিযুক্ত করে সম্পূর্ন অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষিতে এনে হাজির করা।" শিল্পকলার ক্ষেত্রে কোনো সঙ্গায়ন বা বর্গিকরণই চূড়ান্ত নয়। কিন্তু বাখতিনের এই প্রস্তাবটা এই ক্ষেত্রে খুব চমৎকার খাটে। 'দুপুর' আর 'পুকুর'-কে একসাথে এনে আক্ষরিক অর্থের বাড়ন্ত অনেক অর্থময়তা অর্জন করতে পেরেছেন লালন।

এখন আমাদের উপলব্ধি হলো, 'পুকুর' ও 'দুপুর'। আমরা আমাদের পুকুরে কী চাষ করছি? সেই পোনামাছ কী চাচ্ছে? পোনার ঝাঁক কখন কীভাবে চলাচল করছে? কোন পোনামাছ লাফ দিয়ে কী জানান দিচ্ছে? সেই খোঁজ দুপুরে নিতে হবে। বুয়েটের সেই শিক্ষার্থীর পুকুরে দুপুর বেলায় নিজের তথা ব্যক্তি স্বার্থের পোনামাছ লাফ মেরেছে। আর ওই র‍্যাপারের পুকুরে দুপুর বেলায় লাফ মেরেছে ভাইরাল ব্যক্তি স্বার্থের পোনামাছ! আমার দৃষ্টিতে দুজনেই সমান। দুজনের কাছেই দেশ, সমাজ, জনগণ, কিছুই পাবে না। তারা তাদের স্বার্থ ও অর্থের কাছে জিম্মি। তারা উভয়ই ওই দুয়ের দাস! গ্রন্থগত বিদ্যা ক্ষণেক আলোকিত করতে পারে তবে তা সময়ের সাথে অস্ত যায়। তখন অন্ধকার প্রকট হয়ে নেমে আসে।

তখন আর সময় থাকে না, ওই পুকুর তখন মৃত হয়ে যায়। সেখানে পোনামাছের ঝাঁক তো দূর, ছোটো রেণুও থাকে না। তখন উপলব্ধি হয়, কী করলাম জীবনে? কাদের জন্য করলাম? আমি কী পেলাম? তখন আর সেই পুকুরে পোনামাছের ঝাঁক দেখা যায় না। মরা পুকুরে আবর্জনা, ব্যাং, সাপ, পোকা থাকে– পোনামাছ নয়। জীবন তো একটাই, ক্ষণিকের অতিথি আমরা সবাই। এখানে কী আমাদের উচিত নয় যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এক আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য বাঁচা? কেউ কারও উপর নির্ভর করে না আল্লাহ্ ছাড়া সকলের রিজিক ও কর্ম নির্ধারিত। তাহলে কেন নিজের সুন্দর ও পরিপক্ক সময়গুলো এভাবে সাফল্য নামক তথাকথিত অতৃপ্ত আত্মার দাসত্ব করব? মানুষ তার জীবনে কী করবে? তা যখন অন্য কেউ নির্ধারণ করে দেয়, তখন তার অবস্থা চাবি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া পুতুলের মতো হয়ে যায়। তাকে বলা হয়, এটাই তোমার সফলতার লক্ষ্য! তার পেছনে ছুটতে ছুটতে একদিন ক্লান্ত হয়ে যায়। জীবনের শেষ সময়ে এসে আবারও প্রশ্ন করে, কী করলাম আমি আমার জীবনে? তবে তারা তো সেদিকে তখন কখনোই প্রত্যাবর্তন করতে চেষ্টা করেনি! যখন করতে চাইবে– তখন পোনামাছ বলবে, আমার লাফ মারার সময় শেষ হয়ে গেছে।

রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থের পোনামাছ যার পুকুরে দুপুর বেলায় লাফ মারবে। সেই হলো, আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মানুষ। যাদের স্বপ্ন ও সাধনা বাংলাদেশ বির্নিমান করা। বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে নিয়ে কথা বলে নিজেকে উৎসর্গ করা। নিজের মনোনীত ধর্মকে আখরে ধরে ধর্মের সুমহান বাণী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। একজন প্রকৃত ধার্মিক ছাড়া এই কার্য কেউ করতে পারে না। অধার্মিকের কাছে নিজের স্বার্থই আগে প্রাধান্য পায়। লোকদেখানো ভাঁওতাবাজির ইবাদত ও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাকে আমি উৎসাহ দিই না।

কথা হলো, যার যার প্রতিভা ও জীবন নিয়ে সে থাকুক। কাউকে যেমন কটাক্ষ করে গালাগাল করার দরকার নেই, তেমনই কাউকে মাথায় তোলারও দরকার নাই। সমাজের আগাছা পরিষ্কার করার দায়িত্ব যদি কেউ নিতে চায়। তবে তা তার নিজকে দিয়েই শুরু করতে হবে। জীবনে কী হতে চান? সেটা কোনো লক্ষ্য না। জীবনে কী করতে চান? সেটাই আপনার ও আমার সাধনা হওয়া উচিত। তাই করুক সে টিকটক, ভ্লগ, লাফালাফি ইত্যাদি। এসব আপনার আমার দেখার দরকার নাই। কে কোন প্রতিষ্ঠানে টপ করল? কে কোথায় কীভাবে সফল হলো? কে জীবনে কী করল, কী করছে ও কী করবে? তাও দেখার দরকার নাই। কাউকে অনুকরণ করলে জীবনে সফলতা মনে হয় পাওয়া যায়। তবে তাতে নিজস্বতা ও পরিপূর্ণ তৃপ্তি বলে কিছু থাকে না।

জীবনকে বিশেষ কোনোকিছুর জন্য অথবা বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিসর্জন দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তা যদি করতেই হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে করুন। ইতিহাস আপনাকে ধরে রাখবে। শত-হাজার বৎসর পরেও আপনাকে ইতিহাস প্রণিপাত করবে। আর্থিক সাফল্যের জীবন আপনি বেঁচে থাকা অব্দিই দৃশ্যমান থাকবে। বিশেষ কিছু দিবসে কেউ কেউ স্মরণ করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। ওরা কেউই আপনার গহ্বরের আকাশপটের মাধুর্য দেখে আপনাকে সাফল্যের সফল নায়ক মনে করত না, আপনার বাহ্যিক ও আর্থিক অবস্থানের জন্যই তারা আপনাকে সমীহ ও কুর্নিশ করত। যেদিন ব্যক্তি আপনি থাকবেন না সেদিন আপনার দেহের সাথে সাথে আপনার নাম ও তাদের জন্য করে যাওয়া সকল অবদানও ম্লান হয়ে যাবে।

আর অকুতোভয় দুঃসাহসী সংগ্রামের পথে যখন আপনি সর্বজনীন হিসেবে আবির্ভূত হবেন। মানুষ ও দেশের কল্যাণে নিজেকে যখন উৎসর্গ করবেন। যখন নিজের প্রিয়জনকে তার প্রাপ্য মূল্যায়ন করবেন। যখন অর্থ ও ভোগবিলাস নয়, নিজের দায়িত্ব পালন করবেন তখন সেই সাফল্য আপনাকে কেয়ামতের এক সেকেন্ড আগে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবে। সাথে দোয়া দরখাস্ত অবলীলায় চলতেই থাকবে।

তাহলে সফল কে? যারা রোবটের মতো জীবন বানিয়ে ফেলে সাফল্য নামক কথিত ভোগবিলাসের জীবনের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে তারা? যে সাফল্যের পেছনে ছোটার প্রচণ্ডতায় আশেপাশের মানুষ তো দূর, নিজের ভালোবাসার মানুষের সাথেও একটু গভীর আবেগ নিয়ে কথা বলার সময় হয় না, নিজেকেও সময় দেওয়া যায় না– সেই সাফল্যের কী দরকার?

কল্যাণে নিয়োজিত যারা থাকে। তারা সমাজের সকলের খবর নেওয়ার পাশাপাশি নিজের প্রিয়জনকেও গভীর আবেশে মৃত্যুশয্যা অব্দি জড়িয়ে রাখতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত নিতান্তই আপনার। আপনি কোথায় আপনার সাফল্য অনুসন্ধান করবেন? কোনটাকে আপনার সাফল্য মনে করবেন? তা কোনো এক দুপুর বেলায় আপনার পুকুর থেকে পোনামাছের মাধ্যমে নির্ধারণ করে নেবেন।

এজন্য তারা বলে, চাকরিই সাফল্য, এই ক্লান্তিই পূর্ণতা, এই ক্লান্তিময় 'Woke Culture'-ই সভ্যতার উন্নতি, পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি। তবে কার জন্য কাজ করছে, যার নাম পর্যন্ত জানে না! "Work is Worship"– এটাই তাদের প্রধান বাক্য। কাজ সবাই করুক, কিন্তু দাসত্ব থেকে বের হয়ে আসুক। এটা বিপজ্জনক। কর্মক্ষমতা থাকে, তবে স্বাধীন বাক থাকে না। আর এটাই ওরা চায়।

বিশ্বের ক্ষমতাবান পরিবারগুলো– রথচাইল্ড, রকফেলার, হ্যাভার্ড-ইয়েল চক্র– তারা জানে, 'সময়' শুধু ঘড়ির কাঁটা নয়, এটা মানুষের মানসিক জগৎ পরিচালনার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

তাদের মিডিয়া বলে, "৯/১১ happened. America responded." কিন্তু কেউ বলে না, "৯/১১ was used. Muslims were framed." তারা বলে: "Crusades were defensive wars." কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করে না, "যারা ৮০০ বছর ধরে মুসলিম দেশ আক্রমণ করেছে, তাদের জন্য কোন কালের ব্যাকরণ ব্যবহার করব?"

"They bombed Gaza." "Gaza was hit by airstrikes." দুটো বাক্যের অর্থ কীভাবে বদলে গেল? প্রথম বাক্যে কর্মী আছে, করণ আছে, দায় আছে। দ্বিতীয় বাক্যে কর্মী নেই, দায় নেই, শুধু ঘটনার বর্ণনা।

ব্যাকরণে যারা একটু দুর্বল, তাদের জন্য বিষয়টা একটু ভেঙেচুরে বলছি– "They bombed Gaza.": এই বাক্যে একটি কর্তা (They), একটি ক্রিয়া (bombed) এবং একটি কর্ম (Gaza) আছে। এখানে 'They' বা 'তারা' কারা, তা স্পষ্ট না হলেও, বোঝা যাচ্ছে যে, কোনো সক্রিয় পক্ষ এই কাজটি করেছে। এই বাক্যটি একটি সক্রিয় বা Active Voice-এর উদাহরণ। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পক্ষকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে।

"Gaza was hit by airstrikes.": এই বাক্যে কোনো নির্দিষ্ট কর্তা নেই। 'Gaza' এখানে বাক্যের কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, কাজটি যে ঘটিয়েছে, তার উল্লেখ নেই। বাক্যটি একটি নিষ্ক্রিয় বা Passive Voice-এর উদাহরণ। এখানে

ঘটনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু কে ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভাষাগত দিক থেকে, এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করে সংঘাতের উৎসকে অস্পষ্ট করে ফেলা হয় যা অনেক সময় রাজনৈতিক ভাষণে বা সংবাদমাধ্যমে দেখা যায়। আর এটাই ওই কুখ্যাতরা করে থাকে। মিডিয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই ওদের নিয়ন্ত্রণে। তাই আমাদের এমন বাক্যের মারপ্যাঁচে এভাবে গেলাতে থাকে। ব্যাকরণের বিরহ-ব্যথা রেখে আমরা ইতিহাসের পথে আবারও হাঁটতে শুরু করি।

নাথান রথসচাইল্ড ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তার পরিবার প্যারিস ও লন্ডনে দাতব্য কার্যক্রম প্রসারিত করে। লন্ডনে তাদের দ্বারা একটি সিনাগগ নির্মিত হয়। পরবর্তীতে তারা ইসরায়েলের উন্নয়নে সহায়তা করে এবং বেসরকারি আবাসন ও সরকারি ভবন নির্মাণে অর্থায়ন করে। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো থেকেও সমর্থন ও সহযোগিতা তারা অর্জন করে।

নাথানের ছোট মেয়ে লুইস এবং তার সাত মেয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রায় ৩০টি রথসচাইল্ড দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় জড়িত ছিলেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল জনসাধারণের জন্য লাইব্রেরি, অনাহারীদের আশ্রয়, হাসপাতাল, বয়স্কদের জন্য আশ্রয় ও শিক্ষার জন্য তহবিল।

লন্ডনের দ্য জিউস ফ্রি স্কুলে রথসচাইল্ড পরিবার ব্যাপক অর্থ সহায়তা করেছিল। এছাড়া অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইসরায়েলের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নেও তাদের বড় ভূমিকা ছিল। তারা ৬০ হাজারের বেশি শিল্পকলা সম্পদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে।

রথসচাইল্ড ব্যাংকিং-ব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান

১৯৭০-এর দশকে মাত্র তিনটি রথচাইল্ড ব্যাংক অবশিষ্ট ছিল: লন্ডন, প্যারিস এবং সুইস ব্যাংক (এডমন্ড অ্যাডলফ ডি রথচাইল্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)। ১৯৮২ সালে ফ্রান্সের তৎকালীন বামপন্থী প্রেসিডেন্ট ফ্রঁসোয়া মিতেরঁ সরকার দেশটির অনেক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে। এরমধ্যে রথসচাইল্ড পরিবারের মালিকানাধীন 'ব্যাংক রথসচাইল্ড'-ও ছিল। এই পদক্ষেপের ফলে পরিবারটি তাদের মূল ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের একটি বড় অংশ হারিয়ে ফেলে। এতে রথচাইল্ড পরিবারের ব্যাংকিং সাম্রাজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জাতীয়করণের পর রথসচাইল্ড পরিবার ফরাসি ব্যাংকিং খাতে তাদের কার্যক্রম নতুন করে শুরু করে। ডেভিড রেনে ডি রথসচাইল্ড ১৯৮৭ সালে প্যারিসে একটি নতুন

প্রতিষ্ঠান. 'রথসচাইল্ড অ্যান্ড সিই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ২০০৩ সালে ব্রিটিশ ও ফরাসি শাখার ব্যাংকগুলো একীভূত হয়ে একটি একক কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে যা বর্তমানে 'রথসচাইল্ড অ্যান্ড কো' (Rothschild & Co) নামে পরিচিত। এটা পরিবারটির পুনরুত্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। ২০০৮ সালে রথসচাইল্ড পরিবারের সম্পদ প্যারিস-ভিত্তিক অরলিয়েন্স কোম্পানির অধীনে একত্রিত করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপটি তাদের ব্যবসায়িক কাঠামোকে আরও সুসংহত করে।

এডমন্ড অ্যাডলফ ডি রথসচাইল্ড সুইস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। যে ব্যাংকের নাম মানেই টাকার পাহাড়। দুনিয়ার যত অবৈধ টাকা সব ওই ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে। এই ব্যাংকের নাম শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু 'সুইস ব্যাংক' বলতে সাধারণত একটি একক ব্যাংককে বোঝানো হয় না, সুইজারল্যান্ডের পুরো ব্যাংকিং-ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়।

ব্যারন এডমন্ড অ্যাডলফ ডি রথসচাইল্ড ১৯৫৩ সালে প্যারিসে 'লা কম্প্যাগনি ফিনানসিয়েরে এডমন্ড ডি রথসচাইল্ড' নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৬৫ সালে তিনি জেনেভায় একটি বেসরকারি ব্যাংক অধিগ্রহণ করেন। এটাই বর্তমানে 'এডমন্ড ডি রথসচাইল্ড গ্রুপ' (Edmond de Rothschild Group) নামে পরিচিত যা একটি সুপরিচিত সুইস ব্যাংকিং ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ। সুতরাং, রথসচাইল্ড পরিবার এই নির্দিষ্ট সুইস ব্যাংকিং গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু সুইজারল্যান্ডের সব ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা নয়। সুইজারল্যান্ডের সবগুলো ব্যাংকের কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয় সুইস ব্যাংককে।

'সুইস ব্যাংক' কাদের নিয়ন্ত্রণে? 'সুইস ব্যাংক' কোনো একক প্রতিষ্ঠান নয়। সুইজারল্যান্ডে শতশত ব্যাংক আছে, যেমন: UBS, Credit Suisse (যা এখন UBS-এর সঙ্গে একীভূত), Pictet, Lombard Odier ইত্যাদি। এই ব্যাংকগুলোর মালিকানা ও পরিচালনা বিভিন্ন ব্যক্তি, কোম্পানি ও শেয়ারহোল্ডারদের হাতে থাকে। পুরো সুইস ব্যাংকিং-ব্যবস্থা মূলত সুইজারল্যান্ডের আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সুইস ফিনান্সিয়াল মার্কেট সুপারভাইজরি অথরিটি' (FINMA) এবং 'সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক' (SNB) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সংস্থাগুলো ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমে নজর রাখে এবং নিশ্চিত করে যে তারা সব আইন ও নিয়ম মেনে চলছে।

একবিংশ শতাব্দীতে রথসচাইল্ডরা ঐতিহ্যগতভাবে তাদের সম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে। পরিবারের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে এই কোম্পানিগুলোতে কাজ করেন অথবা বিভিন্ন উদ্যোগে বিনিয়োগ করেন। তাদের সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো পারিবারিক ঐক্য, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস, ব্যবসায়িক সুযোগ অন্বেষণ এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি।

৪র্থ ব্যারন রথসচাইল্ড

লর্ড জ্যাকব রথচাইল্ড: ২০২৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ৮৭ বছর বয়সে লর্ড জ্যাকব রথচাইল্ড মৃত্যুবরণ করেন। ইটন কলেজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে তিনি এন এম রথচাইল্ড অ্যান্ড সন্সে কাজ শুরু করেন। ১৯৮০ সালে পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে সরে এসে তিনি জে রথচাইল্ড ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ও আরআইটি ক্যাপিটাল পার্টনার্স প্রতিষ্ঠা করেন।

জ্যাকব রথচাইল্ড ইহুদী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সক্রিয় ছিলেন। তিনি দ্য রথচাইল্ড ফাউন্ডেশন (হানাদিভ) ইউরোপ এবং ইনস্টিটিউট ফর জুইস পলিসি রিসার্চ-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে তার জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ইহুদীবাদ, ইসরায়েল এবং জায়োনবাদ।

ফিলিস্তিনের প্রতি ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিষয়ে তার নীরবতা এবং ইসরায়েলের প্রতি তার দৃঢ় সমর্থন সমালোচিত হয়েছে। ইয়াদ হানাদিবের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ইসরায়েলের পার্লামেন্ট (নেসেট), সুপ্রিম কোর্ট এবং জাতীয় গ্রন্থাগার নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন।

২০১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ওই ঘোষণাকে "অলৌকিক ঘটনা" বলে অভিহিত করেন এবং রথচাইল্ড পরিবারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

জ্যাকবের মৃত্যুর পর তার মেয়ে হান্না ইয়াদ হানাদিভের নেতৃত্ব দেবেন। তবে নীতি ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন হবে না। ইসরায়েলী আধিপত্য এবং তথাকথিত থার্ড টেম্পল সাথে ইহুদী মসীহর বিশ্ব শাসনের জন্য ফিলিস্তিনের পূর্ণভূমি দখলের লক্ষ্যে তাদের কর্মধারা অব্যাহত থাকবে, যেখানে মসীহ বা দাজ্জালের আগমনকে কেন্দ্র করে তাদের পরিকল্পনা এগিয়ে চলছে।

তবে কেন? একটি অন্ধকার অধ্যায় যা ভীতিপ্রদ এবং গভীর রাজনৈতিক কৌশলের ছায়ায় মোড়া। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন, মিশর, ইরাক,

ইরান– এই দেশগুলোর প্রতিটি শহীদ মুসলমানের রক্ত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সেই গুপ্ত সংগঠনের হাতেই রয়েছে, যারা বিশ্বের আড়ালে এক ভয়ানক খেলায় মগ্ন।

এরা, যারা আমাদের পৃথিবীকে এক অদৃশ্য শাসনে নিয়ন্ত্রণ করছে, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিরও এক ছায়ামহল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটনী স্পেয়ার্স, ক্যাটি পেরি, নিকোলাস কেগ, বিয়ন্স নোয়েল, মাইলি সাইরাস, লেডি গাগা, জাস্টিন বিবার, সেলেনা গোমেজ, কিয়ানু রিউভস– এরা শুধু সুপারস্টার নয়, এর পাশাপাশি তারা বার্তাবাহকও।

আমরা জানি না কিন্তু তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, তাদের চুলের স্টাইল, পোশাক, গা-হাতের ট্যাটু– সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত। পরবর্তী শ্যাটানিক হেয়ার স্টাইল, ট্যাটু, ড্রেস কোড– এই সবকিছু চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে দেয় সেই গোপন শক্তি। দুই হাত দিয়ে শিঙের চিহ্ন, '৬৬৬'-এর সমার্থক এই চিহ্ন– এসব নিছক নয় বলে তাত্ত্বিকরা মত দিয়েছেন।

বুক অফ রেভেলেশন-এর ১৩শ অধ্যায়, ১৭-১৮ লাইনে একটি ভয়ের সৃষ্টিকারী '৬৬৬'-এর কথা বলা হয়েছে। "একটি বহু মাথাওয়ালা এক দৈত্যাকার পশু সমুদ্রের উপরে থেকে উঠবে। যার অবিশ্বাস্য শক্তি থাকবে এবং সে পৃথিবীকে দাসে পরিণত করবে।" যদি এই অভ্যন্তরীণ সংকেতগুলো সঠিকভাবে পড়তে পারেন, তাহলে এই নম্বরটি '৬৬৬' খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে এন্টিক্রাইস্টের এবং ইসলামী বিশ্বাসে দাজ্জালের চিহ্ন।

সংখ্যার ছোঁয়া– ৬৬৬

পাণ্ডুলিপির মতো খুলে যায় বাইবেলের শেষ বই 'রেভেলেশন'– একটি রহস্যে মোড়ানো দ্যুতি, যেখানে শব্দগুলো যেন ভবিষ্যতের দেওয়ালে ছায়া ফেলে রাখে। তারই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ নম্বর শ্লোক– এই দুটি পঙ্ক্তি যেন এক আদি-অন্তের সংকেত, সংখ্যার খোপে বন্দী এক মহাকাব্যিক বিপদের পূর্বাভাস।

"যাতে কেউ বেচাকেনা করতে না পারে যদি না তার গায়ে চিহ্ন থাকে– অর্থাৎ সেই জন্তুর নাম, অথবা তার নামের সংখ্যা। এখানে প্রজ্ঞার প্রয়োজন। যে বুদ্ধিমান, সে হিসেব করুক জন্তুর সংখ্যাটি কারণ এটা এক মানুষের সংখ্যা, আর তার সংখ্যা হলো, '৬৬৬'।"

সংখ্যাটি '৬৬৬'– শুধু একটি সংখ্যা নয়। এ এক প্রাচীন গূঢ়তা যা বিশ্ব ইতিহাসের অদৃশ্য নাটকে এক অপরিহার্য প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই সংখ্যা বাইবেলের ভাষ্যে 'দ্য

নাম্বার অব দ্য বিস্ট', আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও আত্মার গোলামির এক বিস্তৃত ছায়াচিত্র।

বাইবেল বলে, যার শরীরে চিহ্ন নেই সে কিনতে বা বিক্রি করতে পারবে না। সাংকেতিক সিলমোহর। '৬৬৬' এই সংখ্যাটিকে বহু শতাব্দী ধরে চিহ্নিত করা হয়েছে এক প্রকার শয়তানী প্রতীক হিসেবে। তবে গভীরে গেলে এর ব্যাখ্যা বহুমাত্রিক। গ্রিক ও হিব্রু ভাষায় অক্ষরসমূহের নিজস্ব সংখ্যাগত মান আছে। বহু গবেষক দেখিয়েছেন, 'Nero Caesar' নামটি হিব্রু-সংখ্যাবিজ্ঞানের নিয়মে ৬৬৬ হয়– যা একদিকে ইঙ্গিত করে রোমান অত্যাচারী শাসকের দিকে।

কিন্তু আধুনিক বিশ্লেষণ বলছে, এই সংখ্যা আরেকভাবে ফিরে এসেছে প্রযুক্তির কপালে। কোনো কোনো থিওরিস্ট বলছেন, বারকোডে ব্যবহৃত সংখ্যাবিন্যাস, ডিজিটাল চিপের সংকেত, কিংবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মৌলিক অ্যালগরিদমিক ডিজাইনে ৬৬৬-এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলছেন, এটা একটি প্রতীক– মানব-কেন্দ্রিক অহংকারের যেখানে ঈশ্বরচ্যুতি ঘটে আত্ম-উন্নয়নের নামে।

এই সংখ্যা যখন কপালে বা হাতে চিহ্নিত হবে তখন তা হবে শুধু ধর্মীয় নয়, এক রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিনির্ভর আনুগত্যের মুদ্রাঙ্কন। এখানেই যুক্ত হয়ে যায় দাজ্জালের বর্ণনা– ইসলাম অনুযায়ী, সে এমন এক প্রতারক যে মানুষকে খাদ্য, পানি, ও জীবনধারণের উপকরণ দিয়ে আকৃষ্ট করবে; আর যে দাজ্জালের অনুসারী হবে না, তাকে রাখা হবে উপেক্ষিত, অবরুদ্ধ ও অভুক্ত।

রেভেলেশনের বর্ণনা আর দাজ্জালের হাদীস যেন একই চিত্র আঁকে; এক বিশাল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। মর্যাদা বিকিয়ে না দিলে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠবে। এখানে প্রযুক্তি হবে ধর্ম, অ্যালগরিদম হবে শাসক, আর সংখ্যাই হবে আত্মার দাসত্বের সিলমোহর।

এই সাংকেতিক সংকেত– শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসেই নয়, মানবতার এক অন্ধকার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। ইসলামেও এই সংখ্যা থেকে আমরা চিহ্নিত করি, যে সময় দাজ্জাল পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে। আমাদের প্রিয় নবী, হজরত 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেছেন,— **"দাজ্জাল পৃথিবীতে ৪০ দিন অবস্থান করবে, তারমধ্যে একদিন এক বছরের সমান, একদিন এক মাসের সমান, একদিন এক সপ্তাহের সমান। বাকি দিনগুলো আমাদের দিনের মতো।"**

এখানে, সময়ের একটি বিশেষ দিক অন্তর্নিহিত– দাজ্জালের উপস্থিতি, তার ভয়ের চিহ্ন, তার শক্তি যখন আমাদের মাত্রায় আসবে, তখন আমরা তাকে অতি সোজা-সাপ্টা দেখতে পাবো। সে ইহুদী যুবক হিসেবে কোঁকড়া চুলে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার চোখে একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ আর সে আমাদের পৃথিবীকে নিজের দাসত্বে পরিণত করবে।

কিন্তু আমাদের ডাইমেনশনে আসার আগে দাজ্জাল তিনটি স্টেজ পার করবে। অর্থাৎ মানব দাজ্জাল জন্মের আগে একটা নমুনা মানবজাতির সামনে দৃশ্যমান হবে একইভাবে যা কাকতালীয়ভাবে করে যাবে তারই অনুসারীরা। অর্থাৎ তিনটি শেডো অফ ডার্কনেস। হাদীসে একে বলা হয়েছে, ক. একদিন এক বছরের সমান, খ. একদিন এক মাসের সমান, গ. একদিন এক সপ্তাহের সমান। আর বাইবেলে একে প্রকাশ করা হয়েছে '৬৬৬' দ্বারা। ক. ৬০০, খ. ৬০, গ. ৬– এই তিনটি সময়ে দাজ্জাল তার মানুষরূপে পৃথিবীতে আগমনের জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত করবে। কীভাবে?

অন্য সামাওয়াত থেকে তার আর্মিদের দ্বারা যাদেরকে আমরা বলতে পারি, দাজ্জালস ওয়ারিওরস বা দাজ্জালের যোদ্ধাদল। বর্তমান যা দেখা যাচ্ছে তাই। দাজ্জালের একদিন এক বছরের সমান বাইবেলের ৬৬৬ এর ৬০০ = একটি বৃহৎ সময় = প্যাক্স ব্রিটানিকা = দাজ্জাল ব্রিটেনের দ্বারা বিশ্ব শাসন করবে। দাজ্জালের একদিন এক মাসের সমান = বাইবেলের ৬৬৬ এর ৬০ = প্রথম পর্যায়ের চেয়ে কিছু কম সময় = প্যাক্স আমেরিকানা = দাজ্জাল আমেরিকা দ্বারা বিশ্ব শাসন করবে। দাজ্জালের একদিন এক সপ্তাহের সমান = বাইবেলের ৬৬৬ এর ৬ = খুব কম সময় = প্যাক্স জুদাইকা = ইসরায়েল দ্বারা বিশ্ব শাসন করবে। এটা একটা রূপক অর্থ বলা যায়। আর বাস্তবতা যদি দেখতে চান, তাহলে তা আপনার চোখের সামনে দৃশ্যমান। আমেরিকার মোড়লপনা এখন নেই বললেই চলে। ইহুদীদের অর্থে পরিচালিত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকের নাটাই তাদেরই হাতে। এ বিষয়ে আরও কিছু বলে নেওয়া যাক, তাহলে বুঝতে সহজ হবে।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের পৃষ্ঠায় যেমন রয়েছে রহস্যময় স্ফুরণ তেমনি তার অন্তর্নিহিত প্রতীক ও রূপকগুলো আমাদেরকে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের এক গহীন ছায়াপথে। বাইবেলের 'বুক অফ রেভেলেশন'-এ বর্ণিত সংখ্যাটি- ৬৬৬, শুধু একটি শয়তানী সংখ্যা নয়, এটা সময়, ক্ষমতা ও শাসনের এক প্রতীকী মাপকাঠি। একইসাথে, হাদীস শরীফে বর্ণিত দাজ্জালের তিন পর্যায়ের সময়কাল: একদিন এক বছরের সমান, একদিন এক মাসের সমান, ও একদিন এক সপ্তাহের সমান– এটাও একটি

গভীর সাংকেতিক ভবিষ্যৎবাণী। এই দুই উৎসের আলোকে দেখা যায়, ইতিহাসের তিনটি মহাশক্তি যেন একে একে দাজ্জালের শাসন-পর্বে অবতীর্ণ হয়েছে– প্যাক্স ব্রিটানিকা, প্যাক্স আমেরিকানা এবং প্যাক্স জুদাইকা।

৬৬৬ সংখ্যার প্রতীকী ভাঙন

বাইবেলীয় সংখ্যাটিকে ভেঙে দেখা যায়:

- ৬০০ → এক বৃহৎ সময়কাল।
- ৬০ → তুলনামূলকভাবে স্বল্প।
- ৬ → অত্যল্প।

এই তিনটি সংখ্যা যেন সময়ের তিনটি স্তর, যার মধ্যে প্রতিটি স্তরে দাজ্জালের যোদ্ধাদল, তার বাহিনী বা 'ওয়ারিয়রস', পৃথিবীর একেকটি পরাশক্তিকে ব্যবহার করেছে বিশ্বশাসনের অস্ত্র হিসেবে। সামনে বাড়ার আগে একটু সতর্কতা বাণী না দিলেই নয়—"৬৬৬" নিয়ে পূর্বে যত আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যত আলোচনা আছে সবকিছু প্রতীকী অর্থে বর্ণিত, নানা গবেষণা ও সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনা করে একত্রিত করা হয়েছে। সবকিছুর যোগসূত্র করে ভাবতে পারলে সেভাবে নিবেন, না হয় কল্পকাহিনি ভাবার পরামর্শ প্রথমেই দেয়া হয়েছে।

দাজ্জালের "একদিন = একবছর": প্যাক্স ব্রিটানিকা

সময়কাল: ১৬৪৮ (ওয়েস্টফালিয়া চুক্তি) থেকে ১৯৪৫ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি): এর সংখ্যা '৬০০'– যা বৃহৎ সময়কাল। এই সময়কে বলা হয় প্যাক্স ব্রিটানিকা– ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুবর্ণ যুগ। ব্রিটেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় উপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। এ সময় ব্রিটিশরা ভারত, মিশর, আরব উপদ্বীপ থেকে আফ্রিকা– সর্বত্র তাদের আধিপত্য কায়েম করে। যেমন: ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration)– ব্রিটেন-কর্তৃক ইহুদীদের ফিলিস্তিনে 'জাতীয় গৃহ' স্থাপনের প্রতিশ্রুতি। স্যাইক্স-পিকো চুক্তি (১৯১৬)– ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ভাগাভাগির গোপন পরিকল্পনা।

ইতিহাস ঘাঁটলে আরও দেখা যায়, এই সময়কাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেই প্রলম্বিত আধিপত্যের প্রতীক, যা এককভাবে প্রায় তিনশ বছর ধরে পৃথিবীর শাসন করেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ, দাসব্যবসা, রেলপথ ও রেলসাম্রাজ্য, পুঁজিবাদ ও কেন্দ্রীয়

ব্যাংক-ব্যবস্থার শুরুর দিকে যে শক্তি পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিয়েছিল তা নিছক এক সাম্রাজ্যবাদ নয়। এ ছিল একটি ছদ্ম-শয়তানের শাসন, এক পলিটিক্যাল ফ্যাসাদ।

এই পর্বে দাজ্জালের বাহিনী ছিল ইউরোপের অভিজাত শ্রেণি, ব্যাংকার পরিবার, গোপন সমাজ– যারা রথচাইল্ডদের মতো অর্থিক সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ব্রিটেনকে দাজ্জালের প্রথম হাতিয়ার করে তোলে। এই সময় ছিল দাজ্জালীয় চক্রের প্রথম বড় পর্ব। যে দিন এক বছরের সমান, অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের একচ্ছত্র শাসন, তা এখানে বাস্তবতা পায়।

দাজ্জালের "একদিন = একমাস": প্যাক্স আমেরিকানা

সময়কাল: ১৯৪৫ থেকে বর্তমানের শুরু:

৬৬৬-এর মধ্যবর্তী এই অংশ ৬০-এর প্রতিনিধিত্ব করে। এটা ইংরেজ সাম্রাজ্যের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানের ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি মিলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ করে ব্রিটেন উডস চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা যে অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেটাই ছিল এই দাজ্জালী পর্বের কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ব্রিটেন পেছনে সরে যায় এবং আমেরিকা হয় নতুন বিশ্ব-মোড়ল। এই সময়কে বলা হয় প্যাক্স আমেরিকানা, অর্থাৎ 'আমেরিকান শান্তিকাল'। তবে এ শান্তি ছিল শোষণের শান্তি, যুদ্ধের অন্তরালে একছত্র নেতৃত্ব।

ব্রেটন উডস চুক্তি (১৯৪৪)– ডলারকে বিশ্বমুদ্রা বানানো হয়। ফেডারেল রিজার্ভ, IMF, World Bank– সব আমেরিকার ইহুদী-প্রভাবিত নীতিতে নিয়ন্ত্রিত। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা (১৯৪৮)– আমেরিকার পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে অবৈধ দখলদার রাষ্ট্র।

এই সময় দাজ্জালের যোদ্ধারা ছিল কর্পোরেট মিডিয়া, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও জাতিসংঘের অন্তর্নিহিত-ব্যবস্থায় বসে থাকা সেই লুকানো কর্তৃত্ব, যারা গণতন্ত্রের মুখোশে এক বিশ্বব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছিল। তারা জাতিগুলোকে ঋণের জালে বন্দী করে, সংস্কৃতিকে দূষিত করে, শিক্ষা ও নৈতিকতাকে দুর্বল করে দাজ্জালের শাসন সুদৃঢ় করে তোলে।

কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, এই পর্বের ঔজ্জ্বল্য নিভে যাচ্ছে। আমেরিকা আর সেই আগের মতো নেই। তাদের নেতৃত্ব এখন মুঠোবন্দী হয়ে যাচ্ছে এক ক্ষুদ্র অথচ ক্ষমতাধর অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর কাছে– যারা বহুদিন ধরেই দৃশ্যপটের আড়ালে ছিল। এখন পরিচালিত করার পরিবর্তে, পরিচালিত হচ্ছে আমেরিকা।

এই সময়কাল ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট কিন্তু গভীর প্রভাববাহী– "এক মাসের সমান"। আমেরিকা সামরিক দিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে, তবে অর্থনৈতিক নাটাই ছিল অন্য কারও হাতে।

দাজ্জালের "একদিন = এক সপ্তাহ": প্যাক্স জুদাইকা

সময়কাল: সমসাময়িক সময়, বিশেষত ২০০১-এর পর থেকে ক্রমশ:

আমেরিকার সাম্রাজ্যিক দৌড় এখন হুমকির মুখে। ইউক্রেন যুদ্ধ, আফগান ব্যর্থতা, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট– এসব চিহ্ন দিচ্ছে আমেরিকার পতনের। এই মুহূর্তে বাস্তবে যাদের হাতে ক্ষমতার রিমোট কন্ট্রোল, তারা হলেন জায়োনিস্ট ইহুদী মহল।

এই সময়কে "এক সপ্তাহ" বলা হয়েছে। কারণ এর সময় স্বল্প, কিন্তু গতি অত্যন্ত দ্রুত। একপ্রকার দাজ্জালের চূড়ান্ত উত্থানের মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। এখন আমরা যে সময়কাল অতিক্রম করছি, তা “একদিন এক সপ্তাহের সমান”– অর্থাৎ খুব স্বল্পকালীন শাসন। বাইবেলীয় সংখ্যার শেষ অংক ৬, এই ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ভয়ঙ্কর কর্তৃত্বের প্রতীক।

এই শাসন এখন আর গোপন নয়, এটা সেই ‘প্যাক্স জুদাইকা’, যেখানে ইসরায়েল এবং এর পেছনে থাকা ইহুদী অভিজাত ব্যাংকারগোষ্ঠী সরাসরি বিশ্বব্যবস্থাকে চালিত করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোক ইউরোপীয় সংসদ হোক বা মধ্যপ্রাচ্যর রাজপরিবার। সবখানেই একটি লুকানো অথচ দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ কাজ করছে। ব্যাংক, মিডিয়া, যুদ্ধশিল্প, এমনকি প্রযুক্তির শীর্ষ সংস্থাগুলো এখন তাদের অর্থায়নে পরিচালিত। প্রযুক্তির পরতে পরতে ঢুকে পড়েছে চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা, নজরদারি, ও ডিজিটাল দাসত্ব।

রথচাইল্ড পরিবারের মাধ্যমে ইউরোপ-আমেরিকার ব্যাংকিং ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ। আইপ্যাক (AIPAC)-এর মতো ইহুদী লবির দৌরাত্ম্য মার্কিন রাজনীতিতে। ইসরায়েল ও সৌদি আরবের মধ্যে আব্রাহাম চুক্তি, যা ইসরায়েলের আধিপত্য কায়েমের বড় পদক্ষেপ।

আজ আমেরিকার মোড়লপনা আর নেই। ওয়াশিংটন কোনঠাসা, নিজস্ব স্বাথ বিসর্জন দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের তুষ্টির জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যেন এখন তেল আবিভের লবিস্টদের হাতে এক নাটকের পুতুল। দাজ্জালের আগাম রূপক শাসনের তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি আমরা। যেখানে শরীর নয়, বিশ্বাস ও চেতনা নিয়ন্ত্রণই হয়ে উঠেছে মূল টার্গেট।

সময়ের প্রবাহে একে একে এসেছে তিনটি সাম্রাজ্য, তিনটি দাজ্জালী অধ্যায়– প্রথমে ব্রিটেন, তারপর আমেরিকা, এখন ইসরায়েল। বাইবেলের ৬৬৬ আর হাদীসের 'তিন সময়পর্ব'– এই দুইয়ের মিল অস্বাভাবিক নয়, একটি বৈশ্বিক রূপরেখা, যা নির্দেশ করে শেষের শুরু। প্রযুক্তির অগ্রগতির পেছনে যে শক্তি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছায়ায় যে মদত আর জনমত তৈরির যে ব্যবস্থাপনা– সবকিছু এক কাকতালীয় ছকে বাধা পড়েছে।

আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি শেষ অধ্যায়ের প্রান্তে। দাজ্জালের যোদ্ধারা অদৃশ্য নয়, তারা প্রতিদিন আমাদের খবর পড়ে, আমাদের ফোন স্ক্যান করে, আমাদের সন্তানদের চিন্তা গঠনে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কী এই চিহ্নিত সভ্যতার যাত্রী হয়ে উঠছি? না কি এখনো বেছে নিতে পারি মুক্তির পথ– যেখানে সত্য, নৈতিকতা ও ঈমানের আলোকবর্তিকা জ্বলবে, সংখ্যার অন্ধকার ছাপিয়ে?

এই তিনটি পর্যায় কমপ্লিট হওয়ার পর দাজ্জাল মানুষ হিসেবে জেরুজালেম থেকে নিজেকে মসীহ ঘোষণা করবে অর্থাৎ 'খুরুজ অফ দাজ্জাল' সংগঠিত হবে। দুই চোখের মাঝখানে কাফির এবং '৬৬৬'-এর রহস্য দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবে, হোক সে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন অথবা নিরক্ষর।[১]

খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস হলো, দাজ্জাল বা এন্টিক্রাইস্টের মাথায় '৬৬৬' লেখা থাকবে এবং সে তার অনুসারীদের দুই চোখের মাঝখানে এবং ডান হাতের তালুতে এই '৬৬৬'-এর সীল মেরে দিবে। রেভেলেশান ১৩:১ থেকে বুঝা যায় এই '৬৬৬' বা এন্টিক্রাইস্ট (দাজ্জাল, যে নিজেকে ঈশ্বর সাব্যস্ত করতে চাইবে) সে অনেক মিরাকল করবে, মৃতকে জীবিত, আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণ করাবে যাতে মানুষরা তাকে অনুসরণ করে। Paul C. Jong একটু গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "অন্যভাবে বলতে গেলে, শয়তান মানুষকে দাজ্জালের এমন অনুসরণকারী বানাবে যে পূর্বে মানুষ ঈশ্বরকেও এভাবে অনুসরণ করেনি।"

যে সকল মানুষের কাছে '৬৬৬' মার্ক (সীল) থাকবে না, তাদের প্রতি কোনো রহম করা হবে না, তাদের উপর জুলুম করে হত্যা করা হবে, তাদেরকে কোনো প্রকার লেনদেন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। আমরা যখন কোনো ব্যক্তি, সংস্থা,

১. মুসলিম ২৯৩৩ ; মুসনাদে আহমদ-১৪৯৯৭

কোম্পানি বা রাষ্ট্র অথবা বিশ্বের নামকরা ব্যক্তিকে যখন '৬৬৬' বা পিরামিড ইত্যাদি সাইন ব্যবহার করতে দেখি। তখন এটা স্পষ্টই বুঝাচ্ছে এরা হলো, দাজ্জালের অনুসারী। এরাই দাজ্জালের জন্য অপেক্ষারত, দাজ্জালের পূজারী, তার পথ সুগমকারী। এরা আজ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ইউরোপ-আমেরিকার শাসক থেকে তাদের যাজক পর্যন্ত, সাধারণ মানুষ থেকে আইডল, মিলিনিয়ার বা স্টার পর্যন্ত, ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। কেন চিহ্ন ও ট্যাটুর এত গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে? কেন তারকাদের এসব করানো হয়? আশা করি এতক্ষণে বুঝে গেছেন।

ইসলামী হাদীস ও বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে 'দাজ্জালের দিন' এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নবী মুহাম্মদ (সা.) হাদীসে বলেন, "দাজ্জালের এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং এরপর বাকি দিনগুলো হবে সাধারণ দিনের মতো"[১] এই হাদীস অনেক মুফাসসির, হাদীস বিশারদ এবং গবেষকের কাছে রূপক অর্থে পরিগণিত হয়েছে।

দাজ্জালের আগমন শুধু আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক নয়। তার আগমন বাস্তব রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজে প্রতিফলিত হয়। ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণী ও বাইবেলীয় রূপক ভাষা যদি গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে আজকের বিশ্ব-রাজনীতির এই তিনটি পর্বকে পরিষ্কারভাবে তাতে শনাক্ত করা যায়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে, এই সবকিছুই মূলত একটা বড় পরীক্ষার অংশ। মানুষ যেন সত্য-মিথ্যার ভেদ বুঝে আর সত্যের পথে ফিরে আসে। ইহুদী বংশে জন্ম নেওয়া মানব দাজ্জাল যতই শক্তিশালী হোক, তার অবসান হবেই। আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

> "বলো, সত্য এসে গেছে, আর মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা চিরস্থায়ী হয় না।"[২]

১. মুসলিম, হাদীস: ২৯৩৪
২. সূরা বনী ইসরায়েল, আয়াত ৮১

১৩ পরিবারের অস্তিত্ব এবং তাদের গোপন প্রভাব-প্রতিপত্তি

১৩টি পরিবার যাদের নামে পৃথিবী গড়ে উঠেছে তারা নিঃসন্দেহে এক অদৃশ্য শক্তির আধিকারী। ব্রুস পরিবার, ক্যাডেনডিশ পরিবার– এরা শুধু গোপনীয় নয়, এরা ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বের অপ্রকাশিত শাসন ক্ষমতার রূপকার। কলিনস, হামফ্রে, রিগান– এই পরিবারগুলো সবসময় নিজেদের ধনী বাহিনী নিয়ে নিজেদের পারিবারিক সম্পর্ককে বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল। একদিকে, রথচাইল্ড এবং রকফেলাররা ছিল এই গোপন সমাজের অগ্রণী সর্দার, অন্যদিকে এই নতুন গোষ্ঠীগুলো কৌশলে সমস্ত বৈশ্বিক জটিলতাকে নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করছিল।

এরা যারা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, আজও তাদের হাত থেকে বেরিয়ে আসা উপাদানগুলো বিশ্বকে এক অদ্ভুত ধারায় গড়ে তুলছে। নব্বই দশকের পরে যেভাবে গোপন সমাজগুলো তাদের প্রভাব বাড়িয়ে তোলে তা অবশ্যই নিছক একটি কাকতালীয় ঘটনা নয়। তাদের লক্ষ্য ছিল এবং এখনও তাই। বিশ্বশক্তির একক আধিপত্য যা এখন 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা' বা এনডব্লিউও-র অধীনে কাজ করছে। এরা শুধু বিশ্বরাজনীতি এবং অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেনি বরং তা প্রতিটি সেক্টরেই প্রবাহিত করেছে, যার প্রমাণ বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান এবং গোপন সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ।

এই এনডব্লিউও-র অধীনে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ছয়টি আর্থিক সংস্থা। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে- আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, সেন্ট্রাল ব্যাংক, ফেডারেল রিজার্ভ এবং ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট। এর বাইরেও ছয়টি গোপন গোষ্ঠী রয়েছে। যেমন: অপাস ডেই, ফ্রিম্যাসনরি, স্কাল অ্যান্ড বোনস, বোহেমিয়ান ক্লাব, নাইটস অব মাল্টা এবং রসিক্রুসিও। এই গোষ্ঠীগুলো পৃথিবীর বুকে একটি অদৃশ্য প্রাচীরের মতো কাজ করে, যেখানে তারুণ্যের শক্তি ও শক্তির উৎস স্থাপন করা হয়।

এছাড়া, শিক্ষাব্যবস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করছে। বিশ্বব্যাপী বড় বড় কোম্পানির মধ্যে ওয়ালমার্ট, এক্সন, টাইম ও নিউজউইক ম্যাগাজিন, নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রভৃতি রয়েছে, যেগুলো তাদের চেষ্টাকে সর্বগ্রাসীভাবে ছড়িয়ে দেয়।

বিশ্বের ক্ষমতা ও অর্থের এই অদৃশ্য যুদ্ধটি যেখানে কেউ জানে না কে আসল শাসক? এটাই পরিণত হয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গোপন সমরাঙ্গনে। ক্ষমতা আর অর্থ একত্রিত হলে তা এক অসীম শক্তিতে পরিণত হয় যা শুধু সরকারই নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও বিচারের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এসব সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে একটি ভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা রয়েছে যা একদিকে গোপন, অন্যদিকে ভয়ংকরভাবে প্রভাবশালী।এরা জানে যদি একবার তাদের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় তাহলে পৃথিবীর সীমানা থেকে মানব ইতিহাস পর্যন্ত সকল কিছু একেবারে নতুনভাবে রচিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর পেছনে কি প্রকৃত ইতিহাসের কোনো বাস্তবতা নেই?

আজকের বিশ্বের এই 'এলিট' পরিবারগুলোর শাসনব্যবস্থা খুবই সূক্ষ্ম এবং যান্ত্রিকভাবে কার্যকর। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা শক্তিগুলো- অর্থ, রাজনীতি, শিক্ষা এবং গোয়েন্দা কার্যক্রম– একটি গোপন সূত্রে যুক্ত থাকে। এই সূত্রের মাধ্যমে পৃথিবীজুড়ে অজানা সংঘাত, ষড়যন্ত্র এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না।

আধুনিক যুগে একদিকে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো গণতন্ত্রের নামে শাসিত হলেও অন্যদিকে, তাদের পিছনে এই ১৩টি পরিবারই প্রকৃত নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাদের ক্ষমতা সুস্পষ্ট না হলেও, তারা সবকিছু পরিচালনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইসরায়েল এবং চীন– এই পাঁচটি দেশ তাদের মূল কেন্দ্র। যদিও কিছু গবেষক অন্যান্য দেশকেও এই শক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এই শক্তির মূল ক্ষমতা এই পাঁচটি দেশে কেন্দ্রীভূত।

যতই এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিশ্বের সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তি মূলত এই গোপন ১৩টি পরিবারের হাতেই। তারা শুধু রাজনীতি এবং অর্থনীতি পরিচালনা করে না, গোপন সংঘাত এবং ক্ষমতার জন্য যুদ্ধের সূচনা করছে যেখানে সাধারণ জনগণ শুধু তাদের ষড়যন্ত্রের খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রতিটি সামরিক কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অস্থিরতা– সবকিছুই এই পরিবারগুলোর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাজ করছে। এমনকি বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা, যা আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে, সেটাও তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তারা নিশ্চিত করছে যে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা' বাস্তবায়িত হয়, যেখানে সাধারণ মানুষ কখনোই সত্যিকার স্বাধীনতা পায় না।

তারা বিশ্বের দেশে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, এই সরকারগুলোকে বিভিন্ন নাম দিয়ে চালানো হচ্ছে, যেমন: 'অ্যারিস্টার্কি', 'ডেমোক্র্যাসি', অথবা 'থিওক্র্যাসি'। এই সমস্ত শাসনব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে গণমানুষের জন্য নয়, এই 'এলিট' পরিবারগুলোর স্বার্থে তৈরি। এর পাশাপাশি, যুদ্ধ এবং রোগব্যাধি ইত্যাদি এমন কিছু বিষয় যা তারা লাভজনক হিসেবে দেখছে তাদের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার জন্য তা বজায় রাখতে কোনো আপত্তি নেই।

এইভাবে, পৃথিবীকে শাসন করা হচ্ছেযেখানে একটি অদৃশ্য ক্ষমতার জাল সমগ্র পৃথিবীকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে। বিশ্বব্যাপী যে অস্থিরতা, শোষণ এবং যুদ্ধ চলছে, তার মূল কারণও এই অদৃশ্য শক্তির সমন্বয়ে। ১৩টি পরিবার কখনো প্রকাশ্যে আসে না কিন্তু তাদের কর্মধারা সারাবিশ্বের উন্নতি ও পতনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। পরিবার মানে পরিজন নিয়ে সংসার নয়, পরিবার এখানে একেকটা গোষ্ঠী।

বিশ্বের গোপন শক্তির চালিকাশক্তি হিসেবে খ্যাত ১৩টি পরিবার, যারা বর্তমান 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা' বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বাস্তব প্রতিষ্ঠাতা, তাদের অজ্ঞাতকালে এই পৃথিবী শাসন করছে। এসব পরিবারের মাধ্যমে এই শক্তি এবং ক্ষমতা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তবে তা কখনোই সবার চোখে পড়ে না। এর মূল কারণ হচ্ছে এই শক্তির অপারেশনটি সর্বদা মুখোশের আড়ালে থেকে চলে এবং ক্ষমতার মুখ্য দায়িত্বভার নিয়ে থাকা গোষ্ঠীও আসলে তাদের ব্যবহৃত পুতুল।

এরা বহুবছর ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এসেছে আর এই গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থায় যেখানে একদল লোক ক্ষমতা দখল করে নেয় কিন্তু তাদের কার্যকলাপ কেবল অল্প সংখ্যক ক্ষমতাশালীদের জন্য। এই মহাসংস্থার অধিকারীরা মূলত বিশ্বের সব অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন। যদিও প্রকাশ্যে সরকার এবং নির্বাচনব্যবস্থা

এটা নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের আড়াল থেকে আসল প্রভাবকারী পরিবারগুলোই সবকিছু পরিচালনা করে।

ফ্রিৎজ স্প্রিংমেইর, যিনি 'ব্লাডলাইন্স অব দি ইলুমিনাতি' বইতে এসব 'এলিট পরিবার'-এর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন অস্থিরতা, যুদ্ধ এবং সামাজিক সংঘাতের মূলে এসব পরিবারের হাত রয়েছে। এই পরিবারের সদস্যরা নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী পৃথিবীর নিয়ম এবং আইনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এই উদ্দেশ্যে তারা মানুষের ওপর নানা প্রকার মানসিক এবং শারীরিক শোষণ চালাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকা গোপন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মধ্যে ফ্রিৎজ আরও উল্লেখ করেন, এমন সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলো যেগুলো সরকারের অধীনে নেই। উদাহরণস্বরূপ; মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ, সিটি অফ লন্ডন, ভ্যাটিকান সিটি এবং ওয়াশিংটন ডিসি। এই জায়গাগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার পদ্ধতি একেবারেই স্বাধীন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো জবাবদিহি পৃথিবীর কোনো আদালতে করা সম্ভব নয়।

তবে এই সিস্টেমের গোপন উদ্দেশ্যটি হলো, মানুষকে অজ্ঞাত রাখতে একটি বৃহত্তর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা জনসাধারণের জন্য কার্যকরী হলেও আদতে এটা কিছু ব্যক্তির জন্যই পরিচালিত হয়ে থাকে।

বিশ্বের অদৃশ্য শাসকদের এই ১৩টি পরিবারের অস্তিত্ব এবং তাদের গোপন প্রভাব-প্রতিপত্তি ফ্রিৎজ স্প্রিংমেইরের মতো লেখকরা খোলাখুলি তুলে ধরেছেন। এসব পরিবার-সমূহের পুরো পৃথিবীজুড়ে যে প্রভাব রয়েছে তা প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে স্পষ্ট। তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা করপোরেশন, প্রতিষ্ঠান এবং গোপন সংস্থাগুলো পৃথিবীকে এমনভাবে পরিচালনা করছে যেন সাধারণ মানুষ কখনোই বুঝতেই না পারে তাদের অস্তিত্ব। এই গোপন শাসকরা অর্থনীতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যে, সবকিছুই যেন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা, যা মূলত শ্রমশক্তির উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, এসব গোপন শক্তির প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকে বের হওয়া জনগণ কখনোই সঠিক স্বাধীনতা বা স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা অর্জন করতে পারে না। কারণ; তাদের মনস্তত্ত্বের উপরে নিয়ন্ত্রণ চালানো হচ্ছে। এসব 'শিক্ষিত' মানুষ কার্যত দাস হয়ে উঠছে, যারা জানে না তারা কতবড় খেলার অংশ।

এই এলিটদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমাহীন এবং তারা তাদের শাসনের মেঘালয়ের তলায় সবকিছু গুছিয়ে রাখছে। প্রোপাগান্ডা, রাজনৈতিক চরিত্র নির্মাণ, যুদ্ধের লাভজনকতা এবং অর্থের শক্তি– সবকিছুই তাদের হাতে। তাদের এই শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো, যা তাদের নিজের সুবিধা অনুযায়ী কার্যকরী কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়।

এই শক্তিগুলোর সামরিক এবং রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন নামে পরিচিত তবে এসবের কার্যকারিতা এক– জনগণের ওপর একটি ভয়াবহ নিয়ন্ত্রণ। গণতন্ত্রের নামে আসলে সেগুলো এক বা কিছু সংখ্যক শক্তিশালী মানুষের শাসনব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠেছে। এবং যখন রোবটরা (এআই) শাসন করবে, তখন হয়তো কিছু পরিবর্তন আসবে কিন্তু বর্তমানে মানবিক প্রক্রিয়া অর্থের পিছনে ছুটছে, যা এই শাসকদের ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করছে।

এখানে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা ও ক্ষমতার শ্রেণিবিভাগের সংজ্ঞাগুলো তুলে ধরা দরকার মনে করি। গ্রিক ভাষার দুটি শব্দ, আর্কি (archy) এবং ক্রেসি (cracy), একটি শাসনের ধরণ বা ক্ষমতার কাঠামো নির্ধারণ করে। এসব শাসনব্যবস্থা সাধারণত বিশেষ কিছু গোষ্ঠী বা শ্রেণির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। চলুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থার উদাহরণ দেখি:

১. Democracy– গণতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *demos* (জনগণ) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: জনগণের হাতে শাসনক্ষমতা। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রের নীতি ও সিদ্ধান্ত জনগণের ভোটে নির্ধারিত হয়। তত্ত্বে জনগণের মতামতই প্রধান যদিও বাস্তবে প্রায়ই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রভাব থাকে। বাস্তবিকভাবে গণতন্ত্র কাগজে-কলমে থাকলেও এর প্রয়োগ নেই। জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকে না, শাসকদের হাতেই ক্ষমতা থাকে। সেই ক্ষমতার অংশীদার হয় রাষ্ট্রের প্রভাবশালী ও বিদেশিরা। উদাহরণ: পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র।

২. Autocracy– একনায়কতন্ত্র:

উৎস: auto (নিজে) + kratos (ক্ষমতা)। অর্থ: একজন ব্যক্তির হাতে পূর্ণ ক্ষমতা। জনগণকে পদদলিত করে একক ব্যক্তি কর্তৃত্ববাদী শোষণ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রে তার উপর আর কোনো ক্ষমতাবান থাকে না। ব্যাখ্যা: শাসক নামক শোষক একাই আইন প্রণয়ন, বিচার ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেন। উদাহরণ: উত্তর কোরিয়া, তুর্কমেনিস্তান, হাসিনা আমলে বাংলাদেশ।

৩. Aristocracy– অভিজাততন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *aristos* (শ্রেষ্ঠ) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: অভিজাত-শ্রেণির শাসন। ব্যাখ্যা: সমাজের উচ্চবিত্ত বা প্রভাবশালী শ্রেণির হাতে শাসনক্ষমতা থাকে। উদাহরণ: প্রাচীন এথেন্স, ইউরোপের সামন্তব্যবস্থা।

৪. Aristarchy– শ্রেষ্ঠতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *aristos* (শ্রেষ্ঠ) + *archē* (শাসন)। অর্থ: নৈতিকভাবে ও বুদ্ধিগতভাবে শ্রেষ্ঠদের হাতে শাসন। ব্যাখ্যা: এখানে ধনী বা অভিজাত নয় বরং জ্ঞান, যোগ্যতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে শাসক নির্ধারিত হয়। উদাহরণ: আদর্শ রূপে প্লেটোর 'Philosopher King' ধারণা।

৫. Plutocracy- ধনতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *ploutos* (ধন) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: ধনীদের শাসন। ব্যাখ্যা: অর্থবিত্তসম্পন্ন-শ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেট লবিস্ট সংস্কৃতি।

৬. Technocracy– প্রযুক্তিতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *techne* (প্রযুক্তি/দক্ষতা) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: বিশেষজ্ঞদের শাসন। ব্যাখ্যা: প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতার ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণ হয়। উদাহরণ: সিঙ্গাপুরের প্রশাসনিক কাঠামোতে এই ধারা লক্ষ করা যায়।

৭. Bureaucracy– আমলাতন্ত্র:

উৎস: ফরাসি *bureau* (দপ্তর) + গ্রিক *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: সরকারি আমলাদের প্রভাবশালী শাসন। ব্যাখ্যা: সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রশাসন প্রধানত সরকারি কর্মকর্তাদের হাতে থাকে। উদাহরণ: ভারত, বাংলাদেশ, ফ্রান্স।

৮. Meritocracy– মেধাতন্ত্র:

উৎস: লাতিন *meritum* (যোগ্যতা) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে শাসন। ব্যাখ্যা: প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে, যারা সর্বাধিক দক্ষ, মেধাবী ও সৎ। উদাহরণ: চীনের সাম্রাজ্যিক পরীক্ষাপদ্ধতি।

৯. Polyarchy– বহুতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *poly* (অনেক) + *archē* (শাসন)। অর্থ: বহু কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। ব্যাখ্যা: ক্ষমতা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে থাকে। উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড।

১০. Gynocracy– নারীতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *gynē* (নারী) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: নারীদের হাতে শাসন। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীরাই মুখ্য নেতৃত্বে থাকেন। উদাহরণ: নিউজিল্যান্ডে জাসিন্ডা আর্ডার্নের নেতৃত্বকাল।

১১. Androcrac– পুরুষতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *andros* (পুরুষ) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: পুরুষদের হাতে শাসন। ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্র পুরুষ সমাজ। উদাহরণ: ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ রাজতন্ত্র।

১২. Stratocracy– সামরিকতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *stratos* (সামরিক বাহিনী) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: সেনাবাহিনীর হাতে শাসন। ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক ক্ষমতা সরাসরি সামরিক বাহিনীর হাতে থাকে। উদাহরণ: মায়ানমার, মিশর, পাকিস্তানের সামরিক আমল।

১৩. Theocracy– ধর্মতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *theos* (ঈশ্বর) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: ধর্মীয় আইনের উপর ভিত্তি করে শাসন। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতি ও ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশ কার্যকর হয়। উদাহরণ: ইরান, ভ্যাটিকান সিটি।

১৪. Oligarchy– গোষ্ঠীতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *oligos* (অল্প) + *archē* (শাসন)। অর্থ: অল্পসংখ্যক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে শাসন। ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক ক্ষমতা কয়েকজন ধনী, সামরিক বা অভিজাত নেতার মধ্যে সীমিত থাকে। উদাহরণ: রাশিয়ার আধুনিক শাসনব্যবস্থা।

১৫. Tyranny– স্বৈরতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *tyrannos* (নিয়ন্ত্রণকারী)। অর্থ: নির্মম ও স্বেচ্ছাচারী একনায়কতন্ত্র। ব্যাখ্যা: আইন, নৈতিকতা বা জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে শাসক ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেন। উদাহরণ: হিটলারের নাৎসি জার্মানি, বাংলাদেশের শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ, এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং পাকিস্তানের আইয়ুব খান ইত্যাদি।

১৬. Totalitarianism– সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্র:

উৎস: লাতিন *totalis* (সম্পূর্ণ)।.অর্থ: রাষ্ট্র জীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর একক কর্তৃত্ব। উদাহরণ: উত্তর কোরিয়া, হাসিনা আমলে বাংলাদেশ।

১৭. Anarchy– শাসনহীনতা:

উৎস: গ্রিক *an* (নেই) + *archē* (শাসন)। অর্থ: কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতি। ব্যাখ্যা: আইনহীনতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। উদাহরণ: সোমালিয়ার গৃহযুদ্ধকালীন অবস্থা, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব তথা চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রফেসর ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। শাসনহীনতার সকল উপকরণ অন্তর্বর্তী ইউনূস সরকারের শাসনামলে পরিলক্ষিত।

১৮. Kleptocracy– চোরতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *kleptes* (চোর) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের শাসন। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্র পরিচালনার নামে নেতারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে লিপ্ত থাকেন। উদাহরণ: আফ্রিকার কয়েকটি দেশ, রাশিয়ার ওলিগার্করা, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ।

১৯. Corporatocracy– কর্পোরেটতন্ত্র:

উৎস: লাতিন *corpus* (গোষ্ঠী) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: বৃহৎ কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর প্রভাবাধীন শাসন। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রের নীতি, আইন ও অর্থনীতি কর্পোরেট শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু দেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভারত এবং বাংলাদেশ।

২০. Gerontocracy– বয়স্কতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *geron* (বৃদ্ধ) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: প্রবীণদের শাসন। ব্যাখ্যা: সমাজে উচ্চপদ বা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বয়স্কদের প্রাধান্য থাকে। উদাহরণ: চীনের প্রথাগত নেতৃত্ব কাঠামো।

২১. Hyperarchy– অতিনিয়ন্ত্রণতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *hyper* (অধিক) + *archē* (শাসন)। অর্থ: অতিরিক্ত স্তরবিশিষ্ট বা অকার্যকরভাবে জটিল প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থা। ব্যাখ্যা: যেখানে এতবেশি শাসনস্তর থাকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। উদাহরণ: অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এখানে বাংলাদেশে প্রফেসর ইউনূসের শাসনামলকেও বলা যায়। ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হলো অগণিত শাসন স্তর এবং অনিয়ন্ত্রিত সরকার ব্যবস্থা।

২২. Timocracy– মর্যাদাতন্ত্র'

উৎস: গ্রিক *timē* (সম্মান, মর্যাদা) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: মর্যাদা ও সম্পদের ভিত্তিতে শাসন। ব্যাখ্যা: যেখানে যাদের সর্বাধিক মর্যাদা, সম্পদ বা খ্যাতি আছে তারাই নেতৃত্ব দেয়। উদাহরণ: প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এ এই ধরণের রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে।

২৩. Diarchy– দ্বৈতশাসন:

উৎস: গ্রিক *di* (দুই) + *archē* (শাসন)। অর্থ: দুই শাসকের যৌথ শাসন। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রে একইসাথে দুটি শাসনকেন্দ্র থাকে। উদাহরণ: প্রাচীন স্পার্টা, আধুনিক আন্দোরা।

২৪. Matriarchy– মাতৃতন্ত্র:

উৎস: লাতিন *mater* (মা) + *archē* (শাসন)। অর্থ: মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ ও শাসনব্যবস্থা। ব্যাখ্যা: পরিবার, সম্পদ ও সমাজ নারীর বংশের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে। উদাহরণ: ভারতের মেঘালয়ের খাসিয়া সম্প্রদায়।

২৫. Patriarchy– পিতৃতন্ত্র:

উৎস: লাতিন *pater* (পিতা) + *archē* (শাসন)। অর্থ: পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ ও শাসন। ব্যাখ্যা: পরিবার, সম্পদ ও সমাজ পুরুষের বংশের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে। উদাহরণ: ঐতিহাসিকভাবে আরব ও ইউরোপের সামন্তব্যবস্থা।

২৬. Nomocracy– আইনতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *nomos* (আইন) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: আইনশাসনভিত্তিক রাষ্ট্র। ব্যাখ্যা: যেখানে আইনই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব, শাসক ও জনগণ উভয়ই আইনের অধীন। উদাহরণ: যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২৭. Noocracy– প্রজ্ঞাতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *noos* (জ্ঞান, প্রজ্ঞা) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: জ্ঞানী ব্যক্তিদের শাসন। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্র পরিচালনায় দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের ভূমিকা মুখ্য। উদাহরণ: প্লেটোর 'Philosopher King' ধারণার অনুরূপ।

২৮. Mediocracy– মধ্যমেধাতন্ত্র:

উৎস: লাতিন *mediocris* (গড়পড়তা) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: গড়পড়তা দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে শাসন। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধা ও জনপ্রিয়তা মুখ্য হয়। উদাহরণ: সমসাময়িক অসংখ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

২৯. Ochlocracy– জনতাতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *ochlos* (ভীড়) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: জনতার হাতে হঠাৎ ক্ষমতা। ব্যাখ্যা: জনতার আবেগ, ভীড়ের শক্তি ও বিশৃঙ্খলা রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব ফেলে। উদাহরণ: ফরাসি বিপ্লবকালীন অবস্থা।

৩০. Gerontocracy– প্রবীণতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *geron* (বৃদ্ধ) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: বয়স্ক নেতাদের হাতে শাসন। ব্যাখ্যা: প্রশাসন ও নেতৃত্বে বয়স্কদের আধিপত্য। উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও কংগ্রেসে প্রবীণ রাজনীতিবিদদের আধিপত্য।

৩১. Epistocracy– জ্ঞানভিত্তিক গণতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *epistēmē* (জ্ঞান) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: শিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্নদের ভোট ও মতামতের বেশি মূল্য। ব্যাখ্যা: ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে জনগণের জ্ঞান ও বোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উদাহরণ: দার্শনিক বিতর্কে প্রস্তাবিত, বাস্তবে খুব কম দেখা যায়।

৩২. Cryptocracy– গোপনতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *kryptos* (গোপন) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: অদৃশ্য বা গোপন ক্ষমতাকেন্দ্রের শাসন। ব্যাখ্যা: প্রকৃত শাসক দৃশ্যমান নয়; পেছন থেকে গোপনে সব নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উদাহরণ: ছায়ারাষ্ট্র বা 'Deep State' তত্ত্ব।

৩৩. Corporatocracy– কর্পোরেটতন্ত্র:

উৎস: লাতিন corpus (প্রতিষ্ঠান) + kratos (ক্ষমতা)। অর্থ: বড় কর্পোরেট শক্তিগুলোর প্রাধান্য। ব্যাখ্যা: অর্থনীতি ও নীতি প্রণয়নে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতিনির্ধারণ।

৩৪. Kleptocracy– দুর্নীতিতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *kleptes* (চোর) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা। ব্যাখ্যা: যেখানে রাষ্ট্রনেতারা জনগণের সম্পদ লুটে নেয়। উদাহরণ: বিশ্বের বেশিসংখ্যক দেশে এই তন্ত্র বিদ্যমান।

৩৫. Minarchy– সীমিত সরকার:

উৎস: লাতিন *minor* (ক্ষুদ্র) + *archē* (শাসন)। অর্থ: ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপ। ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রের ভূমিকা কেবল নিরাপত্তা ও মৌলিক আইনি কাঠামোয় সীমিত থাকে। উদাহরণ: লিবার্টারিয়ান মতবাদ।

৩৬. Netocracy– নেটওয়ার্কতন্ত্র:

উৎস: লাতিন *network* + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর গোষ্ঠীর শাসন। ব্যাখ্যা: ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে। উদাহরণ: গুগল, ফেসবুক এবং ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রভাবশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা।

৩৭. Idiocracy– নির্বুদ্ধিতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *idiotes* (অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: মূর্খ নেতৃত্বের শাসন। ব্যাখ্যা: যোগ্যতা বা দক্ষতা ছাড়াই জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে শাসক নির্বাচিত হয়। উদাহরণ: পৃথিবীর প্রায় গণতান্ত্রিক দেশে এমন তন্ত্রের নজীর হরহামেশাই দেখা যায়।

৩৮. Synarchy– যৌথশাসন:

উৎস: গ্রিক *syn* (একসাথে) + *archē* (শাসন)। অর্থ: ক্ষমতার সমন্বিত ভাগাভাগি। ব্যাখ্যা: বিভিন্ন রাজনৈতিক বা সামাজিক গোষ্ঠী সমঝোতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। উদাহরণ: সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল কাউন্সিল।

৩৯. Stratocracy– সামরিকতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *stratos* (সেনা) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: সেনাবাহিনীর হাতে পূর্ণ ক্ষমতা। ব্যাখ্যা: সরকার কার্যত সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত হয়। উদাহরণ: মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মিশর ইত্যাদি সামরিক শাসনের কিছু দেশ।

৪০. Thalassocracy– নৌতন্ত্র:

উৎস: গ্রিক *thalassa* (সমুদ্র) + *kratos* (ক্ষমতা)। অর্থ: সমুদ্রশক্তির প্রাধান্য। ব্যাখ্যা: নৌবাহিনী বা সমুদ্রপথে বাণিজ্যশক্তি রাষ্ট্রের মূল নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে। উদাহরণ: প্রাচীন এথেন্স, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

উপর্যুক্ত এই সকল শাসনব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়, একটি সমাজ বা রাষ্ট্র কীভাবে ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা তৈরি করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এই শাসনব্যবস্থার পেছনে যে আন্তর্জাতিক প্রভাব কাজ করছে, তা বিগত ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার হাসিনার শাসনামলে দেখা গেছে। ভারতের আগ্রাসনবাদী ভূমিকায় যেখানে দিল্লি বাংলাদেশের শাসন কাঠামোতে একধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। ফ্রিৎজ সঠিক বলেছেন যে, রোবটের মতো দেশ চালানো হয় যেখানে শাসকরা কেবল রোবটের মতো নির্দেশাবলী পালন করে। এভাবে, ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ বাহিনীর পেছনে 'অন্তরালের শক্তি' বা ছায়াশক্তি কাজ করছে যা অনেক সময় জনগণের চোখের আড়ালে থাকে।

ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে শাসকদের পেছনে মূল শক্তি ছিল তাদের পরামর্শদাতা বা ছায়ামানুষ, যাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।ইতিহাসের প্রতিটি যুগে আমরা দেখি– যেখানে কোনো মহান সম্রাট, প্রভাবশালী শাসক, বা শক্তিশালী নেতা ক্ষমতার আসনে বসেছেন, সেখানেই তাদের পেছনে থেকেছে কোনো না কোনো ছায়াশক্তি। এই ছায়াশক্তি অনেক সময় হয় কোনো উপদেষ্টা, কখনও কোনো প্রভাবশালী অভিজাত, আবার কখনও নারীর অদৃশ্য প্রভাব। দৃশ্যমান ক্ষমতার আড়ালে এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবই অনেক সময় ইতিহাসের ধারা বদলে দিয়েছে।

অলিম্পিয়াস- আলেকজান্ডারের মায়ের প্রভাব

মেসিডোনিয়ার রাজপুত্র আলেকজান্ডার বা মূল উচ্চারণে 'আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট' তার সাহস, কৌশল ও বিশ্বজয়ের স্বপ্নের জন্য পরিচিত। কিন্তু ইতিহাসবিৎদের মতে তার মা অলিম্পিয়াস ছিলেন আলেক্সান্ডারের মানসিক শক্তি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান নির্মাতা।

অলিম্পিয়াস ছিলেন ধর্মীয়ভাবে ডায়োনিসাস পূজারী, যিনি বিশ্বাস করতেন তার পুত্র দেবতার বংশধর। তিনি আলেক্সান্ডারকে ছোটবেলা থেকেই রাজনীতি, কূটনীতি ও যুদ্ধকৌশলে প্রভাবিত করেন। যদিও তিনি সরাসরি তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন– এমন প্রমাণ নেই তবুও ইতিহাসবিৎ প্লুটার্ক-সহ অনেক গবেষক একমত যে, আলেক্সান্ডারের শাসনদর্শনে তার মায়ের প্রভাব ছিল গভীর।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও চার্লস-মরিস দে তাল্লেরান্ড:

ফ্রান্সের ইতিহাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম নেতৃত্ব ও বিজয়ের প্রতীকে খোদাই করা। কিন্তু তার পেছনে ছিলেন এক কূটনৈতিক জাদুকর– চার্লস-মরিস দে তাল্লেরান্ড। ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে নেপোলিওনিক সাম্রাজ্য এবং পরবর্তী পুনরুদ্ধারকাল পর্যন্ত তাল্লেরান্ড ছিলেন ইউরোপীয় কূটনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

তিনি নেপোলিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আন্তর্জাতিক জোট, শান্তিচুক্তি এবং শক্তির ভারসাম্য তৈরিতে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। অনেক ইতিহাসবিৎ তাকে "রাজনীতির রূপান্তরকারী" হিসেবে অভিহিত করেন। তবে তিনি নেপোলিয়নের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন, এমন ধারণা অতিরঞ্জিত। এসব শুধু ফিকশনে পাওয়া যায়, ইতিহাসে নয়। তবে তার প্রভাব ছিল প্রজ্ঞা, কৌশল ও তথ্যনির্ভর পরামর্শে। ষড়যন্ত্র তত্ত্বও পুশ করে গেছেন বলে কিছু বিকল্প ঐতিহাসিক মতামত দিয়েছেন।

ইয়েলু চুকাই- চেঙ্গিস খানের প্রাজ্ঞ উপদেষ্টা

মঙ্গোল সম্রাট চেঙ্গিস খান ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম ভীতিকর সেনানায়ক। কিন্তু তার সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে তার উপদেষ্টা ইয়েলু চুকাইয়ের কৌশলগত প্রজ্ঞায়।

ইয়েলু চুকাই চেঙ্গিস খানকে গণহত্যা থেকে বিরত রেখে সম্পদ ব্যবহার, কর-ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক শাসননীতির দিকে মনোযোগ দিতে পরামর্শ দেন। তার নীতির ফলে

মঙ্গোল সাম্রাজ্য শুধু ধ্বংসযজ্ঞ নয় বরং প্রশাসনিক উৎকর্ষতার দিক থেকেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। ইতিহাসবিৎরা একমত যে, ইয়েলু চুকাই ছিলেন চেঙ্গিস খানের পেছনের প্রকৃত শাসনদর্শনের স্থপতি।

এডিথ উইলসন- আমেরিকার 'প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট' বিতর্ক

১৯১৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে কার্যত অক্ষম হয়ে পড়েন। সেই সময়ে তার স্ত্রী এডিথ উইলসন হোয়াইট হাউসের ক্ষমতার লাগাম হাতে তুলে নেন।তিনি সরকারি নথি, বৈঠকের এজেন্ডা এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলো ফিল্টার করে দিতেন। অনেকে তাকে "আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট" বলে অভিহিত করলেও ইতিহাসবিৎদের মধ্যে এই দাবীটি বিতর্কিত। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হননি কিন্তু তার প্রভাব ছিল, যা অস্বীকার করা যায় না।

নারী-নেতৃত্বাধীন সমাজব্যবস্থা

ইতিহাস ও নৃতত্ত্বে এমন বহু সমাজের সন্ধান মেলে যেখানে নারীরাই নেতৃত্বে থেকেছেন বা সমাজ পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ— তিব্বত: স্থানীয় সমাজ কাঠামোয় নারীরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করেন। পশ্চিম সুমাত্রা: এখানে মিনাংকাবাউ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরাই সম্পত্তির মালিক এবং পরিবারপ্রধান। ঘানার আকান সমাজ: এখানে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার পদ্ধতি বিদ্যমান। মেঘালয়ের গারো উপজাতি: পরিবারপ্রধান ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন নারীরাই।

এই সমাজগুলো প্রমাণ করে, ইতিহাস জুড়ে পুরুষ শাসকরা সামনে থাকলেও বাস্তব ক্ষমতার বড় অংশ বহু সময় নারীর হাতে ছিল।

রথচাইল্ড পরিবার, সিসিল রোহডস ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে সিসিল রোহডস ছিলেন একটি প্রভাবশালী নাম। রোহডস রথচাইল্ড পরিবারের আর্থিক সহায়তায় ডি বিয়ার্স হীরার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

যদিও কিছু সূত্র দাবী করে যে, রথচাইল্ডরা গোপনে 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার' গঠনে রোহডসকে সহায়তা করেছিলেন, এর কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসগত প্রমাণ নেই।

তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, ব্রিটিশ রাজপরিবার, রথচাইল্ড পরিবার এবং রোহডসের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল গভীর।

ইলুমিনাতি ও ফ্রিম্যাসনারি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক যেমন: ডেভিড আইক, ক্রিস এভারার্ড, ইউরি লিনা এবং ওয়েস পেনরে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তারা দাবী করেন, বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এসব গোপন সংগঠন কাজ করে।

ইতিহাসের গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ক্ষমতার আসনে বসা শাসকের চেয়ে অনেক সময় বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন পেছনের ছায়াশক্তিরা। অলিম্পিয়াস, তাল্লেরান্ড, ইয়েলু চুকাই, এডিথ উইলসন কিংবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীরা– তারা প্রত্যেকেই প্রমাণ করেছেন দৃশ্যমান শাসনব্যবস্থার বাইরে থেকেও নীতি, কৌশল ও সিদ্ধান্তকে গোপনে প্রভাবিত করা যায়।

আজকের বিশ্বেও যখন বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামো বোঝার চেষ্টা করা হয়, তখন এই ঐতিহাসিক সত্যটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়: যা দৃশ্যমান, সেটিই সবসময় আসল সত্য নয়।

মোহাম্মদ বিন সালমানের 'ভিশন ২০৩০' এবং তথাকথিত সংস্কার

২০১৭ সাল থেকে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন। ভিশন ২০৩০ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনি নিম্নলিখিত বড় সংস্কারগুলো চালু করেন:

অর্থনীতিকে তেলের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে সরিয়ে বহুমুখীকরণ। পর্যটন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সহনশীলতার নামে নতুন নীতি প্রবর্তন। বিনোদন শিল্প, সিনেমা হল এবং আন্তর্জাতিক কনসার্ট চালুর অনুমোদন। অমুসলিমদের প্রতি নীতি কিছুটা নমনীয় করা, যা পূর্বের কট্টর অবস্থানের তুলনায় বড় পরিবর্তন।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরব সরকার এবং ভ্যাটিকানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মূল পয়েন্টগুলো হলো: ভ্যাটিকানের কার্ডিনাল জঁ-লুই তোরান (Jean-Louis Tauran), যিনি ভ্যাটিকানের 'ইন্টারফেইথ ডায়ালগ কাউন্সিল'-এর প্রধান ছিলেন, সৌদি আরব সফর করেন। সৌদি সরকারের ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল করিম আল-ইসা এর সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে 'ইক্যুমেনিক্যাল কাউন্সিল' (Ecumenical Council) গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয় যা অমুসলিম ধর্মযাজকদের জন্য গোপন উপাসনালয়

পরিচালনার অনুমতি দেয়। সরাসরি প্রকাশ্যে গীর্জা নির্মাণের অনুমতি না থাকলেও গোপনে খ্রিষ্টান প্রার্থনালয় চালানোর অনুমোদন দেওয়া হয়।

সৌদি আরবে প্রায় ১৫ লাখ থেকে ২০ লাখ খ্রিষ্টান বসবাস করে যাদের অধিকাংশই ফিলিপাইন, ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে আসা প্রবাসী। এতদিন পর্যন্ত তারা নিজেদের বাড়িতে বা দূতাবাসের ভেতরে গোপনে প্রার্থনা করতেন। ২০১৮ সালের অনুমোদনের পর এই গোপন উপাসনালয়গুলো কিছুটা আইনি সুরক্ষা পায়।

এই অনুমোদনের পিছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক কারণ ছিল।মার্কিন প্রভাব– আমেরিকা প্রশাসনের চাপের ফলে সৌদি আরবকে ধর্মীয় সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হয়। ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ– সৌদি আরব ধীরে ধীরে ইসরায়েলকে মেনে নেওয়ার পথে হাঁটছিল। ভ্যাটিকানের কূটনৈতিক প্রভাব– সৌদি আরব ইউরোপীয় খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করতে চাইছিল।

মুসলিম বিশ্বের অনেক আলেম ও গবেষক সৌদির এই নীতিকে "ধর্মীয় পরিচয়ের অবক্ষয়" হিসেবে সমালোচনা করেন। সৌদি আলেমদের একটি অংশও এই নীতির বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে সৌদি সরকার এটাকে 'সহনশীলতা ও সহাবস্থান' (Tolerance and Coexistence) নীতির অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে।

২০১৮ সাল সৌদি আরবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনের বছর। যে দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কঠোর ওহাবী মতবাদের অধীনে পরিচালিত হয়েছে সেই দেশ এখন 'ভিশন ২০৩০'-এর আওতায় নতুন সামাজিক-ধর্মীয় বাস্তবতায় প্রবেশ করছে। গোপন খ্রিষ্টান উপাসনালয়ের অনুমতি শুধু একটি ধর্মীয় সিদ্ধান্ত নয়; এটা একটি ভূরাজনৈতিক কৌশল, যা সৌদি আরবকে পশ্চিমা বিশ্ব, ভ্যাটিকান এবং ইসরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। যা 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' প্রতিষ্ঠার একটা ধাপ।এটা স্পষ্ট যে, ঐতিহাসিক এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিসরে এই সম্পর্কগুলোর প্রভাব অসীম।

ব্রিটিশ রাজকীয় পরিবার বিশেষ করে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিবার সম্পর্কে বেশ কিছু বিরূপ ধারণা প্রচলিত রয়েছে। 'The Evil History of the British Royal Family' শিরোনামে একটি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে:

> "...There are people who believe they have a God given right to rule over others. They harbor selfish

ambitions to be rich, and to have power over what they describe as (common people.) They lie, cheat steal, strangle, stab, and slash their way to power. They believe that their actual will power, what the British occultist Aleister Crowley described as 'The Will of Thelema, The royal will' must be obeyed. They are the British Royal family."

ব্রিটিশ রাজকীয় পরিবার নিজেদের শিকড় প্রাচীন ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করে. বিশেষ করে যখন (রাজা সলোমন) নবী সুলাইমান (আ.) ইসরায়েলের রাজত্ব পরিচালনা করতেন। এই ধারণাটি বোঝার জন্য নাইট টেম্পলারদের ইতিহাস নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রয়োজন।

ইউরোপে নাইট টেম্পলারদের উপাখ্যানের কয়েকটি প্রচলিত মতবাদ রয়েছে। এরমধ্যে একটি হলো:

"ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করার পর দক্ষিণ ফ্রান্সের অভিজাতরা এগারোজন ফরাসি নাইটকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে জেরুজালেমে পাঠায়। এই নাইটদের সঙ্গে প্রাচীন ইহুদী গোত্রের রক্তসম্পর্ক ছিল। তাদের মিশন ছিল 'টেম্পল অভ সলোমন'-এর ধ্বংসস্তূপের নিচে থাকা রাজা সলোমনের আধিভৌতিক পান্ডুলিপি উদ্ধার করা। কারণ তারা বিশ্বাস করত যে রাজা সলোমন ব্ল্যাক ম্যাজিকের গভীর জ্ঞান ধারণ করতেন, যা কাব্বালাহ্ নামে পরিচিত।"– তবে ইসলাম তা বিশ্বাস করে না। ইসলাম এটাকে মোজেজা বলে। আর নবী সুলাইমান (আ.) শুধু মানব জাতির শাসক ছিলেন না, জ্বিন জাতিরও শাসক ছিলেন। আমি এখানে তাদের গ্রন্থ ও মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্ত করব। এজন্য নবী সুলাইমান (আ.)-কে রাজা সলোমন সম্বোধন করব। ইহুদী ও খ্রিষ্ট গ্রন্থের ভাষ্য উপজীব্য করে বলব।

এই কাব্বালাহ-র প্রভাব পরে ফ্রিম্যাসনারি এবং ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর মূল উপাসনাবিদ্যা হয়ে ওঠে। ইসরায়েলের পতাকা যার মাঝখানে 'স্টার অভ ডেভিড' চিহ্নটি রয়েছে, সেই প্রতীকটি রাজা সলোমনের কাবালার প্রতীকও ছিল। ফ্রিম্যাসনারি এবং ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর পদ্ধতির মধ্যে বারবার এই প্রতীকটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

১৯৫৩ সালে, কুইন এলিজাবেথ নিজেকে 'কুইন অব ইসরায়েল' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন যা প্রাচীন ইসরায়েলের সঙ্গে আধুনিক ব্রিটিশ রাজকীয় পরিবারটির সম্পর্ককে আরও স্পষ্ট করে তোলে। যদিও ঐতিহাসিকরা এই দাবীকে গুজব হিসেবে অভিভূত করে থাকে। তবে এই সম্পর্কের বুনিয়াদি বিষয়গুলো সেলুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সামনে এসেছে:

রাজা সলোমন + কাবালা + টেম্পল অভ সলোমন + নাইট টেম্পলার + ফ্রিম্যাসনারি + ইলুমিনাতি + আমেরিকান বিপ্লব + ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার + দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন আগ্রাসন– এই সকল উপাদান একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। মার্কিন ডলার বিলের উপর কাবালার চিহ্ন এবং 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

এই প্রাচীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সাথে একটি রহস্যময় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে তারা রাজা সলোমনের কাবালার জ্ঞানে নিপুণ হওয়ার জন্য বহু শতাব্দী ধরে কৌশলগত পথ অবলম্বন করেছে যা এখনো আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার।

গথিক স্থাপত্যের ঐতিহাসিক প্রভাব বিশেষ করে নাইট টেম্পলারদের যাত্রা এবং কাবালার অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের ইউরোপে একটি অদ্ভুত স্থাপত্যধারা তৈরি হয়েছিল। গথিক স্থাপত্যের উদ্ভব এবং তার প্রভাব আজও শিল্পগবেষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

ফরাসি অভিজাতরা কাব্বালাহ চর্চার মাধ্যমে বিশ্বময় ক্ষমতার বিস্তার লক্ষ্য করেছিল যা পরবর্তীতে ব্রিটিশ রাজপরিবারের কার্যক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। 'The Lesser Key of Solomon' বা নবী সুলাইমান (আ.) বা রাজা সলোমনের কাবালার ওপর রচিত গ্রন্থগুলো গোপন জাদুবিদ্যা সম্পর্কিত ছিল যা আজও শক্তিশালী গোপন সমাজগুলোর কর্মধারা নির্ধারণে ভূমিকা রাখছে। তবে মূল ধারার ঐতিহাসিকরা এটাকে পৌরাণিক গল্প বা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বলে মত দিয়ে থাকে। এইসবকে তারা অবিশ্বাস্য অতিরঞ্জিত কথক হিসেবে বিবেচিত করে।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের চারপাশে নানা conspiracy তত্ত্ব ও অদৃশ্য শক্তির দাবী বহুযুগ ধরে প্রচলিত। বিশেষত ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু মানুষের মধ্যে ধারণা রয়েছে, তারা নিজেদের 'দেবতুল্য অধিকার' হিসেবে শাসনের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। এই ধরনের দাবীগুলো প্রায়শই Aleister Crowley-এর Will of

Thelema বা occult শক্তি ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তবে এ ধরনের দাবীর প্রামাণ্য ভিত্তি খুবই সীমিত।

British Israelism বা Anglo-Israelism নামের মতবাদ অনুসারে ব্রিটিশ রাজপরিবারকে প্রাচীন ইহুদী রাজা দাউদের (নবী দাউদ আ.) বংশধর হিসেবে ধরা হয়। এটা একটি বিশ্বাস বা ধর্মীয় তত্ত্ব; ইতিহাসবিৎরা এটা প্রমাণিত বা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক ভিত্তিতে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সরাসরি ইহুদী শিকড় নেই।

তবে ব্রিটিশ রাজপরিবারের এইসব প্রাচীন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের আধুনিক বিশ্বের ক্ষমতার কেন্দ্রে একটি অদৃশ্য শক্তি হিসেবে তাদের পরিচিতি সৃষ্টি করেছে। এই সূত্রটা ইয়াদে রাখবেন। 'ছায়ারাষ্ট্র' বিষয়ে এই পর্যায়ে কথা বলা জরুরি। প্রাচীন তত্ত্বের সাথে এটা খুব সংপৃক্ত। কীভাবে? আসুন তাই জানি।

বিশ্ব-রাজনীতির অদৃশ্য দিকগুলোর দিকে নজর দিলে এক অদ্ভুত বাস্তবতা ফুটে ওঠে। রাজনৈতিক শাসন, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং গোপন কার্যক্রমগুলো অনেক সময় আমাদের চোখের আড়ালে চলে যায়। এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাব কখনোই একেবারে সরাসরি দৃশ্যমান হয় না কিন্তু তাদের উপস্থিতি, কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্তগুলো পৃথিবীজুড়ে পরিবর্তন আনতে পারে। এরা 'ডিপ স্টেট' বা 'ছায়ারাষ্ট্র' নামে পরিচিত, যা রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি রহস্যময় এবং ভয়াবহ দিক।

ডিপ স্টেট কী?

'ডিপ স্টেট' বা 'ছায়ারাষ্ট্র' এমন একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো যা সরকার এবং আইনগত প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে কাজ করে। এতে সাধারণ জনগণের নির্বাচিত সরকার নেই বরং বিশেষ কিছু গোষ্ঠী বা শক্তি রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এই শক্তিগুলো বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে। ডিপ স্টেটের ধারণা অনুযায়ী, সরকার নিজেদের সিদ্ধান্ত নিলে, তারা পেছন থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে এমন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা। এই শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে মিডিয়া, প্রতিষ্ঠান, শক্তিশালী করপোরেট গোষ্ঠী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা।

আধুনিক ডিপ স্টেটের শাসন: বিশ্বের দেশগুলো

আজকের বিশ্বের বেশ কিছু দেশ ডিপ স্টেটের প্রভাবে শাসিত হচ্ছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। যদিও এ ধরনের শাসনপ্রক্রিয়া সাধারণ জনগণের চোখে সাধারণত ধরা পড়ে না, তথাপি এই দেশগুলোতে নানা ধরনের অদৃশ্য শক্তি শাসন চালায় যা সরকারের নীতিমালা, সিদ্ধান্ত এবং ভবিষ্যৎ প্রভাবিত করে।

১. যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ডিপ স্টেটের ধারণা সবচেয়ে বেশি আলোচিত। একে বলা হয় 'গুপ্ত সরকার' বা 'অদৃশ্য সরকার'। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি হত্যার পর থেকে এই ধারণা ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে। ওয়াশিংটনের পেছনে কার্যকরী শক্তি হচ্ছে করপোরেট গোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সেনাবাহিনী– এরা রাষ্ট্রের মূল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় এক ধরনের হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। ট্রাইলেটারাল কমিশন এবং বিভিন্ন গোপন সংগঠন।যেমন: রকফেলার, রথচাইল্ড পরিবারের শক্তি, এবং ফ্রিম্যাসনরা একাধিক আন্তর্জাতিক নীতির শাসনে কাজ করে থাকে। এই দাবী তারা ও তাদের অনুগামীরা মানতে চায় না, এটাকে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বলে এড়িয়ে যায়।

২. যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যও ডিপ স্টেটের শাসনে আছে যেখানে রাজপরিবারের পেছনে থাকা গোপন শক্তি এবং বৈশ্বিক করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব ক্ষমতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রেক্সিটের পরপরই অনেকেই যুক্তরাজ্যে পেছনের শক্তি তথা গোপন রাষ্ট্রীয় শক্তি নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন। এই শক্তি বৈশ্বিক মাপের সিদ্ধান্তে যুক্তরাজ্যের সরকারকে অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। গণতন্ত্র নামক ধোঁকাবাজির এটাই ধারা। এসব চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না।

৩. ইসরায়েল

ইসরায়েলও এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে ডিপ স্টেটের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রবল। দেশটির সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং বৃহত্তর ইহুদী অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক গভীরভাবে এই ডিপ স্টেটের শাসনে পরিচালিত হয়।

৪. ভারত

ভারতেও একটি দৃশ্যমান সরকারের আড়ালে একটি ডিপ স্টেট রয়েছে যা বিশ্বের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রবণতাগুলোর সাথে সমন্বয় করে চলতে থাকে। দেশের বৃহত্তম করপোরেট গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে গোপন চুক্তি বা সমঝোতা দেশটির অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক নীতির উপর বিশাল প্রভাব ফেলে।

৫. রাশিয়া

রাশিয়ায়ও ডিপ স্টেটের শক্তি এক বিশেষ ধরনের গোপন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। একাধিক আন্তর্জাতিক গোপন সংগঠন, অর্থনৈতিক শক্তি এবং সামরিক বাহিনীর ভেতরকার লবিংয়ের মাধ্যমে রাশিয়ার সরকারকে পরিচালিত করে থাকে। পুতিনের প্রশাসনও ডিপ স্টেটের হাত থেকে মুক্ত নয় বরং তার শক্তির পেছনে রয়েছে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান।

৬. চীন

চীনের ক্ষেত্রে ডিপ স্টেটের ধারণা আরও রহস্যময়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছায়া-রাজনীতির একটি শক্তিশালী উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চীনে সবকিছুই কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এর পেছনে কাজ করে একাধিক গোপন শক্তি যেগুলো সরকারের কার্যক্রম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে।

ডিপ স্টেটের শক্তি ও প্রভাব

ডিপ স্টেটের ক্ষমতা সাধারণত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে:

১. অর্থনীতি: বৃহত্তর ব্যাংকিং এবং করপোরেট গোষ্ঠীসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিকে প্রভাবিত করে। ফেডারেল রিজার্ভ (যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক),

বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক শাসনকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

২. গোয়েন্দা সংস্থা এবং সামরিক বাহিনী: CIA, MI৬, Mossad, KGB– ইত্যাদি এই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক নীতির দিকনির্দেশনা প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো তখন বাস্তবায়ন হয় যখন এই সংস্থাগুলোর তথ্য এবং পরিচালনা পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা হয়।

৩. বৈশ্বিক গোপন চুক্তি: ডিপ স্টেটের গোপন চুক্তি ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পর্কটি বহু যুগের প্রাচীন। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, ট্রাইলেটারাল কমিশন, গ্লোবাল ফোরাম– এইসব গোপন গোষ্ঠী বৈশ্বিক নীতির অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ডিপ স্টেটের আধিপত্য পৃথিবীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃশ্যের এক অদৃশ্য শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। একে সরাসরি একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব মনে হতে পারে তবে বাস্তবতা হলো, এটা এক ধরনের নীরব ও গোপন রাষ্ট্রীয় কাঠামো যা আমাদের নজরের আড়ালে কাজ করে। এর প্রভাব একাধিক রাষ্ট্রে দৃশ্যমান যেখানে জনগণ তেমন কিছু জানতে পারে না কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবন ও নীতির স্রোত এই অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিশ্বের রাজনীতির আড়ালে এই গুপ্ত শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি তথ্যই একটা তত্ত্ব।

কীভাবে তা? বিশ্ব-রাজনীতির এক অদৃশ্য জাল বিছানো রয়েছে যেখানে শাসনের অঙ্গনে একাধিক শক্তি ও গোপন গোষ্ঠী নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে নিবেদিত। এই শক্তিগুলো, যারা 'ডিপ স্টেট' বা 'ছায়ারাষ্ট্র' হিসেবে পরিচিত, কখনও প্রকাশ্যভাবে দৃশ্যমান হয় না, তবে তাদের কার্যক্রম পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। চিত্রের বাইরে, একটি অদৃশ্য রাষ্ট্র চলমান, যেখানে পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতি, রাজনৈতিক ফিগার এবং করপোরেট গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে বিশ্বব্যাপী শাসনের রূপরেখা তৈরি করে। এই শক্তির উপস্থিতি আমাদের চোখে পড়ে না তবে তাদের সিদ্ধান্তগুলো প্রতিদিনের জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

গুপ্ত সরকারের অন্ধকার অধ্যায়- ষড়যন্ত্রের পর্দার আড়ালে

বিশ্ব-রাজনীতির পর্দার আড়ালে যেখানে সাধারণ জনগণের চোখ পৌঁছায় না সেখানে এক গুপ্ত সরকার চলছে। এই সরকার কখনও প্রকাশ্যে আসে না কিন্তু এর শক্তি ও প্রভাব পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত। ষড়যন্ত্রের এই বিশ্বে, কিছু লেখক ও গবেষক তাদের

কাজের মাধ্যমে এর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তারা বিশ্বাস করেন, যে সকল শক্তি বা সংস্থাগুলো বিশ্বের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে তা এক অদৃশ্য কক্ষে অবস্থান করে– প্রকাশ্যে কিছু বলে না কিন্তু প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে তাদের হাত থাকে।

ড্যান স্মুট, উইলিয়াম গাই কার, জিম মারস, ক্যারল কুইংলি, গ্যারি অ্যালেন, অ্যালেক্স জোনস, ডেস গ্রিগিন, জি. এডোয়ার্ড গ্রিফিন, ডেভিড আইক এবং মাইকেল এ. হফম্যান– এই লেখকরা একদম আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে এই গুপ্ত সরকারের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তাদের রচনাগুলোর মধ্যে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে, গোপন শক্তির সদস্যরা সাধারণত কাউন্সিল অব ফরেইন রিলেশনস, ট্রাইলেটারেল কমিশন, বিল্ডারবার্গ গ্রুপ, সিআইএ, এমআই-৬ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা পরিচালিত হয়। এই গুপ্ত শক্তি কখনও সরাসরি শাসনক্ষম হয় না কিন্তু তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জোট, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবতার আঁকাবাঁকা পথে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একজন ব্যক্তি হলেন মিল্টন উইলিয়াম কুপার। তার বই 'Behold a Pale Horse' (১৯৯১) ইউএফও এবং মিলিশিয়া আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। কুপার দাবী করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত গোত্রের সাথে একটি গোপন চুক্তি করেছে এবং এই সম্পর্কই বাস্তবায়িত হচ্ছে গোপন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। কুপারের মতে, ইলুমিনাতি, বিল্ডারবার্গ গ্রুপ এবং অন্যান্য গোপন সংগঠন এই চুক্তিগুলোর মাধ্যমে বিশ্ব শাসনের চেষ্টা করছে।

এছাড়া, কুপার বিশ্বাস করতেন যে গুপ্ত গোত্র (দাজ্জাল) মানুষকে শাসন করতে গুপ্ত ধর্মীয় সংগঠন, জাদু এবং কাল্টের মাধ্যমে কাজ করছে। তিনি দাবী করেন, এই শক্তিগুলোর মাধ্যমে, এমনকি ইলুমিনাতির সদস্যরা নিজেদের অজান্তেই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলেন। তিনি আরও বলেন, ইলুমিনাতির লক্ষ্য ছিল, এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা– যেখানে পৃথিবীর শাসন একক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকবে।

কুপারের লেখা এক নতুন ধারণা সৃষ্টি করে যেখানে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বা 'নতুন বিশ্ববিবর্তন' অর্থাৎ 'নব বিশ্ব সভ্যতা' শুধু একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বাস্তবায়িত হতে পারে। তিনি আরও দাবী করেন যে গুপ্ত কমিটি, যেটা ম্যাজেস্টিক-১২ নামে পরিচিত, তার হাতেই জেমস

ফরেস্টালের মৃত্যু হয়েছিল। এই কমিটি, ট্রাইলেটারাল কমিশন এবং কাউন্সিল অব ফরেইন রিলেশনস-এর নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কাজ করত।

কুপারের কাজ বিশেষভাবে তার ''Behold a Pale Horse' বইটি, ষড়যন্ত্র তত্ত্ববিদদের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইলুমিনাতি-এর মাধ্যমে বিশ্বের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কুপারের মতানুযায়ী, ডিপ স্টেট বা ছায়া-সরকার শুধু একটি মিথ নয়, তা একটি বাস্তব প্রক্রিয়া যা শক্তি ও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বিশ্বজুড়ে এই ধরণের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের প্রভাব অব্যাহত থাকলেও মূলধারার রাজনীতি এবং ক্ষমতা এখনও প্রকাশ্যে চলে আসে না। কিন্তু কুপারের তত্ত্ব এ কথা প্রমাণ করে যে, প্রতিটি শাসনব্যবস্থা এবং তার পেছনে থাকা শক্তি গোপন ও সঙ্কীর্ণ পথে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে– একটি অদৃশ্য রাষ্ট্র যেখানে জনগণ অজান্তেই শাসিত হয়।

মাইকেল লোফগ্রেনের উল্লিখিত বর্ণনা 'ছায়ারাষ্ট্র' বা 'ডিপ স্টেট'-এর অদৃশ্য ক্ষমতার রূপরেখা তৈরি করে যা প্রকৃত রাষ্ট্রীয় শাসন ও প্রশাসনিক কাঠামোর পেছনে কার্যকরীভাবে কাজ করে। এই গোষ্ঠী তাদের মিত্রদের মাধ্যমে নির্বাচন, শাসন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যদিও এগুলো জনসাধারণের সেবকদের নামে চালানো হয়। এরা নিজেদের স্বার্থ পূরণ করতে, প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং সুযোগ তৈরি করে অথবা ঐতিহাসিকভাবে সরকারের অক্ষমতা বা জনগণের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে সংকট তৈরি করে। যেমন: নাইন ইলেভেন ষড়যন্ত্রের পর মধ্যপ্রাচ্যের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি।

জর্জ ফ্রিডম্যান এবং কার্ল সুজের ব্যাখ্যাও এই ধারণাকে সমর্থন করে যেখানে দেখা যায়, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা ও নীতি প্রণয়ন সঠিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং বিশেষ কিছু গোষ্ঠী বা এজেন্ডা পরিচালনা করে থাকে। একদিকে, ভোটাধিকারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসলেও বাস্তবে এদের পেছনে ছায়ারাষ্ট্রের গোপন প্রভাব থাকে, যারা নির্ধারণ করে কে ক্ষমতায় আসবে এবং কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

এই ছায়ারাষ্ট্রের কার্যক্রম, বিশেষত সেনা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক শক্তির সহযোগিতায়, বিশ্ব-রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। 'আইএস' (ISIS)-এর মতো জঙ্গি সংগঠনগুলোর সৃষ্টি এবং উত্থান এর এক উদাহরণ। পৃথিবীকে অস্থিতিশীল রাখা ও ইসলামকে বিতর্কিত করাও এই গোষ্ঠীর একটা

প্রধান উদ্দেশ্য। এসব ঘটনা গভীর কৌশলের অংশ হিসেবে পরিকল্পিত হতে পারে যা গোপনে জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিজেদের নীতি বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে।

এই প্রসঙ্গগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একটি শক্তিশালী ছায়ারাষ্ট্র কীভাবে বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতি এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা বোঝা যায়।

এই বর্ণনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে 'ডিপ স্টেট' বা 'ছায়ারাষ্ট্র' গভীরভাবে একনায়কতা প্রতিষ্ঠা করতে ও জনগণের অধিকার শোষণ করতে কাজ করে। একদিকে, তারা জাতীয় নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক সংস্থার আধিপত্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পেছনে নিজেদের শক্তি কায়েম করে আর অন্যদিকে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে নিরাপত্তা, সংঘাত ও ভয়ের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে।

একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে এই ছায়ারাষ্ট্রের প্রভাব এতটাই গভীর যে, সরকারি কার্যক্রমের পেছনে অবাধে কাজ করছে শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলো, যাদের কার্যক্রম সাধারণ জনগণের নৈতিকতা বা স্বার্থের সাথে সংযুক্ত থাকে না। এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে 'গ্রুপ থিংক' বা সমষ্টিগত চিন্তায় বাধ্য করা হয়, যার ফলে তারা স্বাধীন চিন্তা করার সুযোগ হারিয়ে ফেলে এবং একে অপরকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের সামনে মিছিল, আনন্দ আয়োজন কিংবা দিন-উৎসবের মাধ্যমে সারাবিশ্বকে বিভ্রান্ত করা হয়, যাতে জনগণ তাদের আসল উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন না হয়ে পড়ে।

ডিপ স্টেটের সাফল্য তার সিস্টেমিক ক্ষমতা এবং পেছনের কর্মসূচির কারণে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে কৌশলীভাবে বিশাল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তারা ক্ষমতা বজায় রাখতে এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী একটি নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি তৈরি করে। এই শক্তিশালী সংস্থাগুলো শুধু দেশীয় রাজনৈতিক শাসনে নয়, পুরো পৃথিবীজুড়ে পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। যেমন: বিশেষভাবে যুদ্ধবাজ মনোভাব সৃষ্টি করা বা অস্থিরতা তৈরি করা।

তবে জন ডাবলু হোয়াইটহেডের মতে, এই ডিপ স্টেট শুধু রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ নয়, এটা একটি 'পুলিশি রাষ্ট্র' তৈরি করেছে যেখানে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। এতে ধনীরা আরও ধনী হয়, গরিবরা আরও গরিব হয়ে যায় এবং মিলিটারি শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। 'অপরিবর্তনীয়' এই পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে ছায়ারাষ্ট্রই

আসল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হয়ে ওঠে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে যেই সরকার পরিবর্তন হয় তা প্রকৃতপক্ষে তাদেরই হাতের পুতুল।

এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, সৎ ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক-ব্যবস্থার অভাব এবং গভীরভাবে ঢুকে থাকা শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব আমাদের সমাজে নানা ধরনের অস্থিরতা এবং শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ডিপ স্টেট: একটি অদৃশ্য শক্তির উত্থান

বিশ্বের কোনো না কোনো কোণায়, একদল অদৃশ্য শক্তি তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করছে। তাদের কাছে দেশ, সরকার, জনগণের অধিকার সবই একটি খেলা, আর তাদের একমাত্র লক্ষ্য– ক্ষমতা এবং প্রভাব। এই অদৃশ্য শক্তির নাম, 'ডিপ স্টেট'। কেউ জানে না, তাদের সত্যিকার উদ্দেশ্য কী? কেউ জানে না, তাদের মিশন কী? কিন্তু তাদের কাজের পরিণতি প্রতিটি রাষ্ট্রে রক্তাক্ত সংঘাত, শোষণ এবং বিভাজনের মতো ভয়াবহ ঘটনা সৃষ্টি করে।

হোয়াইটহেডের ভাষায়, 'ডিপ স্টেট' কখনোই চোখের সামনে দেখা যায় না। এটা আসলে এক ধরনের শ্যাডো সরকার, যা সাংস্কৃতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। এটা একটি গোপন গোষ্ঠী, যাদের কাছে নিরাপত্তা, গোয়েন্দা বাহিনী এবং আধিপত্যের হাতিয়ারের মাধ্যমে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

২০০৭ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহতে একটি বিশাল গোপন স্থাপনা তৈরি করা হয়– ১৭টি ফুটবল মাঠের সমান। তার নাম 'ইউএস ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি' (এনএসএ) ডেটা সেন্টার যা ইউটাহ ডেটা সেন্টার নামেও পরিচিত। এটা ইউটাহর ক্যাম্প উইলিয়ামসে অবস্থিত।

স্টোরেজ ক্ষমতা—এই ডেটা সেন্টারে ১ জেটাবাইট (zettabyte) পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষমতা আছে। ১ জেটাবাইট হলো ১ ট্রিলিয়ন গিগাবাইটের সমান। সংরক্ষিত তথ্যের ধরন— এটা বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের সব তথ্য (ইচ্ছা, চিন্তা, অভ্যাস ইত্যাদি) সংরক্ষণ করে না। এর প্রধান কাজ হলো এনএসএ-এর বিদেশি গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য।যেমন: ফোনকল, ইন্টারনেট ডেটা, ইমেইল ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। বিশেষত, সন্দেহভাজন ও শত্রুদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য এই ডেটা সেন্টারটি ব্যবহার করা হয়।

এটা একটি আন্ডারগ্রাউন্ড শহর যেখানে বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের তথ্য রয়েছে, তাদের ইচ্ছা, চিন্তা, অভ্যাস– সবকিছু। যখন কোনো রাষ্ট্র বা জনগণের বিরুদ্ধে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, এই শক্তি তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। এই শহরের অধিবাসী কখনো জনগণ হয় না, শুধু একদল ক্ষমতাধর ব্যক্তি– ডিপ স্টেটের সদস্যরা।

ডিপ স্টেটের গভীরতার মাঝে আছে তাদের গোয়েন্দা বাহিনী– এফবিআই এবং সিআইএ। এসব সংস্থা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে সন্ত্রাসী সৃষ্টি করতে পারদর্শী। তারা গোপনে মানুষকে সংগ্রহ করে এবং তাদের হাত দিয়ে তৈরি করে ভয়াবহ পরিস্থিতি। 'ম্যানুফ্যাকচারিং টেররিস্ট'– এটাই তাদের কাজ। এবং এভাবে, তাদের শাসন পোক্ত হয়।

বিশ্বের ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ে ডিপ স্টেট বহু যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে। সামরিক শক্তির প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতের মাধ্যমে তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। তবে তাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলো, নিজেদের এক বিশাল শহরে, মাউন্ট ওয়েদারের নিচে। এখানে তারা নিরাপদ, যেখানে আণবিক যুদ্ধের পরেও তাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তারা জনগণকে নয়, তাদের নিজেদের কট্টর পৃষ্ঠপোষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

মনে হয়, এক গোপন চক্র তৈরি হয়েছে যেখানে শক্তির খেলোয়াড়রা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। 'ডিপ স্টেট' যতটা শক্তিশালী, ততটাই অদৃশ্য। তাদের কার্যক্রম সকলের নজর থেকে দূরে থাকে। এবং এই অদৃশ্য শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর প্রতিটি সরকার এবং রাষ্ট্রকে অকার্যকর করে ফেলে।

বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশের পরিস্থিতি এটার একটি সুনিপুণ উদাহরণ। একদলীয় শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাব, আইনের শাসন বিলুপ্ত– এসব কিছুই এই ছায়া সরকারের প্রতিফলন। জনগণ হয় চুপ, নয়তো তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত। সুশাসন এবং গণতন্ত্রের কথা সবাই ভুলে গেছে। একক রাষ্ট্রনায়ক তার নিজস্ব পথচলা শুরু করেছে, জনগণ যে বোঝে না তাদের অধিকার কেমন করে খসে যাচ্ছে।

এটা একটি থ্রিলার কিন্তু বাস্তবতার রূপ। ডিপ স্টেট তাদের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে আর রাষ্ট্রগুলো তাদের হাতের পুতুল। জনগণের কোনো আওয়াজ নেই, তাদের অস্তিত্ব কেবল একটি সাদা পৃষ্ঠায় লেখা একটি নাম মাত্র।

আর এভাবেই, আধুনিক রাষ্ট্রের গোপন শক্তি একে একে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করছে। তাদের ছায়া এখন প্রায় প্রতিটি দেশে প্রবাহিত।

ডিপ স্টেটের প্রকৃতি এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে গভীর সত্য উন্মোচিত হয়। এর সাথে যুক্ত এক অন্যতম শক্তিশালী নাম হলো রথচাইল্ড পরিবার। বলা যেতেই পারে, রথচাইল্ড পরিবার একটি সাধারণ শাসক বা ধনাঢ্য পরিবার কিন্তু তারা শুধু একটি পরিবারের মতো নয়; তাদের শিকড় এখন বিশ্বময়, এক অসীম শক্তি এবং প্রভাবের বিস্তার। এরা একসময় শুধু একটি বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু আজ তারা নানা নামে এবং নানা সংগঠনে বিস্তৃত হয়ে গেছে। শুধু এই পরিবার নয়, সাথে অন্য ১২টি পরিবারও আছে।

রথচাইল্ড পরিবার এবং তাদের সহযোগী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা পরিচালিত এই ছায়া সরকারকে বুঝতে হলে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রভাবের সত্যিকারের চিত্র জানতে হবে। শুধু ইসরায়েল বা ইহুদীদের এক সম্প্রদায় হিসেবে দেখলে ভুল হবে– তাদের অভিপ্রায় অনেক গভীর এবং অন্ধকার।

এভাবে, ডিপ স্টেটের অধীনে পরিচালিত বিশ্বের শাসনব্যবস্থায়, জনগণ কখনোই প্রকৃত সত্য জানতে পারে না। তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব ছড়িয়ে যায় এমনকি এমন জায়গায় যেখানে জনগণের পক্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব! আজকের বিশ্বে এই অদৃশ্য শক্তির বাস্তবতা, তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব বুঝতে গেলে গভীর অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যা এখনও আমার হয়নি, তাই তা বলাও আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

এই পুরো ঘটনাপ্রবাহে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায়— পৃথিবীজুড়ে এই গভীর রাষ্ট্রীয় শক্তি কতটা বাস্তব এবং এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী? বাস্তবিকভাবে, আমাদের সামনে যে সরকার বা সংস্থা রয়েছে, তার পেছনে একাধিক শক্তি সক্রিয় থাকতে পারে যারা আমাদের দৃশ্যমান সিদ্ধান্তের আড়ালে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

'ইয়াজুজ-মাজুজ' নাম সবাই জীবনে একবার হলেও শুনেছেন। ডিপ স্টেট, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্ব শাসনব্যবস্থার সাথে ইয়াজুজ-মাজুজ-এর সংপৃক্ততা আছে। ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে অনেক কল্প-কাহিনি আছে। আছে জাল হাদীসের ছড়াছড়ি। তারা দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা প্রাচীরে বন্দী আছে। ইয়াজুজ-মাজুজ দেখতে দৈত্যের মতো, এদের কান এক হাত লম্বা, নাক বড়, জিহবা দিয়ে প্রাচীর চেটে যায় সারারাত, এরপর সকালে তা আবারও ভরাট হয়ে যায়– ইত্যাদি এমন আরও অতিরঞ্জিত গল্প প্রচলিত আছে।

এ বিষয়ে আলোচনার আগে আমাদের পবিত্র কোরআনুল কারিমের সূরা কাহাফের উল্লেখযোগ্য আয়াত আগে পাঠ করে নেওয়া জরুরি।

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা কাহাফে বলেন—

“তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে? বলুন, আমি তোমাদের কাছে তাঁর বিষয়ে কিছু বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং তাকে সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ দিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি এক রাস্তা অবলম্বন করলেন। অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন তখন তিনি সূর্যকে এক অস্বচ্ছ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদাচার করতে পারেন। তিনি বললেন, যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। আর যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং আমি তাকে সহজ কাজের নির্দেশ দেব। অতঃপর তিনি আরেক পথ অবলম্বন করলেন। [১৮: ৮৩-৮৯]

অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। আবার তিনি আরেক পথ ধরলেন। [১৮: ৯০-৯২]

আবার যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌছলেন তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা কমই বুঝতে পারে। তারা বলল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ-মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা আমাকে যা দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব; তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। [১৮: ৯৩-৯৬]

অতঃপর তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে ও সক্ষম হলে না। সে (যুলকারনাইন) বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন আর আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। [১৮: ৯৭-৯৮]

ইয়াজুজ-মাজুজ

ইতিহাস থেকে আজকের প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যতের হুমকি

ইয়াজুজ-মাজুজের কথা এসেছে কোরআনের সূরা কাহাফে আল্লাহর অবিচল আলোচনায় যেখানে যুলকারনাইন নামে এক দৃষ্টান্তমূলক চরিত্রের মাধ্যমে মানব ইতিহাসের এক ভীতিকর অধ্যায় সামনে আসে। যুলকারনাইন যিনি অতীতের এক মহান নেতা বা শাসক, যিনি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন এবং নানা সমস্যার মোকাবেলা করেছিলেন। তিনি এমন এক সময়ের মানুষের প্রতিনিধি, যখন দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় অপরাধ, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়াতে শুরু করেছিল।

কোরআনের বর্ণনায় যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, যুলকারনাইন সূর্যের অস্তাচল ও উদয়াচলে এক অদ্ভুত সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পায়, যাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আড়াল বা রক্ষা নেই। এদের মধ্যে বিশেষ করে ইয়াজুজ-মাজুজ নামে এক জাতি রয়েছে যারা তখন থেকেই মানবজাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুলকারনাইন তাদের দমন করতে গিয়ে এক শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণ করেন যা যুগ যুগ ধরে তাদের আক্রমণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে।

ইয়াজুজ-মাজুজ- বর্তমান কালের আতঙ্ক

তবে ইতিহাসের মোড় ঘুরেছে। বহু শতাব্দী পরেও ইয়াজুজ-মাজুজের হুমকির কথা আজও প্রাসঙ্গিক। আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকরা বলছেন, ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রাচীন সময়ের এক বাস্তব সমস্যা হিসেবেই দেখা যেতে পারে, যা আজকের আধুনিক রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতের প্রতীক।

বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় যেসব অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও উগ্রবাদ দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে অনেকে ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তির প্রাথমিক লক্ষণ মনে করেন। বিশেষ

করে যেসব জায়গায় সামরিক শক্তি ও আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে রুখে দেওয়া যাচ্ছে না সেখানে ইয়াজুজ-মাজুজের আগমনকে একটি সংকেত হিসেবে ধরা হচ্ছে।

ইসলামী আখ্যানে, ইয়াজুজ-মাজুজ কেবল এক বর্ণনা নয়, এটা শেষ দিনের আলামতগুলোর একটি। যুলকারনাইনের সেই প্রাচীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরপরই তারা পৃথিবীতে প্রবেশ করবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। ধর্মীয় বিবেচনায় এটা মানুষের পরীক্ষা এবং আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ।

রাজনৈতিক দিক থেকে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতীকী অর্থে আমরা দেখতে পাই আধুনিক বিশ্বে বড় বড় শক্তি ও দেশগুলো যেমন, ঠিক তেমনিই ইয়াজুজ-মাজুজরা যুলকারনাইনের যুগে সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে বিরাট আলোচনা না করলে পাঠককে পুরো বিষয় বোঝানো সম্ভব হবে না। সংক্ষেপে বললে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য বিশদ আলোচনা আবশ্যিক মনে করি। তবে তার আগে সূরা কাহাফের কিছু আয়াত নিয়ে বেশকিছু বিষয় বলা জরুরি।

সূরা কাহাফের ওই চারটি ঘটনায় কী আছে?

সূরা কাহাফ ও ফিতনা— চার ঘটনার চারটি বিপ্লবী শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> “শেষ সময়ে এমন দিন আসবে যখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আর সন্ধ্যায় কাফিরে পরিণত হবে।”[১]

প্রথম ঘটনা—গুহার আশ্রয়ে ঈমান রক্ষার লড়াই: *[সূরা কাহাফ, আয়াত ৯-২৬]*

> "তুমি কি ধারণা করেছো যে, গুহাবাসী ও রাকীমের কাহিনি আমার নিদর্শনগুলোর মধ্যে এক আশ্চর্য বিষয়?" [১৮:৯]

তখন পৃথিবীর এক অজানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিল মূর্তিপূজার অন্ধকার। মানুষ ভুলে গিয়েছিল তাদের স্রষ্টাকে। কাঠ আর পাথরের গায়ে সোনালি পট্টি বুনে তাদের সামনে মাথা নত করত। চারদিকে কেবল অন্ধ অনুসরণ আর ভয়– যেখানে যুক্তি ও হৃদয়ের সত্য অনাহুত এক যাত্রী।সে অন্ধ যুগে, রাজসভা আর প্রাসাদের ছায়ায় বেড়ে ওঠা ছিল সাত সম্ভ্রান্ত যুবকের। কিন্তু রক্তের আভিজাত্য নয়, তাদের মহত্ত্ব ছিল আত্মার জাগরণে।

---

১. সহীহ মুসলিম, ১১৮

"আমি তোমাকে তাদের কাহিনি সত্যভাবে বর্ণনা করব। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেছিলাম।" [১৮:১৩]

যুবকদের হৃদয়ে ছিল এক প্রশ্ন– "কী করে নিজ হাতে গড়া এক নিষ্প্রাণ বস্তু হতে পারে আমাদের মাবুদ? যে সৃষ্টি করতে পারে না, চলে না, কথা বলে না– সে কেমন খোদা?"এই প্রশ্নই তাদের শিকড় উপড়ে ফেলল সমাজের গুহা থেকে। সন্ধ্যায় তারা একত্র হয়, ফিসফিসিয়ে নিজেদের বলত– "এই কল্পনার ধর্ম নয়, আমরা খুঁজব সত্যের দীপ্তি, যেখানে রয়েছে এক অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্ব।" তাদের মনে ছিল ভয়। রাজা ছিল এক নির্দয় মূর্তিপূজক, যে বলপ্রয়োগে প্রজাদের শিরকের পথে চালিত করত।তবুও তারা দমেনি। রাতে যখন পৃথিবী নিস্তব্ধ, তারাও নিঃশব্দে ডুব দেয় আল্লাহর ইবাদতে। একদিন তাদের এক বন্ধু উদ্বেগ জানিয়ে বলল– "আমরা বিপদে আছি। রাজা আমাদের বিষয়ে জানতে পেরেছে। হয় আমাদেরকে ধর্মত্যাগ করে মূর্তিপূজা করতে হবে, নয়তো মৃত্যুবরণ।"

পরদিন রাজপ্রাসাদে যুবকদের ডেকে এনে রাজা বজ্রকণ্ঠে বললেন– "তোমরা আমার ধর্ম ছেড়েছো! এমন নতুন পথে পা রেখেছো, যার কোনো অনুমতি আমি দেইনি! ফেরত না এলে, গর্দান উড়বে তোমাদের।"

কিন্তু তাদের অন্তর ইতোমধ্যে আল্লাহর নূরে দীপ্ত।" যুবক অবস্থায় তারা বলেছিল— আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন আসমান ও জমিনের রব। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আহ্বান করব না; তা হলে আমরা অতিরিক্ত অন্যায় করব।" [১৮:১৪]

রাজা তাদের একটু সময় দিল– অন্যথায় মৃত্যু অবধারিত। সেই রাতেই তারা সিদ্ধান্ত নিল, "চলো, এমন কোনো আশ্রয়ে যাই, যেখানে অন্তর শান্তিতে এক আল্লাহর ইবাদত করতে পারি।"

"আর যখন তোমরা তাদের ও তাদের উপাস্যদের থেকে দূরে সরে গেলে, তখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো; তোমাদের রব তোমাদের জন্য তাঁর রহমত বিস্তার করবেন এবং তোমাদের বিষয়টি সঠিকভাবে সহজ করে দেবেন।" [১৮:১৬]

নিঃশব্দে তারা শহর ত্যাগ করল, পাড়ি দিল পাহাড়ঘেরা এক পথ ধরে। পথে সঙ্গী হলো এক কুকুর। নীরব প্রহরী, বিশ্বস্ত ছায়া, যে আর আলাদা হলো না তাদের থেকে। তারা পৌঁছাল এক গুহায়– আরণ্যক নীরবতায় মোড়া এক প্রশান্ত আশ্রয়। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিল, চোখ বুজল। কিন্তু সেই ঘুমে সময়ের দরজা বন্ধ হলো।

"তুমি ভাবতে যে তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদের ডান ও বাম দিকে উল্টে দিতাম, আর তাদের কুকুরটি গুহার মুখে দুই পা মেলে শায়িত ছিল।" [১৮:১৮]

তারা ঘুমিয়ে পড়ল তিনশ নয় বছর! "তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর এবং নয় বছর অতিরিক্ত।" [১৮:২৫]

সূর্য প্রতিদিন কেবল এতটুকুই করত, অস্তে বাম দিকে হেলে তাদের রক্ষা করত। "তুমি দেখতে যে সূর্য উদিত হলে তাদের গুহা থেকে ডানদিকে সরে যায় এবং অস্ত গেলে বাম দিকে হেলে যায়; তারা গুহার প্রশস্ত অংশে ছিল-আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি নিদর্শন।" [১৮:১৭]

কুকুরটি গুহার মুখে দুই পা মেলে পাহারা দিত অবিচলতায়। বাইরে বারবার ইতিহাস রচনা হয়, রাজ্য ওঠে-পড়ে, মানুষ বিলুপ্ত হয় আবার জন্ম নেয়। কিন্তু গুহায় নিস্তব্ধতা।

তিন শতাব্দীর সেই নিদ্রা শেষে একদিন তারা জেগে উঠল। কেউ বলল— আমরা একদিন ঘুমালাম বোধহয়। কেউ বলল— না, বেলা হয়নি এখনো! "তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ বলল, আমরা একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি।" [১৮:১৯]

অবশেষে তারা ক্ষুধার কাছে আত্মসমর্পণ করল। একজন শহরে যাবার দায়িত্ব নিল। সতর্কতা ছিল তার চোখে-মুখে, হৃদয়ে ভীতি।

শহরে পৌঁছে দেখল এক অন্য জগৎ। সবকিছু বদলে গেছে– ঘরবাড়ি, পোশাক, শব্দের ধরণ। তার হাতে ছিল পুরনো মুদ্রা তথা রৌপ্যের দীরহাম।"তোমরা তোমাদের একজনকে এই রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে শহরে পাঠাও এবং দেখে নিক, সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য কোথায় আছে, তা থেকে কিছু রিজিক নিয়ে আসুক এবং যেন খুব সতর্ক থাকে, কেউ যেন তোমাদের বিষয়ে অবগত না হয়।" [১৮:১৯]

কিন্তু দোকানদার মুদ্রা দেখে চমকে উঠল– "এ তো বহু যুগ আগের মুদ্রা! নিশ্চয়ই তুমি কোনো গুপ্তধন পেয়েছো!" পরিশেষে তাকে রাজদরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। সে তার ও তাদের ঘটনা রাজার সামনে ব্যক্ত করল।চারিদিকে উৎকণ্ঠা! অবশেষে একজন বলে উঠল– "ভয় পেও না! সেই রাজা বহুবছর আগে মারা গেছে। এখন এই দেশে ধর্মের স্বাধীনতা আছে। বর্তমান রাজা স্বয়ং একজন মুমিন।"

তখন যুবক জানলেন ইতিহাসের দীর্ঘ ব্যবধান। বুঝলেন তারা আর এই সমাজের কেউ নন। তিনি বললেন– "আমার সাথীদের খবর তোমাদের দিতে হবে না।

আমাকে শুধু গুহায় ফিরতে দাও। তারা আমার জন্য চিন্তিত। আমি তাদের সান্ত্বনা দিতে চাই।”

যুবক ফিরলেন। রাজা নিজেও পিছু নিলেন। গুহায় এসে তাদের সবাইকে জীবিত দেখে আলিঙ্গন করলেন, রাজপ্রাসাদের আমন্ত্রণ জানালেন।

কিন্তু তারা বললেন–আমরা আর ফিরে যেতে পারি না। "তারা যদি তোমাদের ওপর ক্ষমতা লাভ করে, তবে তারা তোমাদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে অথবা নিজেদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। আর তাহলে তোমরা কখনো সফল হবে না।" [১৮:২০]

অতঃপর তারা গুহায় মাথা রাখলেন। ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ হলো, চিরশান্ত ঘুম নেমে এলো দেহে, যেন আল্লাহর স্নিগ্ধ সোহবতে ফিরে গেল তাদের আত্মা। "এভাবেই আমি তাদেরকে জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জানে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামত নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।" [১৮:২১]

“যখন তারা যুবক ছিল, তখন তারা বলেছিল: আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন আসমান ও জমিনের রব। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ডাকব না।” [১৮:১৪]

আধুনিক চোখে দেখলে, তাদের সিদ্ধান্ত ছিল অপ্রচলিত, বেপরোয়া– একটা ‘হার্ড রিসেট’। সময়ের সাথে আপস না করে সময়কে অস্বীকার করে তারা গিয়েছিল এমন এক জায়গায় যেখানে সমাজ নেই, রাষ্ট্র নেই, কিন্তু ঈমান আছে।এই ঘটনা আমাদের বলে, “যদি ঈমান না থাকে তবে সবকিছুই বৃথা।”

এই যুবকেরা একা ছিল না– তারা ছিল দলবদ্ধ, একে অন্যের ঈমানের প্রহরী। তারা শুধু আত্মগোপন করেনি, তারা করেছে সম্মিলিত আত্মদানের দোয়া– “হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের বিষয়টি সঠিকভাবে সমাধান করে দিন।” [১৮: ১০]

আজ, আমরা যারা ঈমান রক্ষায় সংগ্রাম করছি– পশ্চিমা সংস্কৃতি, বস্তুবাদী সমাজ, মিডিয়ার অপসংস্কৃতি, দাজ্জালের প্রতীকী আগ্রাসন– তাদের ন্যায় সাহস আমাদের কতটুকু আছে?

এই ঘটনাটি শুধু আত্মগোপনের কথা বলে না, এটা সময়ের আপেক্ষিকতা এবং অন্তর্মাত্রিক বাস্তবতার কথাও বলে দেয়। তারা গুহায় ঘুমিয়ে পড়ল কয়েক শতাব্দীর জন্য। গুহায় ঘুমিয়ে গেল তারা। সময় চলল, শাসন, শোষণ ও সমাজ পালটে গেল, শাসক ও শতাব্দী বদলে গেল, রাষ্ট্র ভেঙে পড়ল। কিন্তু তাদের ঈমান অটুট রইল।

"বলুন, আল্লাহই সর্বাধিক জানেন তারা কতকাল অবস্থান করেছিল। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।তিনিই সর্বাধিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, সর্বাধিক শ্রবণশক্তিসম্পন্ন।তাঁর ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই, এবং তিনি তাঁর শাসনে কাউকেও শরিক করেন না।" [১৮:২৬]

"আল্লাহই সর্বাধিক জানেন তারা কতকাল অবস্থান করেছিল"- স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে তাদের সময়-অবস্থান মানবীয় গণনায় নির্ণেয় নয়। এখানে "লাবিসূ" (لَبِثُوا) শব্দটি অর্থ "অবস্থান করা বা সময় কাটানো" কিন্তু কোরআন বলছে, তাদের অবস্থান ছিল এমন এক মাত্রায় যেখানে সময়ের প্রবাহ আমাদের মতো নয়। এটা সময়ের আপেক্ষিকতার (Time Dilation) কোরআনিক রূপ।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে"- এটা সেই "মাল্টিডাইমেনশনাল রিয়েলিটি"-র কথা বলে, যেখানে মানবচক্ষু যা দেখে না, আল্লাহ তা জানেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায়,এটা 'Parallel Space-Time Continuum'-এর এক আধ্যাত্মিক ঘোষণা। "তিনি সর্বাধিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, সর্বাধিক শ্রবণশক্তিসম্পন্ন"- অর্থাৎ সময়, স্থান, আলো, শব্দ- সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের পরিসরে একসাথে উপস্থিত। মানুষের জন্য "অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ" আলাদা, কিন্তু আল্লাহর জন্য সবই একই মুহূর্ত।"তিনি তাঁর শাসনে কাউকেও শরিক করেন না এখানে বলা যায়- সময়, পদার্থ, শক্তি, নিয়তি সবই তাঁর একক আদেশে নিয়ন্ত্রিত। কোনো প্রযুক্তি, দাজ্জালীয় ক্ষমতা, এমনকি কোয়ান্টাম শক্তিও তাঁর অনুমতি ছাড়া কার্যকর নয়।

সৃষ্ট সময়ের 'দ্রুততা বা ধীরতা' নির্ভর করে সৃষ্ট অবস্থানের উপর।যেমন: পৃথিবীতে এক দিন = আল্লাহর কাছে এক হাজার বছর।[১] ফেরেশতারা আরশে আরোহন করে এক দিনে, যা তোমাদের হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বছর।[২]

এই পর্যায়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মানুষের পক্ষে কীভাবে সম্ভব ৩০০ সৌর বছর + ৯ চন্দ্র বছর (মোট প্রায় ৩০৯ বছর) ঘুমিয়ে থাকা? তাহলে সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

---

১. সূরা হাজ্জ,আয়াত ৪৭
২. সূরা মাআরিজ,আয়াত ৪

> "তখন আমি গুহায় তাদের কানের উপর বহু বছরের জন্য নিদ্রার পর্দা ফেলে দিয়েছিলাম।"[১]

কিন্তু প্রশ্ন আসে, 'আল্লাহ' সরাসরি বললেই তো পারতেন– "আমি তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।" তাহলে কেন বিশেষভাবে বলা হলো "তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিলাম"? কোরআন কোনো কল্পকাহিনির অতিরঞ্জিত গল্পের গ্রন্থ নয়, কোরআনের কোনোকিছু নিয়ে যেন অবিশ্বাসরা কটাক্ষ করতে না পারে, তারজন্য 'রাব্বে কারীম' এমনভাবে বলেছেন।

এই বাক্যের মধ্যে এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে আছে, যা আজকের স্নায়ুবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

২০১৮ সালে Current Biology-তে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, "নীরবতা গভীর ঘুমকে দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করে।"

আল্লাহ্ তাদের কান বন্ধ করে দেন, যাতে বাইরের কোনো শব্দ তাদের জাগিয়ে তুলতে না পারে। ২০১৬ সালে Science News-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, ডলফিন, পাখি ও কিছু প্রাণীর মস্তিষ্ক ঘুমের সময় একপাশ জাগ্রত থাকে, অপর পাশ গভীর ঘুমে থাকে। গুহাবাসীদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটেছিল বলে অনেক তাফসিরবিদ ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাদের দেহ অচল থাকলেও মস্তিষ্কের কিছু অংশ কার্যকর ছিল, যা শরীরের ক্ষয় রোধে সহায়তা করেছে।

ঘুমের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং Reticular Activating System

মানবদেহে ঘুম ও জাগ্রত অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের একটি জটিল নার্ভ নেটওয়ার্ক, যার নাম Reticular Activating System (RAS)। এটা মস্তিষ্কের ব্রেইনস্টেমে অবস্থিত এবং মানুষের সজাগ থাকা, ঘুমানো ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে।

১. RAS কীভাবে কাজ করে?

আমাদের আশেপাশের শব্দ, আলো, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দীপনা (stimuli) RAS-কে সক্রিয় করে। একবার RAS সক্রিয় হলে এটা ইলেকট্রিক্যাল ওয়েভ পাঠিয়ে মস্তিষ্কের কর্টেক্সকে জাগিয়ে তোলে। ফলে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি এবং সচেতন হই।

---

১. সূরা কাহফ, আয়াত ১১

২. ঘুম ভাঙার জন্য শব্দ ও আলোর গুরুত্ব

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্দীপক হলো শব্দ। Harvard Medical School-এর গবেষণা অনুযায়ী, ঘুমন্ত অবস্থায় শব্দ শ্রবণ স্নায়ুর মাধ্যমে RAS-কে উত্তেজিত করে এবং এটা সরাসরি মস্তিষ্কের সক্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়। আলোও একইভাবে চোখের অপটিক নার্ভের মাধ্যমে RAS-কে উদ্দীপিত করে, যার ফলে ঘুম ভেঙে যায়।

গুহাবাসীদের ঘটনাটি আমরা দুই দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি

১. গুহার অন্ধকার ও আলো নিয়ন্ত্রণ

সূরা কাহফে বলা হয়েছে, সূর্যের আলো সরাসরি তাদের গুহায় প্রবেশ করত না বরং পাশ কাটিয়ে যেত। অতএব আলো RAS-কে সক্রিয় করতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ

"তুমি দেখবে, সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডান দিকে সরে যায় আর অস্ত গেলে বাম দিক দিয়ে এড়িয়ে যায়, তারা গুহার প্রশস্ত অংশে ছিল।"[১]

সূর্যালোক সরাসরি গুহায় প্রবেশ করেনি বরং সঠিক কোণ থেকে এসে গুহার ভেতর বাতাস পরিশোধন করেছে। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত, অতিবেগুনি রশ্মি (UV Rays) ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। এতে গুহার ভেতরের বাতাস স্বাস্থ্যকর থাকে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ হয়।

সূর্যালোক দেহে ভিটামিন ডি উৎপাদন সক্রিয় করে, যা হাড় ও ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী রাখে। এছাড়া নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে দীর্ঘ ঘুমের সময়ও গুহাবাসীদের শরীর সুস্থ ছিল।

২. কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেওয়া

এটা এই ঘটনার সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক। যদি যুবকরা বাইরের শব্দ শুনতে পেত তাদের RAS সক্রিয় হয়ে যেত এবং তারা জেগে উঠত। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন–

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ১৭

“আমরা তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিলাম”, অর্থাৎ তাদের শ্রবণ স্নায়ু সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন।

শ্রবণ স্নায়ু (Auditory Nerve) সরাসরি RAS-এর সঙ্গে যুক্ত। কানের উপর ‘নিদ্রার পর্দা’ ফেলে দেওয়ার অর্থ হলো শব্দ-উদ্দীপনাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা ফলে RAS নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চলে যায়। এর ফলে শতশত বছর ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আরেকটি প্রমাণ এখানে স্পষ্ট হয়। যখন RAS মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় মানুষ কোমায় চলে যায়। কোমায় থাকা অবস্থায়– পারিপার্শ্বিক শব্দ বা আলো কোনোটাই মানুষকে জাগাতে পারে না। শরীরের সিস্টেমগুলো স্বাভাবিক থাকে কিন্তু ব্যক্তি অচেতন অবস্থায় থাকে।

গুহাবাসীদের ক্ষেত্রেও একধরনের দীর্ঘস্থায়ী অচেতন নিদ্রা হয়েছিল। কিন্তু এটা কোমার মতো ক্ষতিকর ছিল না, কারণ আল্লাহ্ তাঁদের শরীরকে সংরক্ষণের জন্য শরীর ঘোরানো, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও বিপাকীয় প্রক্রিয়া ধীর করে রাখা– সবকিছু একসাথে করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কারের পর স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, কোরআনের এই আয়াতটি শব্দ-উদ্দীপনার গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। RAS সক্রিয় হওয়ার জন্য শব্দ, আলো, স্পর্শ– এ তিনটির যে-কোনো একটি প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাঁদের কানের শ্রবণ-প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন, সূর্যের আলো গুহায় প্রবেশ করতে দেয়নি এবং বাইরের স্পর্শজনিত কোনো প্রভাবও তাঁদের ঘুম ভাঙাতে পারেনি। অতএব তাঁরা শতশত বছর জাগ্রত উদ্দীপনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন—

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ

“তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে; তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।”[১]

দীর্ঘ সময় একই ভঙ্গিতে শোয়া হলে বেডসোর হয়, যা পেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দীর্ঘমেয়াদী কোমা রোগীদের প্রতি কয়েক ঘণ্টা পরপর

---

১. সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ১৮

উলটে দেন। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ নিজেই তাদের দেহ ঘুরিয়ে দিতেন, যা বেডসোর প্রতিরোধ করেছে। শরীর ঘোরানোর ফলে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয়নি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে যাওয়া বা পচে যাওয়ার ঝুঁকি দূর হয়েছে।

হাইবারনেশনের মতোই অ্যাসটিভেশন প্রক্রিয়ায় অনেক প্রাণী তীব্র গরমে নিদ্রিত হয়। এই অবস্থায় দেহের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। গুহার ভেতর একটি আদর্শ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছিল যা আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পরিচালিত হতো।

চোখ খোলা থাকা ও কর্নিয়া সুরক্ষা: আয়াতে বলা হয়েছে, "তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত।" বিজ্ঞানীরা বলেন, এর কারণ হতে পারে– চোখের পাতা আংশিক খোলা ছিল। চোখের অভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চালন সচল রাখা হয়েছিল। এতে কর্নিয়া শুকিয়ে যায়নি এবং চোখ অন্ধ হয়নি। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক থেরাপি।

খাবার ছাড়া দীর্ঘ বেঁচে থাকা: বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যদি বিপাকক্রিয়া ৯৫% পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া যায়, মানবদেহের এনার্জি চাহিদা অত্যন্ত সীমিত হয়ে যায়। অক্সিজেন, খাবার ও পানির প্রয়োজন প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসে। NASA এবং টোকিও ইউনিভার্সিটি প্রমাণ করেছে, মানুষের দেহকে ৪-৬ মাসের জন্য নিদ্রিত রাখা সম্ভব। আসহাবে কাহফের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে এই প্রক্রিয়া শতাব্দীব্যাপী ঘটেছে। তাই বলা যায়– কোমা, এনআরইএম ঘুম, হাইবারনেশন, অ্যাসটিভেশন, ক্রানিয়াল নার্ভ নিয়ন্ত্রণ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং বিপাকক্রিয়া হ্রাসের মাধ্যমে সম্ভব।

সূরা কাহফের এই একটিমাত্র আয়াত– "আমি তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিয়েছিলাম।"– আজকের স্নায়ুবিজ্ঞান, বায়োলজি এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বিস্ময়কর এক সত্য প্রকাশ পায়।

ঘুম থেকে জাগার জন্য Reticular Activating System অপরিহার্য। এই সিস্টেম সক্রিয় হয় মূলত শব্দ, আলো ও স্পর্শ দ্বারা। আল্লাহ যুবকদের কানের শ্রবণ-সিস্টেম বন্ধ করে দেন, সূর্যের আলো গুহায় প্রবেশ করতে দেননি, আর শরীরের বিপাকীয় কার্যক্রম ধীর করে দিয়েছিলেন।

ফলে তারা শতশত বছর জীবিত থেকেও নিদ্রিত থাকতে পেরেছিল। এটা শুধু বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা নয়; এটা প্রমাণ করে, কোরআন মানুষের রচনা নয়,

কোরআন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক অব্যর্থ ও জ্ঞানের সমুদ্র। আশা রাখি, এতক্ষণে আপনার মনে উদিত হওয়া প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। রূপকথার তত্ত্বে নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বে এটা সম্ভব।

দ্বিতীয় ঘটনা—ধনীর আত্মঘাতী অহংকার ও গরিবের ঈমানের সৌন্দর্য

[সূরা কাহাফ: আয়াত ৩২-৪৪]

আল্লাহ আমাদের সামনে এক ধনী আর এক গরিবের কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের অন্তরের অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন সত্যিকারের সফলতা কোনটা আর আমাদের অন্তরটা কার মতো হওয়া উচিত।

দুই ব্যক্তির গল্প। একজন ধনী, আরেকজন দরিদ্র।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-
"তুমি তাদের জন্য উদাহরণ হিসেবে দুই ব্যক্তির কাহিনি বর্ণনা কর। তাদের একজনকে আমি দুইটি আঙ্গুরের বাগান দান করেছিলাম, আর সেই দুই বাগানকে খেজুর ও শস্যক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম।"[১]

একজন ধনী মানুষ- যার জীবনে ছিল বিলাসিতা, আভিজাত্য আর অহংকারের মিশেল। তার দুই বাগান ছিল যেন জান্নাতেরই প্রতিচ্ছবি- আঙ্গুরে ভরা, খেজুরে ঘেরা, ফোয়ারার কলতানে পূর্ণ। সে গর্বে বলত- "দেখো আমার জমি! আমার শ্রম! আমার ক্ষমতা!"

আমি ওই দুই বাগানের মধ্যস্থলে একটি নদী প্রবাহিত করেছিলাম।" [১৮:৩৩] সবকিছুই ছিল নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু এখানেই শুরু হয় বিভ্রম- কারণ নিয়ন্ত্রণের ভ্রম আসলে নিয়ন্ত্রিত হওয়ারই শুরু। অর্থাৎ যখন নিজের মধ্যে অহংকার জন্ম নেয় তখন নফসে আম্মারাহ্ এবং শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পথ তৈরি হয়। তার ফলসমূহ ফলপ্রসূ হলো, কিন্তু সে তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় অহংকারে বলল, "আমি তোমার চেয়ে অধিক ধনবান এবং প্রভাবশালী।" [১৮:৩৪]

এই উচ্চারণ শুধু শব্দ নয়- এ ছিল শিরকের ঘোষণা, যেখানে মানুষ নিজেকে নিজের রব মনে নেয়। তার অন্তরে প্রবেশ করেছিল 'আমি' নামের দেবতা। আমিত্বের অহংকারে যুগযুগ ধরে অনেক ক্ষমতাসীনদের পতন হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পতিত শেখ হাসিনা এর একটা উদাহরণ। আমিত্ব বলে কিছু নেই। আমিত্বের অহংকার একমাত্র আমার 'রাব্বে কারীম'-কে মানায়, আর কাউকে নয়।

---

১. সূরা কাহাফ,আয়াত ৩২

সে ভুলে গেল- ধন নয়, রহমতই আসল সম্পদ।"সে তার নিজের প্রতি অন্যায় করল, বাগানে প্রবেশ করে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এ কখনো ধ্বংস হবে।" [১৮:৩৫]

এটাই আধুনিক মানুষের মানসিকতা। আমার অট্টালিকা, আমার ব্যবসা, আমার ঘর, আমার সাম্রাজ্য, আমার সম্পদ- সব যেন চিরস্থায়ী! এই মানসিকতা আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়, আর ভুলিয়ে দেয় মৃত্যুর বাস্তবতাকেও।

"আমি মনে করি না কেয়ামত কখনো ঘটবে। আর যদি আমি আমার রবের কাছে ফিরে যাইও, তবে অবশ্যই এর চেয়ে উত্তম কিছু পাবো।" [১৮:৩৬] এটা এক ধরনের অহংকারমিশ্রিত আত্ম-প্রতারণা। যেখানে মানুষ জান্নাতের দাবী করে, কিন্তু জান্নাতের মালিককে ভুলে যায়।এই আত্মপ্রতারণার নামই গোপন শিরক, যেখানে ঈমানের দাবীর মুখে সৃষ্টিকে প্রভু বানিয়ে ফেলা হয়।

তার দারিদ্র্য ঈমানদার বন্ধু বলল- "তুমি কি তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর নুতফা থেকে, এরপর মানুষ বানিয়েছেন?" [১৮:৩৭] তার কণ্ঠে ছিল না হিংসা, ছিল করুণা। সে স্মরণ করিয়ে দিল- তুমি ধনবান, কারণ আল্লাহ্ চেয়েছেন। তুমি মরবে, কারণ তিনিই তা নির্ধারণ করেছেন।তুমি পুনরুত্থিত হবে, কারণ তিনিই আদেশ দেবেন।

"কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, তিনিই আমার রব। আমি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।" [১৮:৩৮] এই এক বাক্যেই আল্লাহর নিকট ধনী-গরিবের ফারাক মুছে যায়। ধন এক পরীক্ষার নাম, ঈমান এক মুক্তির আলো।

"তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, কেন বললে না-। 'মাশাআল্লাহ, লা কুওওতা ইল্লা বিল্লাহ।'। যদি তুমি আমাকে ধন ও সন্তান কম মনে করো, তবে আশা করি আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন।" [১৮:৩৯-৪০] এ কথাটি এক জাগ্রত আত্মার উপদেশ। যেখানে ঈমান ধনকে ছাড়িয়ে যায়। যেখানে 'মাশাআল্লাহ' উচ্চারণ মানে আত্মসমর্পণ, আর "লা কুওওতা ইল্লা বিল্লাহ" মানে- ক্ষমতার উৎস শুধু রাব্বে কারীম।

আল্লাহ্ বলেন- "তার ফল ধ্বংস করে দেওয়া হলো। সে ব্যয় করেছিল যা কিছু তার উপর এবং সে তার বাগানের ভগ্নাবশেষ দেখে হাত মলতে লাগল, বলল- 'হায়! আমি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করেছিলাম।" [১৮:৪২] এই আফসোসই হলো দেরিতে আসা ঈমান। যে ঈমান ধ্বংসের পর আসে, সে ঈমান মুক্তি দেয় না, সাক্ষী হয় আত্মবিধ্বংসের।

"তখন তার কোনো দল ছিল না, যারা আল্লাহর পরিবর্তে তাকে সাহায্য করতে পারত, এবং সে নিজেও কোনো সাহায্যকারী হতে পারল না।" [১৮:৪৩]

"এই অবস্থায় প্রমাণিত হলো- সত্যিকার অভিভাবকত্ব কেবল আল্লাহরই। তিনি সর্বোত্তম প্রতিদানদাতা এবং চূড়ান্ত পরিণতির জন্য সর্বোত্তম।" [১৮:৪৪] যে ঈমান রাখে, সে বেঁচে থাকে; যে সম্পদে ভরসা করে, সে হারায়। এই গল্প শুধু অতীতের নয়। এটাই আধুনিক সমাজের প্রতিচ্ছবি- যেখানে 'সাফল্য' মানে ব্র্যান্ড, 'আত্মবিশ্বাস' মানে আত্মম্ভরিতা, আর 'আধ্যাত্মিকতা' মানে বিলাসী প্রেরণা।

দাজ্জালের পরিকল্পনাও এখানেই। সে জানে, মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা লোভ। যে লোভএকসময় মানুষকে ঈমান থেকে সরিয়ে দেয়। যে লোভে মানুষ প্রভুর জায়গায় পণ্যকে বসায়। এবং যে লোভ শেষ পর্যন্ত মানুষকে দাসে পরিণত করে এক অদৃশ্য সাম্রাজ্যের।

ধনী ব্যক্তি তার বাগানে ধ্বংস দেখেছিল, আমরা আজ সেই ধ্বংসের শহরে বাস করছি। তার বাগান নষ্ট হয়েছিল বজ্রপাতে, আমাদের সমাজ নষ্ট হচ্ছে আত্মিক দেউলিয়ায়।যে সময় আসছে- যখন প্রযুক্তি, দাজ্জালের প্রচারযন্ত্র ও ভোগবাদ মানুষকে বলবে- "তুমি-ই তোমার রব।" ঠিক তখনই সূরা কাহাফের এই আয়াতগুলো হবে ঈমানদারদের জন্য আলোকরেখা।

"আমি কি আমার রবের সঙ্গে শরীক করেছিলাম?"- এই প্রশ্ন একদিন সবাই করবে। কিন্তু যারা আজই উত্তর খুঁজে নেয়, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন কোনো আফসোস থাকবে না।

তৃতীয় ঘটনা—বাহ্যিক জ্ঞানের ফাঁদে ফেলে অন্তর্জ্ঞান ভুলে যাওয়ার ট্র্যাজেডি

[সূরা কাহাফ, আয়াত ৬০-৮২]

কোরআনুল কারিমের ১৬ পারার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা হজরত মূসা (আ.) ও হজরত খিজির (আ.)-এর এক চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যা সূরা কাহাফের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনা এক বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়ে, যিনি মূসা (আ.)-এর চেয়েও বেশি জ্ঞানী ছিলেন।

হাদিসে এসেছে, একদিন মূসা (আ.) বনী ইসরায়েলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন- মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী কে? মূসা (আ.) বললেন, আমিই সবার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। এই উত্তরের কারণ ছিল- মূসা

(আ.)-এর জানামতে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকেই বেশি জ্ঞান দিয়েছেন। কারণ; তিনি পয়গম্বর। কিন্তু মহান আল্লাহ মূসা (আ.)-এর এই উত্তর পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ মূসা (আ.)-এর এ কথা বলা উচিত ছিল যে, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মূসা (আ.)-এর কাছে ওহি নাজিল হলো যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। এ কথা শুনে মূসা (আ.) তাঁর (খিজির আ.) কাছ থেকে জ্ঞান লাভের প্রার্থনা জানালেন। বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তাআলা বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। "তবে যাও। খোঁজো তাঁকে– যাকে দিয়েছি আমাদের পক্ষ থেকে জ্ঞান... 'ইলমে লাদুন্নি'..."

মূসা (আ.) নির্দেশমতো থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিলেন। পথিমধ্যে প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে যাওয়ার সময় আরো একটি মোজেজা প্রকাশ পেল যে,) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তায়ালা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখছিলেন।

মূসা (আ.) যখন ঘুম থেকে জাগলেন, তখন ইউশা ইবনে নুন আশ্চর্যজনক ঘটনাটি তাঁকে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা সামনে রওনা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলা মূসা (আ.) খাদেমকে বললেন, আমাদের খাবার আনো; যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাবার চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ে গেল। তিনি ভুলে যাওয়ার ওজর পেশ করে বললেন, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

অতঃপর বললেন, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মূসা (আ.) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।) সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন।

প্রস্তরখণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আগাগোড়া চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। সহীহ বুখারীতে এ ব্যক্তির নাম 'খাদর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো 'সবুজ-শ্যামল'। অর্থাৎ তিনি যেখানে বসতেন, সে স্থানই সবুজ শ্যামল হয়ে যেত। মূসা (আ.) তাঁকে সালাম করেন। খিজির (আ.) বললেন, এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? মূসা (আ.) বললেন, আমি মূসা। খিজির (আ.) প্রশ্ন করলেন, বনী-ইসরায়েলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমিই বনী-ইসরায়েলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ওই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

অবশেষে তাঁরা (মূসা ও তার সঙ্গী) আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের সাক্ষাৎ পেল (তার নাম খিজির), যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে (বিশেষ) অনুগ্রহ করেছি। আর তাকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি।[১]

আল-আব্দ আস-সালেহ– খিজির (আ.) যার চেহারায় আলো নয়, একরাশ ধোঁয়া! চোখে যেন সময়ের সব রহস্য গুটিয়ে রাখা।

“আপনি আমার সহচর হতে পারবেন না, হে মূসা...” “আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না সেই জিনিস নিয়ে, যা আপনার জানার আওতার বাইরে...”

কিন্তু মূসা (আ.) বলেন– "আল্লাহর ইচ্ছায় আমি ধৈর্য ধরব।”

খিজির (আ.) বললেন– যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি নিজে তার প্রকৃত অর্থ বলে না দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা খিজিরকে চিনে ফেলল এবং পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিজির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, নৌকা ফুটো করে দেয় খিজির (আ.)। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের এই নৌকায় আছে, যা দিয়ে সাগরে মাছ শিকার করেন। এই নৌকায় তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল। সেই নৌকা এভাবে খুঁত কেন করা হলো? তাই মনে মনে চিন্তা করে যাচ্ছে মূসা (আ.)।

এতে মুসা (আ.) (স্থির থাকতে না পেরে) বললেন, তারা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কী এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা

---

১. সূরা কাহাফ,আয়াত ৬৫

ভেঙে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? তাদের জীবিকার বাহনের ক্ষতি করে তাদের এতবড় ক্ষতি কেন করলেন? আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিজির (আ.) বললেন– আমি আগেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন, আমি ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম; আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মূসা (আ.)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল।

অতঃপর তাঁরা উভয়ে চলতে লাগল। পরে যখন তাঁরা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে (খিজির আ.) তা বিদীর্ণ করে দিল। সে (মূসা আ.) বলল, আপনি কী আরোহীদের (সাগরে) নিমজ্জিত করার জন্য তা ছিদ্র করে দিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন।[১]

সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী, ইতোমধ্যে একটি কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে এবং সাগর থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। সেদিকে ইঙ্গিত করে খিজির (আ.) মূসা (আ.)-এর উদ্দেশে বলেন, "আমার-আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহর জ্ঞানের মোকাবিলায় সাগরের বুক থেকে পাখির চঞ্চুতে ওঠানো এক ফোঁটা পানির সমতুল্য।'[২]

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিজির এক বালককে অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিজির (আ.) তাকে ডেকে এনে নিজ হাতে বালকটির মাথা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন! বালকটি মারা গেল। মূসা (আ.) ক্ষিপ্ত ও রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আপনি একটি নিষ্পাপ শিশুকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গুনাহের কাজ করলেন। খিজির (আ.) বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি আগের ঘটনার চাইতেও গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওজর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা একটা গ্রাম পেয়ে সেই গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। গ্রামবাসীরা খাবার দিতে অস্বীকার করল, তাঁদের তিরস্কার করল। খিজির (আ.) এই গ্রামের একটি

১. সূরা কাহাফ,আয়াত ৭১
২. সহীহ বুখারী ৪৭২৭

প্রাচীরকে দেখলেন পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায়। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। অর্থাৎ ভাঙা দেওয়াল মেরামত করে দিলেন। মূসা (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন, "আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল। অথচ আপনি তাদের এতবড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিজির (আ.) বললেন, هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। "আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারলেন না। কৌতূহলী প্রশ্ন করলেন, আপনার অস্থিরতা বেশি। আমাদের সফর এখানেই শেষ। আমাদের বিচ্ছেদ..."

এরপর খিজির (আ.) তিনটি ঘটনার প্রকৃত কারণ মূসা (আ.)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন, ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا অর্থাৎ এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো আপনি দেখে ধৈর্য ধরতে পারেননি। পবিত্র কোরআনে এ প্রসঙ্গে এসেছে, "সে (খিজির আ.) বলল, এখানেই আমার এবং আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি অচিরেই আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।'[১]

রাসূলুল্লাহ (স.) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মূসা (আ.) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরও কিছু জানা যেত।[২]

পবিত্র কোরআনে খিজির (আ.)-এর তিনটি কাজের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

নৌকা ছিদ্র করে দেওয়ার কারণ; নৌকাটির ব্যাপারে, সেটা ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটাকে ত্রুটিযুক্ত (নষ্ট) করে দেই। কেননা তাদের অপরদিকে ছিল এক অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী রাজা। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিত।'[৩]

ছোট বাচ্চাকে মেরে ফেলার কারণ; কিশোরটির পিতা-মাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমরা আশঙ্কা করলাম যে, সে সীমালঙ্ঘন ও কুফরির মাধ্যমে তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাই আমরা চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় উত্তম ও দয়া-মায়ায় ঘনিষ্ঠতর।[৪]

---

১. **সূরা কাহাফ**: ৭৮

২. **বুখারী**: ১২২, **মুসলিম**: ২৩৮০

৩. **সূরা কাহাফ**, আয়াত ৭৯

৪. **সূরা কাহাফ**, আয়াত ৮০-৮১

প্রাচীর সোজা করে দেওয়ার কারণ; প্রাচীরটি ছিল নগরের দুজন এতিম বালকের। এর নিচে ছিল তাদের (বাবার রেখে যাওয়া) গুপ্তধন এবং তাদের পিতা-মাতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং, আপনার পালনকর্তা দয়াপরবশ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হলো তার ব্যাখ্যা।"[১]

এই ঘটনা বুঝিয়ে দেয়, শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে পৃথিবী বিচার করা আত্মপ্রবঞ্চনা। আজকের 'সায়েন্স', 'রিজনিং', 'লজিক'-এ মজে থাকা মানুষ দাজ্জালের জন্য সবচেয়ে সহজ টার্গেট। কারণ; তারা এক চোখে দেখে– চর্মচক্ষুর বাহ্যিকতা দিয়ে।

তিনি মূসা (আ.)-কে দেখান– পার্থিব দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে মহান পরিকল্পনার অংশ। এখানে বাহ্যিক শরীয়ত ও অভ্যন্তরীণ হিকমাহর এক রহস্য উদ্ঘাটিত হলো।

মূসা (আ.) ফিরে আসেন। কাঁধে কওমের বোঝা নয়, এবার তার ভিতরে নতুন এক বোঝাপড়া। পথভ্রষ্ট সামরির ফিতনা ছিল গায়েবী জ্ঞানের অপব্যবহার। খিজির (আ.) দেখালেন স্রষ্টার পরিকল্পনার বাস্তব উদাহরণ। আসুন এ বিষয়ে আরও কিছু জানা যাক।

দুই সমুদ্রের মাঝখানে– চেতনাগত না বাস্তব জ্ঞানসন্ধান

সূরা কাহফ-এর ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

> "যখন মূসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমি চলতে থাকব, যতক্ষণ না আমি দুই সাগরের মিলনস্থলে পৌঁছাই অথবা বহুকাল চলতে থাকি।"[২]

এখানে দেখা যায়, মূসা (আ.) নিজে থেকে এই সফরের প্রস্তাব দিয়েছেন। হাদীসে আছে, একবার মূসা (আ.)-কে কেউ প্রশ্ন করে, "এই পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে?" তিনি বলেন, "আমি।"[৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁকে সংশোধন করে জানান যে এমন একজন আছেন, যাকে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন (ইলমে লাদুন্নি)। সেখান থেকেই শুরু হয় এই সফর।

---

১. সূরা কাহাফ,আয়াত ৮২
২. সূরা কাহফ,আয়াত ৬০
৩. সহীহ বুখারী ১২২

নবী হওয়া মানেই সর্বোচ্চ জ্ঞান থাকা নয়। নবুয়্যতের জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত হয়, তবে আল্লাহর গায়েবী জ্ঞান অনেক গভীর ও রহস্যময়।

দুই সাগরের মিলনস্থল– বাস্তব না رمزی অর্থ?

মূসা (আ.)-এর যাত্রার স্থান ছিল "মাজমা-উল বাহরাইন" বা দুই সাগরের মিলনস্থল। কোরআনে বলা হয়:

"অবশেষে তারা যখন দুই সাগরের মিলনস্থলে পৌঁছাল, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল। মাছটি সাগরে এক সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে চলে গেল।" [১৮:৬১]

তাফসিরে কুরতুবি, তাবারি ও ইবনু কাসীর বলেন– এটা বাস্তব স্থান ছিল, সম্ভাব্যভাবে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মিলনস্থল, অথবা পারস্য উপসাগরের কাছে কোনো জায়গা।

তবে, অনেক আধ্যাত্মিক তাত্ত্বিক, যেমন: ইবনে আরাবী, আল-গাজ্জালী এটাকে رمزی অর্থে ব্যাখ্যা করেন– "দুই সাগর" বলতে বোঝানো হয়েছে শরীয়তের বাহ্যিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক গায়েবী জ্ঞান-এর মিলন। এখানে সফর বাস্তব হলেও নির্দেশনার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক-আধ্যাত্মিক উন্নতি।

মাছ জীবন্ত হয়ে সাগরে চলে যাওয়া– রূপক না বাস্তব?

আয়াতে বলা হয়:

"সে (মাছটি) সাগরে এক সুড়ঙ্গের মতো পথ করে চলে গেল।" [১৮:৬১]

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো, মুসা (আ.) আল্লাহ্‌র এক বান্দার সাথে সাক্ষাতের জন্য যাচ্ছিলেন, যিনি ইলমে লাদুন্নী (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান) প্রাপ্ত ছিলেন। তারা পথিমধ্যে একটি পাথরের উপর বিশ্রাম নেওয়ার সময় তাদের সাথে আনা মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে। মূসা (আ.) ও তার সঙ্গী বিষয়টি খেয়াল করেননি এবং তারা সামনে চলতে থাকেন।

তাফসিরে বলা হয়, এটা ছিল একটি শুকনো মাছ, যা আবার তাজা হয়ে গেল। এর মাধ্যমে খিজিরের অবস্থান চিহ্নিত হলো।

ইমাম রাযী বলেন– এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি خارق عادت ঘটনা (মোজেযা), যা এই সফরের সত্যতা ও রহস্যময়তা আরও গাঢ় করে।

তবে, অনেক আলেম একে রূপকও মনে করেন– মানুষের মৃতপ্রায় চিন্তাকে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সংস্পর্শে এনে জীবিত করে তোলা।

খিজির (আ.) সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়:

"তারা আমার বান্দাদের একজন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে দয়া দিয়েছি এবং নিজ পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করেছি।" [১৮:৬৫]

তাফসিরকারগণ বলেন, তিনি কোনো নবী নন, তবে এক বিশেষ রূহানী চরিত্র, যিনি নবুয়্যতের বাইরের এক গায়েবী জ্ঞান (ইলমে লাদুন্নি) লাভ করেছিলেন।

ইমাম নববী, ইবনে হাজার, কুরতুবি প্রমুখ খিজির (আ.)-এর অস্তিত্বকে বাস্তব এবং এই ঘটনার বাস্তবতাকেও নির্ভরযোগ্য বলে মত দিয়েছেন। অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারী আবার মনে করেন– খিজির এক رمزی সত্তা, যিনি প্রতীক– আলগা পথে চলা আত্মার পথপ্রদর্শক।

তিনটি ঘটনার বিশ্লেষণ: বাহ্যিক অন্যায়, অভ্যন্তরীণ হিকমাহ

ক. নৌকা ফুটো করে দেওয়া:

"আমি তা ফুটো করে দিলাম, কারণ তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে প্রতিটি সুশোভিত নৌকা জোরপূর্বক দখল করত।" [১৮:৭৯]

এই ঘটনা প্রমাণ করে, বাহ্যিক ক্ষতি কখনও গোপন কল্যাণের বাহক হতে পারে। এটা হচ্ছে 'তাকদীরের বিপরীতমুখী কার্যকারিতা'। আল্লাহ অনেক সময় কিছু কেড়ে নিয়ে অনেক বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন।

খ. কিশোরকে হত্যা:

"তার মাতা-পিতা ছিল মুমিন। আমরা শঙ্কা করলাম যে, সে তার বিদ্রোহমূলক আচরণ ও (আল্লাহর প্রতি) কুফুরী দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দেবে।" [১৮:৮০]

এখানে বোঝানো হয়েছে– আল্লাহ ভবিষ্যতের জ্ঞান দ্বারা কোনো অনৈতিকতার অনুমতি দেননি, বরং একজন নবীর মাধ্যমেই (যদি খিজির নবী হন) তাঁর হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ কেবল একজনকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন, যদি নিশ্চিত হয় যে তার দ্বারা ফিতনা হবে।

গ. দেওয়াল মেরামত করা:

"দেওয়ালের নিচে ছিল ইয়াতিমদের গুপ্তধন, আর তাদের পিতা ছিল সৎ।" [১৮:৮২]

এখানে শিক্ষা হলো, কোনো ভালো কাজের প্রতিদান শুধু ব্যক্তির জীবনেই নয়, তার সন্তানদের জন্যও সংরক্ষিত হয়। পিতার নেক আমল সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

মূসা (আ.)-এর প্রতিক্রিয়া ও বিচ্ছেদ:

প্রতিটি ঘটনার পর মূসা (আ.) একবার করে প্রশ্ন করেছেন, যা ছিল শর্তভঙ্গ। এরপর খিজির (আ.) বলেন: "এটাই আমাদের বিচ্ছেদের সময়। আমি এখন তোমাকে সে সবকিছুর ব্যাখ্যা করব, যাতে তুমি ধৈর্য ধরতে পারনি।" [১৮:৭৮]

এই আখ্যান প্রমাণ করে– মানবিক জ্ঞান সীমিত এবং সবসময় শরীয়তের বাইরের ঘটনাবলী শরীয়তের মতো আচরণ করে না। সেখানে রহস্য থাকে, যেগুলোর ফয়সালা কেবল আল্লাহ্ করতে পারেন।

চেতনার সফর, না কি বাস্তব ভ্রমণ? অর্থাৎ এই ঘটনা মূসা (আ.)-এর স্বপ্নে ঘটেছিল, না কি বাস্তবে ঘটেছিল?

ঘটনাটি বাস্তব ভ্রমণ ছিল বলেই অধিকাংশ তাফসিরকার মত দেন। সফরের মধ্যকার সবকিছু আল্লাহর কুদরতি নির্দেশনায় সংঘটিত হয়েছে, যদিও অনেক উপাদান ছিল অলৌকিক। রূহানিয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা ছিল আত্মিক জ্ঞানানুসন্ধান– কিন্তু তা চেতনাগত স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক সফর যার মধ্যে অলৌকিকতা ছিল। যদি এটাকে পুরোপুরি চেতনার সফর বলা হয়, তাহলে তার সাথীর খাবার বহন, ক্ষুধা অনুভব– সবকিছুই رمزی বা প্রতীকী হয়ে যায়, যা কোরআনের ভাষার বিপরীত।

খিজির (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.)-কে শিখিয়েছেন– দৃষ্টিগোচর ঘটনাই সব নয়। পর্দার আড়ালে আছে আল্লাহর পরিকল্পনা, যাকে বলা হয় তাকদীরের অদৃশ্য কৌশল।

কেন তাঁর সাথে এই ঘটনা ঘটানো হলো? মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে কওম কেন বিভ্রান্ত হলো? কওম মূলত মিশরে দীর্ঘকাল দাসত্বে অভ্যস্ত ছিল। তারা বাহ্যিক চিহ্ন ও মূর্তিপূজার প্রতি আসক্ত ছিল।

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে বলেন:

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ

"আর মূসার পরে তার সম্প্রদায় তাদের অলঙ্কারসমূহ দ্বারা একটি গো-বাছুর তৈরি করেছিল, যার ডাক ছিল।"[১]

অর্থাৎ "আর মূসার সম্প্রদায় তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেদের স্বর্ণ-অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা 'হাম্বা' শব্দ করত। তারা কী দেখল না যে, এটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল জালেম।"

দাজ্জালও হবে এমন এক চোখা, যার বাহ্যিক জ্ঞান থাকবে, কিন্তু সত্যের প্রতি অন্ধতা। যে অন্তরজ্ঞান হারাবে, সে-ই তাকে সিজদা করবে।

"ফিরে যাই শুদ্ধ জ্ঞানের উৎসে, কোরআনের কাছে। ফিরে যাই তাওহীদের মূলের কাছে।"

কারণ; বাহ্যিক দুনিয়াদারির ব্যাখ্যা দিয়ে ঈমান রক্ষা করা যায় না। প্রয়োজন রয়েছে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণশক্তি, যে শক্তি অন্তর্জ্ঞান থেকে আসে।

১. সূরা আরাফ,আয়াত ১৪৮

সূরা কাহাফের চতুর্থ ঘটনা

"যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ– ইতিহাসের শেষ স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে"

"এটা আমার রবের অনুগ্রহ; কিন্তু যখন আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে ধুলিস্মাৎ করে দেবেন। নিশ্চয়ই আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।"[১]

এই হচ্ছে চতুর্থ ও সর্বশেষ ঘটনা। এখানে আমরা দেখি– নির্ভীক এক শাসক, যুলকারনাইন। দিক থেকে দিক পেরিয়ে তিনি পৌঁছে যান দুই পর্বতের মাঝের এক গিরিপথে– যেখানে বাস করছে ভীতসন্ত্রস্ত এক জাতি। তারা যেন কথার জগতে পরবাসী, ভয় আর আতঙ্ক তাদের মুখে তালা দিয়েছে। তাদের ভয়– এক ভয়ংকর জাতিকে নিয়ে। তাদের নাম: ইয়াজুজ-মাজুজ।

শুধু ভয়ংকর বললে ভুল হবে। এ এক বিস্মরণপ্রাপ্ত, গলিত সভ্যতা। এরা ধ্বংসের জন্মদাতা, রক্তে লালিত, আগুনে পোড়ানো। এদের রক্তচিহ্ন শুধু ওইসময় নয়, এরা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে সেই প্রতিটি সময় পর্যন্ত– যখন বাতাসে ছড়ায় গ্যাস, শিশুর গায়ে পড়ে বোমা, গর্ভবতী মা হয়ে যায় নিঃশেষ, ভূমিতে ওঠে ভ্রাতৃঘাতী বিদ্রোহ, আর সংবাদমাধ্যমে কাভার হয় 'শান্তির নামে' যুদ্ধ।

যুলকারনাইন তাদের বিরুদ্ধে নির্মাণ করেন এক অদ্ভুত প্রাচীর– লোহা আর গলিত তামার কঠিন রূপে গড়া এক অবরোধ। একদিকে ধ্বংস, অন্যদিকে সংযম। একদিকে আগ্রাসন, আরেকদিকে প্রতিরোধ।

কিন্তু তিনি জানেন, এই দেওয়াল চিরন্তন নয়। এই জাতি একদিন ফিরবেই। "যখন প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন এই দেওয়াল চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।"[২]

ফিতনার ভবিষ্যৎবাণী- যুদ্ধ, রক্ত ও আগুন

আমরা আজ এক এমন সময়ে দাঁড়িয়ে, যখন ইয়াজুজ-মাজুজের অস্তিত্ব হয়তো ইতোমধ্যেই ছায়ার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, তারা এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে, যা পৃথিবীকে একবার নয়, বারবার নিক্ষেপ করবে রক্তস্নাত ভবিষ্যতের দিকে।

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯৮
২. সূরা কাহাফ

তাদের আগমন হবে এমন এক সময়ে যখন মানুষ 'শান্তির' নামে অস্ত্র তৈরি করবে, 'উন্নয়নের' নামে অস্ত্রের বাজার গরম রাখবে, আর 'মানবতার' নামে নিজ হাতে গলাটিপে মারবে লাখো নিরপরাধ মানুষকে।

দাজ্জালের মতো ইয়াজুজ-মাজুজও একধরনের ম্যাটেরিয়ালিস্টিক একচোখা জাতি। যারা দেখে শুধু বাহ্যিক অগ্রগতি– বুলেট ট্রেন, নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্ল্যাক রক আর ব্ল্যাক মিরর। কিন্তু হারিয়ে ফেলে মানবতা, অন্তর্জ্ঞান ও রুহানিয়াত।

আমরা ভুলে গেছি ভাবতে, ভুলে গেছি কাঁদতে, ভুলে গেছি চেতনার গভীর স্তরে ঈমান নামের আগুনটা জ্বালিয়ে রাখতে। তাই তো আজ আমরা শুধু বাহ্যিকতাকে সত্য ভেবে বসেছি।যেমন: ধনবান ব্যক্তি ভেবেছিল তার বাগানই চিরন্তন।

দাজ্জাল, মাহ্দী (আ.), ইয়াজুজ-মাজুজ– এই তিনটি বিষয় শুধু হাদীসের উপাদান নয়, এগুলো আমাদের আজকের সময়ের নির্দেশক মানচিত্র। ইমাম মাহ্দীর আগমনের হাদীস শতাধিক, সাহাবা-তাবেঈন থেকে শুরু করে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামগণ সবাই একমত– মাহ্দীকে অস্বীকার করা কিংবা তাঁকে নিয়ে অজ্ঞতা রাখা, ঈমানের জন্য ভয়ংকর বিপদ।

তবু আমরা দেখি, এই বিষয়কে উপহাসের খেলনায় পরিণত করেছে বহু ভণ্ড 'মাহ্দী' দাবীকারী। কেউ দাবী করে সে মাহ্দীর সেনাপতি, কেউ-বা মাহ্দীর দাদা। এ যেন সেই প্রস্তুতি যার মাধ্যমে সত্যিকার মাহ্দীর আগমনের পথকে ঘোলাটে করে দিচ্ছে বিভ্রান্তির ধোঁয়াশা।

"গুহাবাসীরা রাজ্য ছেড়েছিল ঈমান রক্ষায়। আমরাও পালাতে পারি– কিন্তু সে পালানো দেহ নিয়ে নয়, আত্মা নিয়ে।" আজ আমাদের গন্তব্য সেই আশ্রয়স্থল, যার নাম আল-কোরআন। সেখানে রয়েছে সব প্রশ্নের উত্তর, সব ফিতনার জবাব, সব আগুনের মধ্যকার বৃষ্টি।

সূরা কাহাফ শুরু হয় এই বাক্যে– "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি।"

শেষ হয় এই সতর্কতায়– "তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে এমনি এমনি সৃষ্টি করেছি? যে ব্যক্তি আমার সাক্ষাত প্রত্যাশা করে, সে নেক কাজ করুক এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করুক।"

আমরা এখন এমন এক বাঁকে দাঁড়িয়ে, যেখানে ঈমান ধরা রাখা জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মতো। এখন কথা নয়, সময় কর্মের। এখন ছদ্মবেশে বিশ্বাস বিক্রি হয়ে যায়– ডলারে, ক্লিকে, কর্পোরেট স্লোগানে। এখন গুহায় আশ্রয় মানে নিভে যাওয়া নয়, বরং আলোয় ফেরা। আলো সেই আলো– যা জ্বলে কেবল আল-কোরআনের পৃষ্ঠায়।

উপর্যুক্ত ঘটনার সাথে বর্তমান নিয়ে আসাতে অনেকেই ক্ষিপ্ত হতে পারেন। ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছি বলতে পারেন। সম্পূর্ণ পাঠ শেষ করলে আশা রাখি তা আর মনে হবে না।

ইয়াজুজ ও মাজুজ- কোরআন, হাদীস ও বাস্তবতা

কেয়ামাতের আগের দশটি বড় আলামতের একটি অন্যতম হলো ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাদুর্ভাব। আল্লাহর রাসূল হজরত 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নিজে এ বিষয়টি সার্বিকভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তা সাহাবীদের মাঝে আলোচনার বিষয় ছিল। কোরআনে দুই জায়গায় ইয়াজুজ-মাজুজের বর্ণনা পাওয়া যায়– সূরা আল-আম্বিয়া ও সূরা কাহাফ।

যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ– যুগের দুই শিংয়ের প্রতীক

সূরা কাহাফে যুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে, যিনি 'দুই শিং' অর্থাৎ দুই যুগের অধিকারী। এখানে 'ক্বারন' শব্দের অর্থ দুটি যুগকে বোঝায়, যা অতীত ও ভবিষ্যতের ভিন্ন যুগ। অতীত যুগে যুলকারনাইন ছিলেন ঈমানভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা, আর ভবিষ্যতের যুগটি হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত– আধুনিক বিশ্বের আধিপত্য যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্ত হয়ে বিশ্বজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে।

এখানে মুখ্য বিষয় হলো, যুলকারনাইন: ঈমান ও নৈতিকতার ভিত্তিতে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। ইয়াজুজ-মাজুজ: আধুনিক, ধর্মবিরোধী ও নিঃসন্দেহে ধ্বংসাত্মক শক্তি, যারা পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করবে।

ইতিহাস ও বাস্তবের মেলবন্ধন

মদিনার ইহুদী সম্প্রদায় 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'-কে যাচাই করার জন্য যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, কারণ তারা তাদের ধর্মীয় ইতিহাসে "দুই প্রান্ত ভ্রমণের" ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত ছিল। কোরআন তাদের সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' আসলেই আল্লাহর রাসূল। উপরে সেই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

আজকের সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুলকারনাইনের সেই দ্বিতীয় যুগের নিদর্শন– আধুনিক ইউরোপীয় ইহুদী ও খ্রিষ্টান সভ্যতার উন্নয়ন, যারা যুগে যুগে মানব ইতিহাসে বড় ধরনের সংঘাত এবং আধুনিক বিশ্বে ধর্মবিরোধী চেতনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

কোরআনের বর্ণনায় ইয়াজুজ-মাজুজ

কোরআন বলেছে, যুলকারনাইন একটি বিশাল বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন, যা ইয়াজুজ-মাজুজকে আটকায়। এই বাঁধ ঐ এক সময়ের জন্য ছিল কার্যকর, কিন্তু এই বাঁধ ভেঙে যাবে এবং তারা মুক্ত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকৃতি, বংশ ও আচরণ কোরআনের ভাষায় বিশদভাবে উল্লেখ আছে, যা আধুনিক ইতিহাস ও সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের ঘটনাবলীর সাথে মিলে যায়। তারা আধুনিক বিশ্বে যারা ধর্মবিরোধী, বিক্ষুব্ধ ও সহিংস– যাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীলতার মূল কারণ।

বাইবেলের ইয়াজুজ-মাজুজ দাবী ও কোরআনের সমালোচনা

ইহুদী ও খ্রিষ্টান বাইবেলে ইয়াজুজ-মাজুজের উল্লেখ আছে কিন্তু তা ব্যাপক বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর। কোরআন এসব দাবী কুঠিন্তি ও ভিত্তিহীন উল্লেখ হিসেবে উল্লিখিত এবং আল্লাহর বাস্তব বার্তার সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। কোরআন আমাদের স্পষ্টভাবে জানায় যারা প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করে, তাদের সত্যায়ন হবে না।

ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি মানে শুধু অতীতের একটি ধর্মীয় ঘটনা নয়, আজকের বিশ্ব-রাজনীতি, সংঘাত ও ধর্মীয় উত্তেজনার পেছনের একটি গভীর রহস্যময় বাস্তবতা। তারা এমন শক্তি যাদের নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য রয়েছে।

তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমাগত বিক্ষোভ, যুদ্ধ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করছে। আধুনিক বিশ্বে তাদের প্রভাব বিস্তার করে, তারা মানবতা ও শান্তির বড় শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা শুধু সামরিক নয়, ঐক্য, ঈমান, ও নৈতিকতার ভিত্তিতেও।

যুলকারনাইনের যুগের ঈমানভিত্তিক শান্তির বিপরীতে আজকের বিশ্বের এই দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে আরও গভীর আকার ধারণ করবে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ- পরিচিতি ও অতীত অবস্থান:

একদা নবী 'মুহাম্মদ' (সা.) তাঁর কিছু সাহাবীর সাথে দেখা করলেন, যারা সা-আর আলামত বা কেয়ামতের সংকেত নিয়ে আলোচনা করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের আলোচনার বিষয়টি জানতে চাইলে জানানো হয়, তারা 'সা-আর আলামত' নিয়ে আলোচনা করছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে 'রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করলেন—

"লা তাকুমুস সা-আ হাত্তা......" অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আসবে না যতক্ষণ না দশটি আলামত প্রকাশ পায়, যার মধ্যে অন্যতম হলো ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাদুর্ভাব।

(ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসঙ্গ যতবারই আসবে, ততবারই একই আয়াত, হাদীস উল্লেখ করা হবে। একই হাদীস ও আয়াত যদি একাধিকবার পড়তে বিরক্ত লাগে, তাহলে এড়িয়ে যাবেন।)

যুলকারনাইন এবং যুগের বর্ণনা

সূরা কাহাফের প্রথম অংশে আল্লাহ বলেন—

"তারা আপনাকে (হে মুহম্মাদ!) যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আমি তোমাদের তাঁর কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।" [১৮:৮৩]

'যুলকারনাইন' অর্থ 'দুই শিং' বা দুই যুগের অধিকারী। এখানে 'ক্বারন' শব্দের আরবি অর্থ 'শিং' ছাড়াও 'কাল' বা 'যুগ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সূরা কাহাফ এমন এক বর্ণনা দেয় যা দুই বিপরীত যুগকে নির্দেশ করে– অতীতের একটি যুগ এবং ভবিষ্যতের শেষযুগ। এই দুই যুগ একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সত্যতা যাচাইয়ের পটভূমি

মদীনার ইহুদীরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে স্বীকার করবে কি না তা যাচাইয়ের জন্য তিনটি প্রশ্ন দিয়েছিল, যার মধ্যে একটি ছিল যুলকারনাইন সম্পর্কে। তারা বিশ্বাস করত, যুলকারনাইন ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর দুই প্রান্ত ভ্রমণ করেছেন। কোরআন তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করে—

"আমি তাঁকে পৃথিবীতে (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে) প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং তাঁকে ক্ষমতা দান করেছিলাম যেন তিনি যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন।"[১]

এখানে স্পষ্ট যে, যুলকারনাইন ছিলেন আল্লাহর বিশেষ করুণায় বিশ্ব-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত এক ঈমানদার নেতা, যার রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ছিল আল্লাহর মদদপুষ্ট।

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৮৪

যুলকারনাইনের ভ্রমণ ও মানবতার প্রতি মনোভাব

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

"তিনি ভ্রমণ করলেন যতক্ষণ বা তিনি সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি দেখলেন সূর্যটি একটি কালো কাদাজলাশয়ে ডুবছে এবং সেখানে তিনি এক সম্প্রদায়কে পেলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'হে যুলকারনাইন! তোমার অধিকার আছে তাদের শাস্তি দিতে অথবা তাদের প্রতি দয়াময় হতে।"[১]

এখানে বোঝা যায়, যুলকারনাইন আল্লাহর নির্দেশে ন্যায়পরায়ণ ও দয়াময়তার মধ্য থেকে বাছাই করে কাজ করতেন। তাঁর নেতৃত্ব ও বিশ্বব্যবস্থা ঈমান ও নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যুগের পরিবর্তন ও আধুনিক যুগ

সূরা কাহাফের বর্ণনা অনুযায়ী, যুলকারনাইনের প্রতিষ্ঠিত প্রথম যুগ ছিল এক ঈমানদার, ন্যায়পরায়ণ বিশ্বব্যবস্থা। কিন্তু তার বিপরীত দ্বিতীয় যুগ আসে, যা আমাদের বর্তমান যুগ, যেখানে আধুনিক ইউরোপীয় ইহুদী ও খ্রিষ্টান সভ্যতা থেকে উদ্ভূত ইয়াজুজ ও মাজুজ গোষ্ঠী পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে প্রভাব বিস্তার করছে। এরা সেই যুগের 'দ্বিতীয় কারন' বা দ্বিতীয় যুগের প্রতিনিধিত্ব করে যেটা পুরোপুরি প্রথম যুগের বিপরীত।

অন্তর্দৃষ্টি

ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাদুর্ভাব— আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন দিক দিয়ে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করছে, যা পুরনো ঐতিহাসিক বর্ণনার প্রতিফলন। তাদের সংঘবদ্ধ কার্যক্রম আজকের বিশ্বে নানাবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সংকটের মূল কারণ। যুগের দ্বৈত বৈশিষ্ট্য— যুলকারনাইনের যুগে ঈমান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিল; বর্তমান যুগে তা বিপরীত, যেখানে নৈতিক অবক্ষয়, বিভ্রান্তি এবং অরাজকতা দেখা দেয়। ইয়াজুজ-মাজুজের উদয় এই অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন। আল্লাহর পরিকল্পনা— যুগের এই পরিবর্তন আল্লাহর নির্দেশিত, যেখানে শাসনব্যবস্থা ঈমান ও নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে স্থায়ী হয় না, মানুষের দুর্বলতা ও বিপথগামীতা বিশ্বকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়।

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৮৬

ঈমানভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা ও তার বাস্তবতা

নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক-ব্যবস্থা কেবল তখনই টিকে থাকে যখন তার ভিত্তি শক্তিশালী ঈমান বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এই অবস্থায় মূল্যবোধকে সমর্থন ও উৎসাহিত করতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, ঈমানহীন ক্ষমতা একসময় অন্যায়, জুলুম ও নিপীড়নের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

সূরা কাহাফে আল্লাহ যুলকারনাইনের একটি ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি তার ক্ষমতার ব্যবহার ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন ইসলামী পণ্ডিত এই আয়াতে বর্ণিত ঘন কালো সাগরকে কৃষ্ণসাগর হিসেবে শনাক্ত করেছেন। সেখানে যুলকারনাইন বললেন—

"আমরা আমাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করব সেই সকল ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যারা সীমা লঙ্ঘন করে, অন্যায় ও নিপীড়ন করবে। যখন সেই ব্যক্তি তার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।"[১]

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যখন ক্ষমতা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা অন্যায়কারীকে ন্যায়সংগত শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। যুলকারনাইনের যুগে এই ন্যায়পরায়ণ বিশ্বব্যবস্থা সর্বোচ্চ শান্তি ও কল্যাণের নিদর্শন ছিল।

কিন্তু আজকের পৃথিবী সম্পূর্ণ ফিতনায় পূর্ণ। সূরা কাহাফের বর্ণিত 'দুই যুগ'-এর দ্বিতীয় যুগটি হলো শেষযুগ বা ফিতনার যুগ। এই যুগে মানুষ নবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তাঁর দেখানো পথ থেকে সরে যাবে। ফলে, বর্তমান যুগের বিশ্বব্যবস্থা হবে প্রথম যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

এই দ্বিতীয় যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে ঈশ্বরহীনতা বা সেক্যুলারিজমের ওপর। এখানে অত্যাচারীকে শাস্তি না দিয়ে নিরপরাধ ও অসহায়দেরই শাস্তি দেওয়া হবে। সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী কর্তারা ক্ষমতাসীন হয়ে অত্যাচার চালাবে। ফলে সমাজে শান্তি ও কল্যাণ হারিয়ে যাবে।

এই সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: নৈতিক অবক্ষয় ও আধ্যাত্মিক শক্তিহীনতা, ধর্ম ও বিশ্বাসের অবজ্ঞা, ভালো কাজ ও সৎচরিত্রের অবমূল্যায়ন, নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয়

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৮৭

জীবন যাপনের বিরুদ্ধে অবর্ণনীয় নির্যাতন এবং ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ। এই হলো সেই বিশ্বব্যবস্থা, যা আজকের বিশ্বের বাস্তব চিত্র।

ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসীদের প্রতি সহানুভূতি

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন— "যে ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে, তাঁর জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিদান। এবং আমরা আমাদের আদেশে তাঁর পার্থিব জীবন সহজ করব।"[১]

যুলকারনাইন তার ক্ষমতা ব্যবহার করতেন ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এবং যারা সৎ ও ঈমানদার ছিল তাদের সহায়তায়। এই বিশ্বব্যবস্থার মূল আদর্শ ছিল বিশ্বাস ও ন্যায়।

সূরা কাহাফের বর্ণনা আমাদের কাছে সতর্কবাণী বহন করে যে, ঈমানহীন রাজনৈতিক ক্ষমতা একসময় সমাজকে অশান্তি ও বেদনার দিকে নিয়ে যায়। আর রাসূল (সা.)-এর পথ থেকে বিচ্যুতি শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ ফিতনার যুগের জন্ম দেয়।

যুলকারনাইনের ক্ষমতার ব্যবহার- নৈতিকতা বনাম শাসন

সূরা কাহাফে যুলকারনাইনের ভ্রমণের বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি ক্ষমতার ব্যবহার কীভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে, তা স্পষ্ট করেছেন। পূর্বদিকে যখন তিনি সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছান, তখন তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হন যাদের জন্য আল্লাহ শুধু প্রাকৃতিক আড়াল সৃজন করেছেন; অর্থাৎ সূর্যের আলো ও তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের নিজস্ব কোনো প্রযুক্তিগত বা সাংগঠনিক সুরক্ষা-ব্যবস্থা নেই।[২]

ঐ অঞ্চলে সম্ভবত আদিম বা যাযাবর জীবনযাপনকারী জনগোষ্ঠী ছিল, যারা আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া পায়নি। একই সময় ক্যাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে রয়েছে বিশাল তেলসম্পদ যা আজকের বিশ্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস।

এক্ষেত্রে যুলকারনাইনের সিদ্ধান্ত ছিল অসাধারণ এবং শিক্ষণীয়: তিনি ক্ষমতার লোভে আবদ্ধ হয়ে তেল বা সম্পদের জন্য যুদ্ধ ও ধ্বংস বেছে নেননি। তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার ও জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের জীবনে অবাঞ্ছিত বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি।[৩]

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৮৮
২. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯০
৩. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯১

ঈমানভিত্তিক ক্ষমতার ব্যবহার ও মানবাধিকার

এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যখন রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতা ঈমান ও নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে থাকে তখন সে ক্ষমতা শুধু শাসনক্ষমতা নয়, সুরক্ষা, সহানুভূতি ও ন্যায়ের প্রজ্ঞার উৎস হয়ে ওঠে। ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের অধিকার রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে, আজকের আধুনিক বিশ্বে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আদিম জনগোষ্ঠী, তাদের জীবনধারা ও প্রকৃতিকে প্রাধান্য না দিয়ে, ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার কার্যক্রম চলছে। আদিম যাযাবর জনসমাজকে 'অপ্রগতিশীল' ও 'অশিক্ষিত' হিসেবে অপবাদ দিয়ে তাদের উপর জোরপূর্বক আধুনিকতা চাপানো হচ্ছে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল।

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার বিপরীত

সূরা কাহাফের বর্ণনায় যুলকারনাইনের দুই যুগের বিপরীত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় যুগটি অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগ, যেখানে ক্ষমতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেক্যুলার, অর্থাৎ ঈশ্বরবিমুখ মনোভাবের ওপর। এখানে ন্যায়নীতি, প্রজ্ঞা, সহানুভূতি কিংবা সজীব বিবেককে বাদ দিয়ে শুধু স্বার্থসিদ্ধি, লোভ আর নিপীড়নের রাজত্ব।

তাদের লক্ষ্য মানুষের প্রকৃতিগত জীবনযাত্রাকে বদলে দিয়ে আধুনিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো চাপিয়ে দেওয়া। এতে যেসব জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় আদিম ও সহজ জীবনযাপন করে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন, উচ্ছেদ এবং সম্পদের হরণ করা হচ্ছে। এই অবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন: উত্তর-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, তেমনি ক্যাস্পিয়ান সাগরের আশেপাশের অঞ্চলেও বিদ্যমান।

আয়াত অনুসারে, যুলকারনাইন যখন দুই পর্বতের মাঝে পৌঁছান সেখানে তিনি এমন এক জাতিকে পান যারা তাঁর ভাষা বুঝতেও পারছিল না।[১]

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯৩

ইয়াজুজ ও মাজুজ- পরিচিতি ও ক্ষমতার প্রকৃতি

ইয়াজুজ ও মাজুজ এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের ভাষা ছিল সম্পূর্ণ অনন্য, বা তারা পৃথিবীর অন্য জনগোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করত। সূরা কাহাফে বর্ণিত যুলকারনাইনের ভ্রমণের সময় এই সম্প্রদায়ের কথা উঠে আসে, যেখানে দেখা যায় তারা এমন এক লোক যাদের ভাষা বুঝতেও কষ্ট হতো। অর্থাৎ, তারা বিশ্বের শাসক যারা সাধারণত যাদের ভাষায় কথা বলত, তাদের ভাষা তারা বুঝত না। এটা ইঙ্গিত দেয় যে, তাদের ভাষা অন্য সকল ভাষার থেকে আলাদা অথবা তারা পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

যুলকারনাইনের কাছে তারা অভিযোগ করে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ তাদের বাসভূমিতে বিশাল ফ্যাসাদ, অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস ছড়াচ্ছে। তারা তাঁর কাছে অনুরোধ করে, তাদের ও ইয়াজুজ-মাজুজের মাঝখানে একটি প্রাচীর বা বাঁধ নির্মাণ করে দিক যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে।[১]

ইয়াজুজ মাজুজের ক্ষমতা ও প্রভাব

তারা 'ফ্যাসাদ ফিল-আরদ্ব', অর্থাৎ পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার ও ধ্বংস সৃষ্টিতে নিয়োজিত। এই ফ্যাসাদে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাস, নির্যাতন এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টির সকল রূপ। অর্থাৎ নিশ্চয় যারা কুফর করেছে, কেয়ামতের দিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ জমিনে যা কিছু আছে যদি সেগুলোর সবটাই তাদের থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণও থাকে, তবুও তাদের কাছ থেকে সেসব গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।[২]

আল্লাহ্ এই ধরনের অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন, যা হলো– হত্যা, ক্রুসবিদ্ধকরণ, হাত-পা কেটে ফেলা বা সমাজ থেকে বহিষ্কার। শাস্তি

১ সূরা কাহাফ,আয়াত ৯৪
২. সূরা মায়েদা, আয়াত ৩৬

ফ্যাসাদের মাত্রা ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে এবং এটাই সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তি।ইয়াজুজ-মাজুজদের মতো শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি বিশ্বজুড়ে ফাসাদ ছড়াবে, যা নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করবে।

যুলকারনাইন যখন এই সম্প্রদায়ের অনুরোধ মেনে তাদের ও ইয়াজুজ-মাজুজদের মাঝে একটি বাঁধ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন, তখন তিনি বলেন, “আমার প্রতিপালক আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের করের থেকে উত্তম, তবে তোমরা আমাকে লোকবল দিয়ে সাহায্য করো।”[১]

এরপর তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় লোহার পাত নিয়ে সেটি স্তুপাকৃত করে ভরাট করতে শুরু করেন, ফুঁ দিয়ে তাপ উৎপন্ন করেন এবং গলিত তামা ঢালেন।[২]

এই বাঁধ বা রাদমান এক অদ্ভুত ও ঐশ্বরিক নির্মাণ ছিল যা ইয়াজুজ-মাজুজদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে ওই জনগোষ্ঠীকে রক্ষা।

ইয়াজুজ-মাজুজের বিরুদ্ধে যে প্রাচীর নির্মাণ হয়েছিল তা ছিল সর্বোচ্চ শক্তিশালী ধাতু দ্বারা গঠিত। সূরা হাদীদ,আয়াত ২৫ -এ কোরআন নিশ্চিত করেছে যে লোহা একটি এমন ধাতু যার মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা নিহিত, যা মানবজাতির কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাই যুলকারনাইন যখন ওই প্রাচীর তৈরি করছিলেন, তখন শুধু লোহার স্তর দিয়েই সীমাবদ্ধ থাকলেন না, তার উপরে গলিত তামার স্তর দিয়ে প্রাচীরকে রক্ষা করলেন যেন মরিচা বা ক্ষয়ক্ষতি না হয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট: ইয়াজুজ-মাজুজ তাদের ক্ষমতার জন্য এতই শক্তিশালী ছিল যে, তারা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেননি, কেবল আটকে রাখতে পেরেছেন। এটা আল্লাহর সুস্পষ্ট ইচ্ছার অংশ, যা শুধু তিঁনি ভালো জানেন।

যখন শেষ যুগ বা দ্বিতীয় ক্বারণে (যুগে) ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন তারা তাদের পুনরায় ফিতনা ছড়িয়ে দেবে। এই ফিতনা হবে এমন এক ভয়াবহ ভয়াবহতা, যা পুরো মানবজাতিকে সন্ত্রস্ত করবে।

সূরা কাহাফ,আয়াত ৯৭- স্পষ্ট করে দেয় যে, ওই প্রাচীরটি তারা আর উঠতে বা ভেদ করতে পারবে না, ফলে মানুষের জীবন নিরাপদ থাকবে।

---

১. সূরা কাহাফ,আয়াত ৯৫
২ সূরা কাহাফ,আয়াত ৯৬

যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীর যতদিন টিকে থাকবে, মানবজাতি ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এই প্রাচীর দুটি যুগের প্রতীক, যেখানে প্রথম যুগ ছিল শান্তির যুগ।

কিন্তু সূরা কাহাফ [১৮:৯৮] সতর্ক করে দেয় যে,
"যখন আমার প্রতিপালকের নির্ধারিত দিন আসবে, তখন তিনি এই প্রাচীরটি সমান করে দিবেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।"

অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিজেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রাচীরটি ধ্বংস করবেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করবেন। তখন শুরু হবে দ্বিতীয় যুগের ভয়াবহ ফিতনা এবং মানবজাতির জন্য বড় বিপদ।

সেই সময় বিশ্বের ক্ষমতা থাকবে সেক্যুলার ও ঈশ্বরবিমুখ শক্তির হাতে, যারা মানবতাকে জুলুম ও নির্যাতনে জর্জরিত করবে। তারা ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করবে। এই সময়ে ঈমানী অবস্থান ও আধ্যাত্মিক আশ্রয় ছাড়া টিকে থাকা কঠিন হবে।

সূরা কাহাফ [১৮:৯৯] আয়াতে বলা হয়েছে,
"আমরা তাদের এক অংশকে তরঙ্গের মতো সক্রিয় করব এবং তাদের অপর অংশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে দেব; তারপর শিঙ্গা বাজানোর সময় তাদের সবাইকে একত্রিত করব।"

বলা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজদের সংঘাত ও ফিতনা এমন মাত্রায় পৌঁছাবে যা বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, যা কেয়ামতের বড় আলামত।

সূরা কাহাফ [১৮:৯৯], আয-যুমর [৩৯:৬৮], আল-কিয়ামাহ [৭৫:৬], মুআরিজাত [৫০:২০]-সহ একাধিক আয়াতে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া শুধু কেয়ামতের ঐশ্বরিক ঘটনা নয়, বলা যায় এর সাথে মানবজাতির ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

কোরআনের ভাষায়, ইয়াজুজ-মাজুজকে একধরনের "ঢেউয়ের মতো" শক্তিশালী দল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা একে অপরকে শক্তি যোগায়। [সূরা কাহাফ,আয়াত ৯৯]-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষক ড. তাম্মাম আদী সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে ইয়াজুজ-মাজুজের ছায়া ফেলা হয়েছে নানা জাতি ও ধর্মের মধ্যে। তিনি 'ফটোকপি' হিসেবে একধরনের বৈশ্বিক, একরূপী

আধুনিক সভ্যতার কথা তুলে ধরেন যা সবকিছু নিজের মতো করে রূপান্তরিত করে নিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষত আমেরিকার খাযার গোত্রের বিভিন্ন শাখা বিশ্বের নানা অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করে অন্য জাতি ও সংস্কৃতিকে বদলে দিচ্ছে, যা কোরআনের বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের প্রভাবের প্রতিফলন। এ বিষয়ে আরও আলাপ জরুরি।

ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম পবিত্রভূমির মোহ: এক রহস্যপুঞ্জি ইতিহাস

"....এবং (হে মুহাম্মাদ,) আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।"[১]

কোরআন নিজেই ঘোষণা করে যে, তার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো "তাফসীলান লিকুল্লি শাইয়ি"– অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান। এই ঐশী ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিত হওয়া যায়, মানব ইতিহাসের যে কোনো ঘটনা– তা যতই রহস্যময় হোক না কেন, যত গভীর ষড়যন্ত্রেই আচ্ছাদিত হোক না কেন? কোরআনের আলোয় তার সঠিক ব্যাখ্যা অন্বেষণ সম্ভব। বিশেষ করে সেই ঘটনাসমূহ, যেগুলোর চূড়ান্ত রূপ হয়তো এখনও প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু যেগুলোর ভয়াল প্রতিক্রিয়া আমরা বিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রত্যক্ষ করে চলেছি।

একটি ঘটনা, যা একই সাথে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক। তার রহস্যের আবরণ আজও পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি, অথচ যার প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাই ১৯১৭-১৮ সালে ঘটে যাওয়া এক নাটকীয় ভূ-রাজনৈতিক পালাবদলে। সেই সময় সেক্যুলার তথা ধর্ম-বিমুখ ইউরোপ মুসলমানদের এক পবিত্রভূমি জেরুজালেম-কে 'মুক্ত' করার ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে। প্রায় এক সহস্রাব্দ পূর্বে ইউরোপীয় খ্রিষ্টাদের নেতৃত্বে যে ক্রুসেড অভিযান শুরু হয়েছিল, ১৯১৭ সালে তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সফল পরিণতি যেন বাস্তবায়িত হলো।

খ্রিষ্টান ইউরোপের পবিত্রভূমি দখলের মোহ যদি হয় হাজার বছরের পুরোনো, তবে প্রশ্ন হলো, বর্তমান ইউরোপ যেখানে ধর্মের প্রতি নিরাসক্ত, এমনকি অনেকাংশে ধর্ম-বিমুখ– তারা কেন সেই 'পবিত্রভূমি' পুনরুদ্ধারে এত আগ্রহী? ধর্ম যেখানে তাদের রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক নীতিনির্ধারণে কোনো ভূমিকা রাখে না, সেখানে

---

১. সূরা নাহল,আয়াত ৮৯

ধর্মতাত্ত্বিক আবেগে 'জেরুজালেম মুক্তি' আন্দোলন চালানো তাদের স্ববিরোধিতার নিদর্শন নয় কী?

এই প্রশ্নের সমান্তরালে দাঁড়ায় আরেকটি চমকপ্রদ বাস্তবতা। প্রায় ২০০০ বছর আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল যে ইহুদী ধর্মরাষ্ট্র– আদি ইসরায়েল। তার পুনরুদ্ধারের কাজেও সেই ধর্মনিরপেক্ষ ইউরোপই সক্রিয়ভাবে ইহুদীদের সহায়তা করেছিল। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক জন্মও হয়েছে ইউরোপীয় ইহুদীদের হাত ধরে এবং তা সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্য ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছত্রছায়ায়।

ইউরোপ নিজেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' পরিচয়ে পরিচিত করে, তারা কেন একটি 'ধর্মীয় রাষ্ট্র'– তাও আবার প্রায় ২০০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.)-এর নবুয়্যতের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ইহুদী রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারে এতটা আগ্রহী হয়ে উঠল? আর কেন গোটা বিশ্বের ছড়িয়ে থাকা ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু ইউরোপীয় ইহুদীরা-ই ইসরায়েল রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চায়?

এই জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব খুঁজতে গিয়ে আমরা ইতিহাসের এক গভীর স্তরে পৌঁছাই, যেখানে দেখা যায়, রোমান প্যাগানিজম খ্রিষ্টধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার পর ইউরোপীয় খ্রিষ্টান চার্চ পবিত্রভূমির প্রতি এক আশ্চর্য মোহাচ্ছন্নতা প্রদর্শন করে। এই মোহ এমন ছিল যে, বাইজেন্টাইন খ্রিষ্টানদের আবাসভূমি মাড়িয়ে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা পরিচালনা করে একের পর এক রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাইজেন্টাইন বা অন্যান্য অ-ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা কখনোই এই ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের অভিযানে শরীক হয়নি। তারা 'পবিত্রভূমি' মুক্ত করার জন্য কোনোরূপ সামরিক আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

ফলে, ক্রুসেড নামক রক্তাক্ত অভিযানগুলো শুধু খ্রিষ্টীয় আবেগে উদ্বুদ্ধ ছিল না, বলা চলে সেগুলো ছিল 'ইউরো-খ্রিষ্টান' মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতিরই ফল। এই মোহাচ্ছন্নতা যেন কেবল খ্রিষ্টীয় পরিচয়ের অনুষঙ্গ ছিল না, একটি ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল।

জেরুজালেমের মালিকানা প্রশ্নে ইউরোপের ভূমিকাটি কখনো নিছক ধর্মীয় নয়, এর পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক লক্ষ্য, যা পবিত্রভূমির উপর দখলদারিত্বের মাধ্যমে একটি বৃহৎ বৈশ্বিক পরিকল্পনার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই রহস্যময় ইতিহাস অনেকের কাছে আজব বা জটিল মনে হলেও, ইহুদীদের কাছে এটা তাদের দাবীকৃত বাইবেলীয় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হিসেবে প্রতিভাত

হয়। তারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর তাদের মাঝে একজন নবী পাঠাবেন যিনি হবেন 'মসীহ্'। সেই মসীহ্ ইসরায়েলকে পুনরায় ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন এবং সুলাইমান (আ)-এর সোনালী যুগ আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু, কোরআন এই ইতিহাসকে শুধু বিশ্লেষণ করে থেমে যায়নি, ভবিষ্যতে জেরুজালেমের কী পরিণতি হবে তাও বর্ণনা করেছে। কোরআনের আলোকে দেখা যায় যে, ইহুদীদের বাইবেলীয় প্রতিশ্রুতির আড়ালে রয়েছে এক ভয়ংকর মিথ্যাচার– আর রাসূল (সা.)-এর কাছে যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছিল, সেটাই বাস্তবতা।

"তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, 'আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।'"[১]

এবং এই নিদর্শনের বিপরীতে, আজকের যে সভ্যতা আমরা দেখি– যেখানে সত্য চাপা পড়ে, মিথ্যা বিজয়ী হয়, সেটাই সেই দ্বিতীয় 'ক্বারন' বা যুগ, যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজরা মুক্ত হয়ে বিশ্বে দমননীতি কায়েম করেছে।

ইতিহাসের রহস্যময় ও জটিল ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যার জন্য কোরআন একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের 'পবিত্রভূমি পুনর্দখল' প্রবণতা, ইউরোপীয় ইহুদীদের 'ইসরায়েল রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার' এবং সেই সাথে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার উত্থান– এই সবকিছুই কোরআনের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। বিশেষত ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস আমাদেরকে আজকের বিশ্বকে চিনতে সাহায্য করে। একটি যুগ ছিল ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর বর্তমান যুগ তার সম্পূর্ণ বিপরীত– নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্যুত এক জগৎ।

যুলকারনাইনের দুই যুগ এবং আধুনিক দুনিয়ার ফিতনার ব্যাকরণ

আধুনিক বিশ্ব যেন এক অব্যক্ত ফিতনার সমুদ্র। নৈতিকতার বুনিয়াদ উপড়ে ফেলা হয়েছে, আর তার স্থানে দাঁড় করানো হয়েছে এক সেক্যুলার, অবিশ্বাসভিত্তিক দানবীয়-ব্যবস্থা, যা জুলুম ও অবিচারের ছায়া বিস্তার করছে বিশ্বজুড়ে। এটাই সেই দ্বিতীয় যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে 'শেষযুগ', যা ফিতনায় পরিপূর্ণ, খোদা-বিমুখ ও সীমালঙ্ঘনকারী এক বিশ্বব্যবস্থা।

এই দ্বিতীয় যুগে মানবজাতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ প্রত্যাখ্যান করবে এবং তাঁর আনীত দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ফলে, দুনিয়া

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৮৩

এক উলটো ব্যবস্থার শিকার হবে। যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যায়ের পক্ষে নয়, অন্যায়ের পক্ষে ব্যবহৃত হবে। এখানে ক্ষমতার হাত শক্তিশালী হলেও তা দুর্বল ও নিরপরাধের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। সেক্যুলারিজম নামের এই খোদা-বিমুখ নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এক ব্যভিচার, অন্যায় ও অবজ্ঞার চর্চিত সমাজ।

কিন্তু যুলকারনাইনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ছিলেন ঈমানদার একজন মহান শাসক। তাঁর বিশ্বব্যবস্থা ছিল ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল নৈতিকতার সেবায় নিয়োজিত।

> "He said, 'As for one who wrongs, we will punish him. Then he will be returned to his Lord, and He will punish him with a terrible punishment.'" [*Surah Al-Kahf,Verse 87*]

এই ব্যবস্থায় ন্যায়ের শাসন ছিল সর্বোচ্চ। যে ক্ষমতা অন্য যুগে ব্যবহৃত হয় নিপীড়নের জন্য, তা এখানে পরিণত হয়েছিল শাস্তির ন্যায্যতার পক্ষে এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার।

তবে, সূরা কাহাফ এক অমূল্য সতর্কবাণীও প্রদান করে– এই বিশ্বব্যবস্থার ঠিক বিপরীত এক দ্বিতীয় যুগ আসবে, যা ঈমানহীনতায় গড়া হবে। এই যুগে পৃথিবী শাসিত হবে এমন এক ব্যবস্থায়, যেখানে রাজনৈতিক কাঠামো নৈতিকতা বা আধ্যাত্মিকতার শিকড় ছিন্ন করে চলবে। সুবিধাবাদ, ঈমানকে উপহাস, অত্যাচারের বৈধতা– সবই হবে স্বাভাবিক।

এই সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থা শুধু ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠবে না, এক পর্যায়ে ইসলামও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করবে। নৈতিকতাকে নির্মমভাবে পদদলিত করে গড়ে উঠবে এক ভয়ংকর দুনিয়া যেখানে অন্যায়ের প্রতিদান হবে প্রশংসা, আর ন্যায়ের প্রতিদান হবে শাস্তি।

এই ভয়ংকর দুনিয়ার চিত্র কোরআনে পূর্বাভাস হিসেবে পাওয়া যায়—

> "এরপর তিনি সঠিক পন্থার মাধ্যমে উপায় অবলম্বন করলেন..."[১]

অর্থাৎ, ফিতনার যুগের জবাবও কোরআনেই নিহিত রয়েছে। যুলকারনাইনের মতো নেতৃত্ব, ঈমান-ভিত্তিক রাষ্ট্র, নৈতিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সত্যের অনুসরণ– এই

১. সূরা কাহাফ,আয়াত ৮৯

পন্থাই হবে সেই পথ, যা অনুসরণ করে মানুষ পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধান পেতে পারে।

আমাদের সময়টি যুলকারনাইনের দ্বিতীয় যুগ। অর্থাৎ ফিতনার যুগ। এখানে সত্যের আলোকে চাপা দিতে ব্যবহৃত হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র, মিডিয়া ও শিক্ষা-ব্যবস্থা। কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে সেই দুই যুগের স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেছে একটি যুগে ঈমান ছিল শক্তির মেরুদণ্ড, আর অন্যটিতে ঈমানকে পদদলিত করে গড়ে তোলা হয়েছে এক জুলুমের সাম্রাজ্য। যারা আজও আল্লাহর পথে থাকতে চায়, তাদের জন্য কোরআনের এই শিক্ষা যেন এক আলোকবর্তিকা, যা অন্ধকার যুগে পথ দেখায় সত্য, ন্যায় ও চূড়ান্ত মুক্তির।

যুলকারনাইনের ক্ষমতার দ্বিতীয় প্রয়োগ

"যতক্ষণ না তিনি সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন (অর্থাৎ তিনি পূর্বের একেবারে দূরপ্রান্তে চলে গেলেন; যেহেতু এরপর কোনো ভূমি ছিল না, তাই মনে হচ্ছিল এটাই পৃথিবীর শেষপ্রান্ত এবং এখান থেকেই সূর্য উদিত হয়)। তখন তিনি একে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হতে দেখলেন, যাদের জন্য (সূর্য, কিরণ, আবহাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্য) আমরা প্রাকৃতিক আড়াল ছাড়া কিছুই তৈরি করিনি।"[১]

এই আয়াতে পূর্ব-দিগন্তে তাঁর অভিযান এবং এক প্রাকৃতিক ও অবিন্যস্ত পরিবেশে বসবাসরত এক আদিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ রয়েছে। ব্যাখ্যাগতভাবে, যেভাবে তিনি পশ্চিমে এক সাগরে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখেছিলেন, পূর্বেও তিনি পৌঁছান আরেক সাগরঘেঁষা অঞ্চলে। যদি পশ্চিমের সেই সমুদ্র হয় কৃষ্ণসাগর, তবে পূর্বের এই অঞ্চল হতে পারে ক্যাস্পিয়ান সাগর।

এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে জানা যায়, এখানে এক সময় বসবাস করত এক আদিম, সুরক্ষাহীন সম্প্রদায়। তারা আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত কিন্তু স্বাভাবিক পরিবেশে জীবনযাপনরত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে– যদি এই অঞ্চলে বিপুল তেল-সম্পদ থেকে থাকে এবং সেই সম্পদ আহরণে এই গরিব সম্প্রদায় বাধা হয়ে দাঁড়াত তবে যুলকারনাইন কী করতেন? বর্তমান দুনিয়ার মতো কী তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে যুদ্ধ লাগিয়ে দিতেন, জনগণকে উচ্ছেদ করতেন, না কি তাদের মানবাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ বেছে নিতেন?

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯০

এই প্রশ্নের উত্তর কোরআন নিজেই দেয়—

"এভাবেই (তিনি তাদের সাথে দেখা করলেন আর বুদ্ধিমত্তা ও দয়ার সাথে তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি করলেন না); এবং আমরা আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর অবস্থা (ও প্রতিক্রিয়া) সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছি।"[১]

যুলকারনাইন তাঁর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেননি। তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি লোভকে সংযত রেখে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। তিনি যুদ্ধের পথে হাঁটেননি, মানুষের জীবন, তাদের পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের সঙ্গে সহিষ্ণুতা ও দয়ার আচরণ করেছেন।

আধুনিক বিশ্বের আয়নায় এই দৃষ্টান্ত

এখানে যুলকারনাইনের নীতি আমাদের বর্তমান দুনিয়ার উপর এক গুরুতর প্রশ্নবোধক চিহ্ন টেনে দেয়। আজ বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে দুর্বল দেশগুলোতে হামলা চালায়, জনগণকে গৃহচ্যুত করে, সংস্কৃতি ধ্বংস করে, ন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে শুধু অর্থনৈতিক স্বার্থে এক ভয়ংকর জুলুমতান্ত্রিকতা গড়ে তোলে। কিন্তু যুলকারনাইনের মডেল ছিল একেবারে ভিন্ন। তিনি ছিলেন এমন একজন শাসক, যিনি জানতেন কীভাবে মানবিকতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্যে সুষম ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

তাঁর এই আচরণ একটি চিরন্তন শিক্ষায় পরিণত হয়েছে– ক্ষমতার প্রকৃত মর্যাদা প্রকাশ পায় তখনই, যখন তা আত্মসংযম ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হয়।

ক্ষমতার ভিত্তি: ঈমান, ন্যায়নীতি ও যুগের বিপর্যয়

ক্ষমতার প্রকৃত ভিত্তি যখন ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন তা ন্যায়নীতি, প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা এবং সতেজ বিবেককে লালন করে। এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলে যা মানুষের কল্যাণ ও শান্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। ইতিহাস সাক্ষী, ইউরোপীয় সভ্যতার আগমনের পূর্বে উত্তর-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলগুলোর আদিবাসীরা মূলত স্বেচ্ছায় যাযাবর বা প্রাকৃতিক জীবনযাপন করত। তাদের জীবনযাত্রাকে যুলকারনাইনের নীতিভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনোভাবেই বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেনি। আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন ও সম্পদ আহরণের নামে তাদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায় বাধা দেয়নি।

---

১. সূরা কাহাফ,আয়াত ৯১

কিন্তু সূরা কাহাফে যে দুই যুগের (দুই ক্বারনের) বর্ণনা এসেছে, তার দ্বিতীয় যুগটি চরম সতর্কবাণী বহন করে। দ্বিতীয় যুগটি হলো শেষযুগ, যেখানে ক্ষমতা বাস্তবিক অর্থেই সেক্যুলার বা ঈশ্বরবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গির অধীন থাকবে। এখানে ন্যায়নীতি, প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা এবং জীবন্ত বিবেকের আদর থাকবে না। তারা এসবকে নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করবে, যেখানে যা সুবিধাজনক।

এমন যুগে তারা নির্দয়ভাবে অন্য জাতির সম্পদ লুটবে, তাদের জীবনযাত্রাকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবে এবং আদিম জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতিকে আক্রমণ করবে। ধর্ম, মানবাধিকার, আধুনিকতা, বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার নামে তারা এই নির্মম আচরণকে স্বাভাবিক করিয়ে নেবে। যারা স্বাধীনভাবে যাযাবর অর্থনৈতিক জীবন যাপন করে, তাদেরকে পরাজিত করবে এবং অকল্পনীয় নির্যাতনের শিকার করবে। আজকের উত্তর-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও বিশ্বব্যাপী অনেক সহজ সরল জনগোষ্ঠী এই কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। ক্যাস্পিয়ান অববাহিকার তেল-সমৃদ্ধ অঞ্চলও এই একই ভাগ্যের জন্য অপেক্ষমান।

নবী মুহাম্মদ (সা.) থেকে সংকলিত সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক কুদসী হাদীসে বলা হয়েছে,

"...আমি আমার এক সৃষ্টিকে এতটা ক্ষমতাবান করেছি যে, আমি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না।"

এখানে আল্লাহ্ নিজেই ইয়াজুজ-মাজুজদের অসাধারণ ক্ষমতার কথা ঘোষণা করেছেন, যা কেবল তিনি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

সূরা কাহাফ আরো ব্যাখ্যা দেয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজরা তাদের ক্ষমতাকে যুলকারনাইনের বিপরীতে ব্যবহার করে। তারা জমিনে ফ্যাসাদ, অর্থাৎ ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। নির্বিচারে হত্যা, পরিকল্পিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও নির্যাতন তাদের প্রধান কার্যকলাপ।

এই প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে পারি যে, ক্ষমতার প্রকৃত ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে এক গভীর ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। যুলকারনাইন তার ক্ষমতা মানব কল্যাণে নিয়োগ করেছিল, যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজ তা শুধু ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করেছে।

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে فساد সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি আলাদা হতে পারে না; তাদেরকে হত্যা করতে হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে, অথবা বিপরীত পা-হাত কর্তন করতে হবে, অথবা তারা

সমাজ থেকে নির্বাসিত হতে হবে। এরা পৃথিবীতে লজ্জিত এবং তাদের জন্য আখেরাতে বড় শাস্তি রয়েছে।"[১]

এই শাস্তির মাত্রা নির্ধারিত হবে ফ্যাসাদের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারে। কোরআনের এমন ঐশ্বরিক বিধানগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম কঠোর ও স্পষ্ট নির্দেশনা।

উপরের আলোচনার অন্যতম মূল বার্তা হলো যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে ছেড়ে দেবেন, তখন মানবজাতি এমন এক বিশ্বব্যবস্থার মুখোমুখি হবে যা পুরোপুরি যুলকারনাইনের যুগের বিপরীত। প্রথম যুগের শান্তি ও ন্যায়নীতি বদলে আসবে ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা। সূরা কাহাফের ঐ বর্ণনা আধুনিক যুগের জন্য একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা।

"আমার প্রতিপালক আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের দেওয়া করের চেয়ে উত্তম; কিন্তু তোমরা আমাকে সহায়তা করো লোকবল দ্বারা, আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে একটি বাঁধ নির্মাণ করব।"[২]

যুলকারনাইন রাজি হন ইয়াজুজ-মাজুজদের জন্য একটি অটুট বাঁধ বা প্রাচীর নির্মাণ করতে। এই বাঁধকে আরবিতে 'রাদ্মান' বলা হয়, অর্থাৎ এক ধরনের বাধা বা বাঁধ যা তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেবে।

"আমাকে লোহার পাতাগুলো এনে দাও।" এরপর তিনি লোহার পাতাগুলোকে দুই পাহাড়ের মধ্যে সমতল করে দিলেন। তিনি বললেন, "দাহকের আগুন জ্বালাও।" আগুন জ্বলে উঠলে তিনি বললেন, "আমাকে গলিত তামা নিয়ে আসো, যাতে আমি এটার ওপর ঢালতে পারি।"[৩]

এমন নির্মাণ করে তিনি নিশ্চিত করলেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজরা যে-কোনো ধরণের আক্রমণ বা ক্ষতি করতে পারবে না। তারা ক্ষমতায় থাকলেও তাদের ক্ষমতাকে আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে ধ্বংসের ক্ষমতা তাদেরই হাতে।

যখন দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ ফিতনার যুগে আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজদের ছেড়ে দেবেন, তখন তারা বিশ্বজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। সেই সময় মুমিনদের নিজেকে রক্ষা করতে হবে অদৃশ্য এক প্রাচীরের আশ্রয়ে– যা কোরআনের আয়াতসমূহের মতো শক্ত, আর সুন্নাহ্র আদর্শের মতো সুনির্মিত হবে। এই অদৃশ্য প্রাচীর হবে লোহার খণ্ডের মতো শক্ত ও গলিত তামার মতো দৃঢ়।

---

১. সূরা মায়েদাহ্, আয়াত ৩৩
২. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯৫
৩. সূরা কাহাফ,আয়াত ৯৬

"এভাবেই (প্রাচীরটি নির্মিত হলে) ইয়াজুজ-মাজুজরা পারবে না তা পার হতে, কিংবা ধ্বংস করতে। এভাবেই মানবজাতি তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।"

অর্থাৎ, যুলকারনাইনের নির্মিত এই বাঁধ যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন মানুষ ইয়াজুজ-মাজুজের অনাচার থেকে নিরাপদ থাকবে। প্রথম যুগে এই বাঁধ ছিল নিরাপত্তার প্রতীক, আর দ্বিতীয় যুগের ফিতনা শুরু হবার সাথে সাথে এটা ভেঙে যাবে বা বিদ্ধস্ত হবে।

দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ শেষ সময়ের আলামতগুলো একের পর এক প্রকাশ পাবে, যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজের বিস্তৃত ফ্যাসাদ ও ধ্বংসাজনক কার্যকলাপ মানবজাতিকে কাঁপিয়ে তুলবে। এই মুহূর্তে, বিশ্বাসীদের প্রয়োজন হবে কোরআন ও সুন্নাহর অদৃশ্য প্রাচীরে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা।

সূরা কাহাফ আমাদেরকে শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বা একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের কাহিনি শোনায় না, এই সূরার মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় একটি চিরন্তন আদর্শ– ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার এবং এর নৈতিক ভিত্তি। সূরা কাহাফ দ্বিতীয় ক্বারন তথা শেষযুগ সম্পর্কে একটি কঠোর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে। সে যুগে যারা ক্ষমতায় থাকবে, তারা ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়ে সেক্যুলার চিন্তাধারার অনুগামী হবে। তাদের রাষ্ট্রদর্শন হবে যুলকারনাইনের ঠিক বিপরীত।

এই নতুন বিশ্বশক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানবতা, ন্যায়নীতি বা সহমর্মিতার কথা বললেও বাস্তবে এগুলোর কোনোটিই তারা আন্তরিকভাবে পালন করবে না। তারা ধনী হওয়ার লোভে গরিব, সহজ-সরল জনগোষ্ঠীর সম্পদ দখল করবে। তাদের জীবনধারাকে আধুনিকতার নামে ধ্বংস করে দেবে। মানবাধিকার ও উন্নয়নের নামে চাপিয়ে দেবে এক নির্মম, আত্মাহীন জীবনযাত্রা। স্বেচ্ছায় যাযাবর, কৃষিভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক সমাজব্যবস্থাগুলোকে মুছে ফেলবে সভ্যতার মানচিত্র থেকে।

এই নৃশংস বাস্তবতার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেখানে ইউরোপীয় আধুনিকতার আগ্রাসনে আদিবাসী ও স্থানীয় সংস্কৃতি একে একে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন সেই একই ভাগ্যের সম্মুখীন হচ্ছে ক্যাস্পিয়ান অববাহিকা, যার ভূগর্ভে বিশাল তেলের ভাণ্ডার মজুদ রয়েছে।

আদিবাসীদের উপর এই নিষ্ঠুর দমননীতি শুরু হয় তথাকথিত উন্নয়নের ব্যানারে, কিন্তু পরিণত হয় একটি নব্য-ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বে। অথচ সূরা কাহাফ আমাদের দেখায়– একজন সৎ ও ঈমানদার শাসক কখনোই এমন আচরণ করতে পারেন না।

আসন্ন তারকা-যুদ্ধ (STAR-WAR) ও পরমাণু বিনাশের পূর্বাভাস:

সূরা কাহাফ [১৮:৮]-এর আলোকে বলা যায়, ইয়াজুজ-মাজুজদের সংঘর্ষ একটি বিশাল বৈশ্বিক যুদ্ধে রূপ নেবে, যাকে আধুনিক যুগের 'তারকা-যুদ্ধ' বা 'STAR-WAR'-এর পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই সংঘর্ষে পৃথিবীর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, ফলে কেয়ামতের শুরু হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজদের দ্বন্দ্ব দ্বৈত ক্ষমতার লড়াই, একক আধিপত্যের জন্য যুদ্ধে নামার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে। এখানে ইবলিসের ধড়িবাজি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যিনি মানবজাতিকে বিভক্ত করে নিজেদের জন্য সুবিধা তৈরি করতে চায়। কোরআন স্পষ্ট করে দেয় যে, এই সংঘর্ষের পরই শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, অর্থাৎ এই ভয়ের দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ তার বিচারের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে একত্রিত করবেন।

সূরা কাহাফ [১৮:১০০] এ ইঙ্গিত আছে,

> "সেদিন আমরা সত্যকে অস্বীকারকারী সকলের চোখের সামনে জাহান্নামকে প্রদর্শন করব।"

এটা বোঝায় যে, সেই যুদ্ধে বিপুল জনসংখ্যা ধ্বংস হবে। এমন পরিস্থিতি আজকের বিশ্বে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে যেখানে তথাকথিত আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা ও নৈতিক অবক্ষয় চলছে। মুসলিমরা সেই সমাজে বসবাস করছে যেখানে তাদের ধর্ম ও মূল্যবোধ নিয়ে অবর্ণনীয় চাপ এবং নির্যাতন চলছে।

সূরা কাহাফ [১৮:১০১]-এর ভাষ্য:

> "যাদের চোখে আমার স্মরণ থেকে পর্দা লেগে রয়েছে, তারা দেখতে পারে না, শুনতে পারে না, উপলব্ধি করতে পারে না।"

এরা হলো সেই মানুষ যারা দ্বিতীয় যুগের (দ্বিতীয় কারণের) বাস্তবতা বুঝতে অক্ষম বা অস্বীকার করে। তারা ধর্ম, ঈমান, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধাচরণে নিয়োজিত এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে মুসলিম ও ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি অমানবিকতা চালায়। এই বাস্তবতাকে তারা চিহ্নিত করতে বা মেনে নিতে অস্বীকার করে।

কোরআনের পাশাপাশি হাদীস ও ইহুদী-খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থের দলিলের আলোকে ইয়াজুজ-মাজুজের জীবনচিত্র যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– তারা মানবজাতিরই অংশ, কিন্তু তাদের চরিত্র দ্বিমুখী, ধর্মনিরপেক্ষতার ভান ধরে তারা বিশ্বাসীদের শত্রু, তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিষ্ঠুর।

আধুনিক বিশ্বে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতিনিধিত্ব পায় এমন গোষ্ঠীগুলো ধারাবাহিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ও বিশ্বাসীদের প্রতি অপবাদ, বৈষম্য ও নির্যাতন বাড়িয়ে চলেছে। তারা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে, মানুষের আত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য কাজ করে। তাদের হাত ধরে বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার পেয়েছে।

কীভাবে? তাত্ত্বিক তত্ত্বে বললে, কোরআনুল কারিমের সূরা আম্বিয়ার ৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

حَتّٰۤی اِذَا فُتِحَتۡ یَاۡجُوۡجُ وَ مَاۡجُوۡجُ وَ هُمۡ مِّنۡ کُلِّ حَدَبٍ یَّنۡسِلُوۡنَ ﴿۹۶﴾

অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। -আল-বায়ান

এমনকি (তখনও তারা ফিরে আসবে না) যখন ইয়াজুজ ও মাজুজের জন্য (প্রাচীর) খুলে দেওয়া হবে আর তারা প্রতিটি পাহাড় কেটে ছুটে আসবে। -তাইসিরুল

যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। -মুজিবুর রহমান

Until when [the dam of] Gog and Magog has been opened and they, from every elevation, descend. -Sahih International

সূরা আম্বিয়া [২১:৯৬-৯৭] - এ আল্লাহ বলেন, "যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উঁচু স্থানে ছুটে আসবে, তখন সত্য প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সন্নিকটে হয়ে যাবে।"

অতিরঞ্জিত গল্পকারে এ-ও বলা হয়– "পৃথিবীর কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে (ককেশাস পর্বতমালা, মধ্য এশিয়ার দুর্গম অঞ্চল বা চীনের সীমান্তে) তারা গুহায় আটকে আছে। কেয়ামতের আগে আল্লাহ্ তাদের ছেড়ে দিবেন। তারা দুনিয়ার উপর দিয়ে ছুটে বেড়াবে। মানুষ তাদের প্রতিরোধে অক্ষম হবে।"

ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতীকীভাবে কোনো বর্বর সভ্যতা বা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জাতিকে বোঝায়। ইয়াজুজ-মাজুজ নয় কোনো গুহায় আটকে থাকা বা পাহাড়ের প্রাচীরে বন্দী থাকা কোনো জাতি। এরা হতে পারে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বা উগ্র প্রযুক্তিনির্ভর গোষ্ঠী যারা মানবতা ধ্বংসের পথে ধাবিত করছে।

আবার কেউ চীন-তাতার, মঙ্গোল, রাশিয়া, ইসরায়েল বা কিছু পশ্চিমা জাতিকেও ইয়াজুজ-মাজুজের পূর্বাভাসরূপে দেখেছেন।

কিছু গবেষণা থেকে পাওয়া:

১. স্কলারদের বিশ্লেষণ: আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায়– ইয়াজুজ-মাজুজ কোরআনে এবং হাদীসে এক বাস্তব জাতি হিসেবে বর্ণিত, যা ভয়াবহভাবে ধ্বংসাত্মক এবং মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে আগ্রাসী।

২. তাতার চিন্তাবিদ মোসা বিগিয়েভ: টাটার (তাতার) আলেম মোসা বিগিয়েভ 'ইসলামী মূল্যবোধের' পটভূমিতে ইয়াজুজ-মাজুজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন– যে তারা কেবল এক মিথ নয়, বিশ্লেষণাত্মকভাবে বুঝলে একটি দুনিয়ার বিপদ সতর্কতা।

৩. ইন্দোনেশিয়ান ও মালয় গবেষণা: অ্যাল-আজহার (Buya Hamka)-এর তাফসিরে ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেটা ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি ও হেরমেনিউটিকস' ব্যবহার করেন– মানে এটা শুধু পুরোনো হাদীস নয়, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিতেও সমৃদ্ধ।

৪. মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসগত দৃষ্টিভঙ্গি: ককেশাস অঞ্চলে 'Darial Gorge' বা 'Caucasus Mountains'-এর বাঁধটিকে অনেক সময় ইয়াজুজ-মাজুজের বাঁধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এমনকি খাযার (Khazar) জাতিকে কিছু গবেষক 'ইহুদী-খ্রিষ্টান মিশ্র শক্তি' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

৫. বাইবেলীয় Gog & Magog সম্পর্ক: যে ধারণা ইসলামী ইয়াজুজ-মাজুজ ও বাইবেলীয় Gog ও Magog একই, তা ওয়েবপেজ ও একাডেমিক সূত্রে গুরুত্ব

সহকারে দেখা হয়েছে; তবে স্কলারদের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। অতিরঞ্জিত তথ্য নিয়ে সমস্যা আছে।

যুলকারনাইনের বাঁধ অস্তিত্ব

ইতিহাসে 'Caucasus/Darial Gorge'-কে এই বাঁধের বাস্তব আবাসস্থল বলা হয়েছে, সেখানের কিছু স্কলার এটাকে বাস্তব-ভিত্তিক ধারণা হিসেবে দেখেন।

মানবজাতি হিসেবে বংশগতির ব্যাখ্যা: ইবনে কাসির, বুখারী ও মুসলিমে প্রচলিত হাদীস অনুযায়ী, তাঁরা আদম, নূহ ও ইয়াফিসের বংশধর। অর্থাৎ মানুষের সংজ্ঞায় অন্তর্গত।

ইসরায়িলীয় প্রসারিত গ্রন্থ

অনেক পুরোনো কিতাব। যেমন: দ্যাইল অব খননের দৈত্য রোগের দৈত্যাকার চেহারার হানকীর, যেগুলো মূল কোরআন ও সহীহ হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সেগুলো প্রমাণহীন বা গঠিত।

আলমুসলীহের যুক্তি: Ibn Taymiyyah প্রণীত 'Isra'iliyyat' যুক্তি হিসেবে বাইবেল থেকে প্রকাশিত কথাগুলোকে ইসলামী বিষয়তে মিশ্রিত করা হয়েছে– যা সঠিক নয়। তথা ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি দানবের মতো দেখতে, রূপকথার দৈত্যদের মতো বড় বড় কান, লম্বা নাক, বড় দাঁত, লোমশ শরীর ইত্যাদি এসব তথাকথিত বর্ণনার হাদীসকে অস্বীকার করা হয়েছে ও বলা হয়েছে এগুলো ইহুদী ও খ্রিষ্টান গল্প থেকে আগত।

Hafiz Ibn Hajar সহাদ্দেছে দৈত্যজন্ম ও দৈত্যাকৃতির চেহারাসম্পর্কিত ধারণা 'extremely unreliable' বলে।

ইয়াজুজ-মাজুজকে মানবজাতি বলা যুক্তিযুক্ত। কেন? উত্তর: কোরআন ও সহীহ হাদীস-এর ভিত্তি সরাসরি তা বলেছে, তাই আমাদেরও মানতে হবে। একপর্যায়ে বলা যায়– 'দৈত্যাকার দৈর্ঘ্য, হাতির মতো কান' ইত্যাদি মিথ-ভিত্তিক হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য নয় এবং স্কলারদের দ্বারা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিহবা দিয়ে সারারাত প্রাচীর চেটে যায় আর সকালে তা আবারও আগের অবস্থায় ফিরে যায় অথবা সেই গর্ত ভরাট হয়ে যায়, এটাও মিথ। খুচরো গল্প এবং হাদীসের নামে জালিয়াতি। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের রূপকথার গল্প থেকে এসব নিছক গল্প হাদীসে ঢুকে গেছে।

ইসলামী স্কলাররা ঐতিহ্যগতভাবে ইয়াজুজ-মাজুজকে একটি অবরুদ্ধ জাতি হিসেবে দেখলেও, আধুনিক চিন্তাবিদরা এদের দেখছেন ধ্বংসাত্মক এক সভ্যতা বা মানসিকতা হিসেবে, যারা মানবসভ্যতার ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে– সশরীরেও, আদর্শগত ভাবেও। এরাও একটা জাতি।

ইয়াজুজ ও মাজুজ– আধুনিক বিশ্বের প্রতিচ্ছবি

আধুনিক বিশ্বের শাসনব্যবস্থা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য– সব মিলিয়ে যেন ইয়াজুজ-মাজুজের সেই কোরআনিক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি:

আল্লামা ইকবাল ছিলেন এমন একজন কবি-দার্শনিক যিনি ইসলামী আধ্যাত্মিকতা ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে একত্রে বিশ্লেষণ করতেন। আল্লামা ইকবাল স্পষ্টভাবে বলেন–

"کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام
چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون"

"খুলে গেছে ইয়াজুজ-মাজুজের সব বাহিনী, হে মুসলমান! এখন দেখে নাও 'yansiloon' শব্দের বাস্তব ব্যাখ্যা।"

এই উদ্ধৃতিটি সূরা আম্বিয়ার ৯৬ নম্বর আয়াতের "فُتِحَتْ" (ফুতিহাত) এবং "يَنسِلُونَ" (ইয়ানসিলুন) শব্দের প্রতিশব্দেই রচিত। আল্লামা ইকবাল এই আয়াত ব্যাখ্যায় বলতে চেয়েছেন– ইয়াজুজ-মাজুজ ভবিষ্যতের কোনো অপেক্ষমাণ বন্দী কোনো গোত্র শক্তি নয়, তারা ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে উন্মুক্ত হয়েছে। তাদের আধিপত্য দুনিয়াজুড়ে– অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে।

শায়খ ইমরান নযর হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গি

শায়খ ইমরান নযর হোসেন আধুনিক দুনিয়ায় ইয়াজুজ ও মাজুজের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এমনভাবে যে, এটা কোনো নির্দিষ্ট পাহাড়ের প্রাচীরে বন্দী জাতি নয়, একটি সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা বা গোষ্ঠী। তার মতে:

ইয়াজুজ ও মাজুজ পশ্চিমা সভ্যতার মাধ্যমে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যাংকিং সিস্টেম, গণমাধ্যম এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণে নেমেছে। তাদের ধ্বংস কেবল ঈসা (আ.)-এর দোয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হবে। এই শক্তিকে মানবতা কখনো নিজের হাতে পরাজিত করতে পারবে না।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইয়াজুজ ও মাজুজ কারা?

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা? তারা কোথায়? কবে আসবে? এই প্রশ্নগুলো চিরকাল ইসলামী গবেষণায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কোরআন ও হাদীসে সরাসরি তাদের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপের ইঙ্গিত থাকলেও, তাদের পরিচয় নিয়ে আজও মতভেদ চলমান। মূলধারার ওলামায়ে কেরাম সাধারণত নির্ভর করেন সাহাবী ও তাবেঈনের তাফসির ও রেওয়ায়েতসমূহের উপর। পক্ষান্তরে সমসাময়িক গবেষক শায়খ ইমরান নযর হোসেন এই বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে এক নতুন 'সাংবাদিকতুল্য তাফসির' পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

শায়খ ইমরান হোসেন তার বই 'An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World'-এ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক ও ভূগোলভিত্তিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তার মতে:

১. ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক ভিত্তি:

কোরআনের সূরা কাহাফ [১৮:৯৩-৯৬]-এ যুলকারনাইন যে প্রাচীর নির্মাণ করেন তা ককেশাস পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত Darial Gorge অঞ্চলেই অবস্থিত। এখানেই আটক ছিল খাযার (Khazar) নামক এক জাতি, যাদেরকে ইমরান নযর ইয়াজুজ-মাজুজ হিসেবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে এই খাযার জাতির একটি অংশ ইহুদীবাদ গ্রহণ করে।

২. ইয়াজুজ-মাজুজ মানেই আধুনিক ইহুদী ও ইউরোপীয় শক্তি?

খাযারদের বংশধররা আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসরত ইহুদী সম্প্রদায়ের মূল অংশ। এই ইহুদী জাতিগোষ্ঠীই (বিশেষত আশকেনাজিরা) ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা ও 'পবিত্র ভূমি' পুনর্দখলে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ইমরান নযরের মতে, ইয়াজুজ-মাজুজ হলো সেই ইউরোপীয় জায়োনিস্ট শক্তি যারা মুসলিমবিশ্বে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংস ডেকে আনছে।

৩. আয়াত ও হাদীসের ভিন্নতর ব্যাখ্যা:

সূরা আম্বিয়ায় [২১:৯৫–৯৭] 'যুলকারনাইনের প্রাচীর থেকে ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি'-কে তিনি বুঝেছেন আধুনিক যুগে ইসরায়েলী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস হিসেবে। তারা "প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে নেমে আসবে"–এর মানে তিনি বেছে নেন বিশ্বমঞ্চের সর্বোচ্চ ক্ষমতা (রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি) দখল করা।

প্রথাগত আলেমদের আপত্তি ও সমালোচনা:

মূল হাদীসের ধারাবাহিকতা অগ্রাহ্য:

প্রথাগত মত অনুযায়ী, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন হবে তখন, যখন ঈসা (আ.) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। যেমন: সহীহ মুসলিমে এসেছে–

"...হঠাৎ-ই আল্লাহ ওহী নাযিল করবেন যে, আমি এমন এক জাতিকে বের করেছি, যাদের বিরুদ্ধে কারো লড়াইয়ের ক্ষমতা নেই..."[১]

এই হাদীস অনুসারে: ইয়াজুজ-মাজুজ এখনো আসেনি, তারা কেয়ামতের পূর্বে আসবে। ঈসা (আ.)-এর আগমন, দাজ্জালের মৃত্যু, মুসলিম বিজয়– এই ধারাবাহিকতা ভেঙে ইমরান হোসেনের এই ব্যাখ্যাকে তারা অস্বীকার করেন। প্রথাগত আলিমগণ এ-ও বলেন যে, ইহুদীরা 'ইয়াজুজ-মাজুজ' হতে পারে না। কারণ হাদীসের আরেকটিতে বলা হয়েছে:

"ইহুদী যদি গাছ বা পাথরের আড়ালে লুকায়, সেটাও মুসলিমকে বলবে, 'এই তো ইহুদী! এসো তাকে হত্যা কর।'"[২]

এখানে ইহুদী জাতি দাজ্জালের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হলেও, ইয়াজুজ-মাজুজ নয়। কারণ; ইয়াজুজ-মাজুজ হবে একটি ভিন্ন ও অজেয় জাতি– যাদের বিরুদ্ধে কারো জিহাদ বা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এটাই ছিল কিছু স্কলারদের ভাষ্য। তারা শায়খ ইমরান নযর হোসেনের তত্ত্ব মানতে নারাজ।

তবে এখানে প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে রূপক তাবীলের প্রয়োজনীয়তা। এর মানে হলো কোনোকিছু বাহ্যিক অর্থের ভিন্ন কোনো বাস্তব ঘটনার সাথে মিলিয়ে দেখা। স্বপ্ন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক অর্থ প্রায়ই রূপকভাবে বুঝতে হয়। এর প্রধান কারণ হলো, আধ্যাত্মিক বাস্তবতা জাগতিক বাস্তবতা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। জাগতিক বাস্তবতা প্রতারণাময় আর চূড়ান্ত নয় (ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা) সেজন্য রূপক

১. সহীহ মুসলিম, ৭০১৬
২. সহীহ মুসলিম, ৭০৭৫

তাবীল অতীব প্রয়োজনীয়। আখিরাতেই কেবল বাস্তবতা হবে পরম ও চূড়ান্ত সত্য। পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এমন অহরহ রূপক আছে।

'কোরআন মাজিদ'-এ কোনো আয়াত যুক্ত হওয়া মানে তা শুধু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়। কোরআন শুধু ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী বা উম্মাহর বিধান নয়। কোরআন সামগ্রিক ব্যবস্থার নাম। নাযিলকৃত অসংখ্য আয়াত আছে, নির্দিষ্ট ঘটনা হলেও তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়। সরল ঘটনায় জটিল, তা বের করতে হবে উম্মাদের। তবে কিছু আয়াত আছে, যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ওসব বিধান সম্পর্কিত। রহিত করা, ইত্যাদি আরও আছে। আবারও বলি– কিছু আয়াতে তদানীন্তনকালের ঘটনা বর্ণনা করা হলেও এসব চিরন্তন। ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে কিছু আয়াত ইতোমধ্যে শতভাগ সত্য হয়েছে, সামনেও হবে। কোরআনের বাণী কখনোই মিথ্যা হতে পারে না। তেমনই সূরা কাহাফ, সূরা আম্বিয়া ইত্যাদি। পুরো কাহাফের প্রতিটি ঘটনা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে হুবহু মিল আছে। এসব আয়াতে অতীতের ঘটনা বলা হলেও, সেইসব ঘটনার মধ্যে এমনকিছু আছে, যা বর্তমান ও আগামীর কথা বলে। রূপক অর্থে প্রকাশ হওয়া, সেইসবকে মিলিয়ে নিতে হবে।

চিরায়ত আয়াতে একটা ঘটনার উদাহরণ দেওয়া হলেও তা যুগ-যুগান্তর ধরে সামগ্রিক বিষয়ও ধারণ করে। কোরআনের কিছু আয়াত আছে যেগুলো একই সাথে একাধিক অর্থ বহন করে এবং কিছু আয়াত আছে যেগুলো চিরন্তন সত্যের উপর আলোকপাত করে। বহুমাত্রিকতা: কোরআনের ভাষা এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত। একটি আয়াতের একাধিক অর্থ থাকতে পারে যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য। তাই একক ব্যাখ্যা করাও যাবে না, আবার করার সুযোগও নেই– কেউ করলে তাতেও সমস্যা নেই। তবে, কোনোভাবেই অপব্যাখ্যা করা যাবে না।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: কিছু আয়াত বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে নাযিল হয়েছে, তবে সেগুলের অন্তর্নিহিত শিক্ষা সকল কালের জন্য প্রযোজ্য। রূপক ভাষা: কোরআন রূপক ভাষা ব্যবহার করে, যা একই সাথে আক্ষরিক এবং রূপক অর্থ বহন করে।

কিছু আয়াত আছে যা চিরন্তন সত্যের উপর আলোকপাত করে, যা সকল কালের জন্য প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ; তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতগুলো চিরন্তন সত্যের উপর আলোকপাত করে।

সূরা আল-ইমরানের ১২৬ নম্বর আয়াতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আর এই বিজয় কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী,

প্রজ্ঞাময়।" এই আয়াতটি বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল, তবে এর শিক্ষা সকল বিজয় এবং সাফল্যের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যে-কোনো বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং এতে তাঁর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়।

আবার কোরআনের সকল বিধান চিরস্থায়ী নয়। কিছু বিধান আছে যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা সমাজের জন্য প্রযোজ্য ছিল এবং যা পরবর্তীতে অন্য আয়াত নাযিলের মাধ্যমে রহিত বা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে, কোরআনের মৌলিক শিক্ষা ও নৈতিক নির্দেশাবলী চিরন্তন এবং সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

কোরআন আল্লাহর বাণী এবং এর বিধানগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়

১. কিছু বিধান যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল: কিছু বিধান ছিল যা তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল এবং পরবর্তীতে রহিত বা পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ; দাসপ্রথা বা কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন, বহুবিবাহ ইত্যাদি। এই বিধানগুলো তখনকার সমাজে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সেগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস পায়। যুদ্ধের সময়ে অনেক বিধান নাযিল হয়, যা আল্লাহ্ পরবর্তী অন্য আয়াত নাযিল করে তা রহিত করে। ওইসব তৎকালীন মানুষের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল।

২. কিছু বিধান যা চিরন্তন ও শাশ্বত: এই বিধানগুলোতে আল্লাহর একত্ববাদ, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, জিহাদ, পরোপকারিতা এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য এবং মুসলিম সমাজে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এটা স্পষ্ট যে, কোরআনের সকল বিধান একই প্রকৃতির নয়। কিছু বিধান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত বা রহিত হয়েছে, তবে এর মৌলিক শিক্ষা ও নৈতিক নির্দেশাবলী চিরন্তন। তাই এখানে একক কোনো ঘটনাকে সেইভাবে তথা সরল ব্যাখ্যা করে নেওয়ার সুযোগ নেই।

কোরআনের পুনরাবৃত্তি- অলংকার, শিক্ষা ও ঈমানী অভিঘাত

কোরআন শুধু একটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয়, কোরআন একই সঙ্গে ইতিহাস, নৈতিকতা, সমাজনীতি ও সাহিত্যচেতনার এক অনন্য নিদর্শন। এ মহাগ্রন্থে কিছু বিষয় এমনভাবে বারবার এসেছে– কখনো হুবহু ভাষায়, আবার কখনো অর্থের পুনরাবৃত্তি হিসেবে, যা মানুষের মনে এক গভীর অভিঘাত তৈরি করে। অনেক সময় প্রশ্ন উঠে, কেন কোরআনে কোনো ঘটনাকে বারবার পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে? কেন একই ঘটনা বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে? একটা সূরাতে কেন একটা

ঘটনা বলা হয়নি? এক সূরাতে এতগুলো ঘটনা কেন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা আবিষ্কার করি, কোরআনের পুনরাবৃত্তি শুধু অলংকার নয়, একটি শিক্ষাগত ও ঈমানী চেতনা-নির্মাণের প্রক্রিয়া। কোরআনের পুনরাবৃত্তি প্রধানত দুই রকম:

১. শব্দ বা বাক্যের হুবহু পুনরাবৃত্তি।

২. ঘটনা বা বক্তব্যের অর্থগত পুনরাবৃত্তি।

১. শব্দ বা বাক্যের হুবহু পুনরাবৃত্তি:

কোরআনে আমরা এমন আয়াত দেখি যা একাধিকবার হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়েছে, কখনো একই সূরায়, কখনো ভিন্ন সূরায়।

যেমন:

- "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" – সূরা আর-রহমানে ৩১ বার এসেছে।
- সুরা কাফিরুন-এ: "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" একই সূরার শেষে পুনরাবৃত্ত।

এর মাধ্যমে একটি চিন্তাধারার দৃঢ়তা ও মনস্তাত্ত্বিক গেঁথে যাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

২. অর্থগত পুনরাবৃত্তি:

একই ঘটনা, বিশেষত নবীদের কাহিনি, জালিম শাসক ইত্যাদি বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার এসেছে। এটার বিশেষ কারণ আছে। এখানে এসব পূর্ববর্তী ঘটনা এনে যেমন সাহস ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে, তেমনই আহলে কিতাবদের সত্য ধর্মের বার্তা দেওয়া হয়েছে। এসবের পুনরাবৃত্তির ব্যাপক অর্থ আছে।

কেন কোরআনে পুনরাবৃত্তি? উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

১. সাহিত্যিক অলংকার ও ভাষার সৌন্দর্য:

আরবি ভাষায় 'তাকরার' একটি শক্তিশালী অলংকার। সাহিত্যিক দিক থেকে এটা শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখে এবং অর্থকে গাঢ় করে তোলে। যেমন: "সাবর বা সবুর করো" অথবা "তোমরা সফলকাম হবে"– এসব বাক্য বারবার এসে পাঠককে ইতিবাচক বার্তা দেয়।

২. ভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ব্যাখ্যা:

একই কাহিনি যেমন মূসা (আ.)-এর ঘটনা, কখনো বনী ইসরায়েলের অবাধ্যতা দেখাতে, আবার কখনো রাসূলুল্লাহর সাহসকে উজ্জীবিত করতে এসেছে। এতে প্রতিটি পুনরাবৃত্তি হয় এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে।

৩. চেতনার গাঁথুনি ও হৃদয়জগতকে আন্দোলিত করা:

আল্লাহ্ বলেন, "আমি কোরআনে বারবার তাদের জন্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছি যেন তারা অনুধাবন করে"[১]

এটা এমন নয় যে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি– বলা যেতে পারে প্রতিটি পুনরাবৃত্তি একটি নতুন আবেগ তৈরি করে।

৪. একটি চূড়ান্ত সত্য প্রতিষ্ঠা:

যেমন তাওহীদ, আখিরাত, নবুয়্যত, ন্যায়বিচার– এসব এমন মৌলিক বিষয়, যেগুলো বারবার বলা হয় যেন তা উম্মাহর হৃদয়ে গেঁথে যায় এবং অজুহাত দেওয়ার অবকাশ না থাকে।

আরবি অলংকার শাস্ত্রে পুনরাবৃত্তির অবস্থান

আরবি বালাগাহ বা অলংকারশাস্ত্রে 'তাকরার' (Repetition), 'তাবাক' (বিপরীত শব্দ), 'জিনাস' (ধ্বনিগত মিল), 'মুজানাসা' (সমান্তরালতা)– এসবকে কাব্যিক রূপ দেওয়া হয়। সুরা আর-রহমান, ইয়াসিন, কাহাফ ইত্যাদি সূরাগুলোতে এই শিল্প নিপুণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঠের প্রতিফলন

আধুনিক পাঠক অনেক সময় ভাবতে পারেন, কেন এক ঘটনাই এতবার বলা হলো? আসলে, কোরআন শুধু তথ্যবহুল বা নির্দিষ্ট জাতির ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। এটা একটি হৃদয় স্পর্শকারী, চিন্তা-উদ্দীপক ও আত্মার ঝাঁকি দেওয়া গ্রন্থ। তাই এর পুনরাবৃত্তি শুধুই নয় বাঞ্ছনীয়।

কোরআনের পুনরাবৃত্তি একটি আধ্যাত্মিক, ভাষিক ও দার্শনিক কৌশল। যার মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়, চিন্তা ও চরিত্রে ছাপ ফেলে দেওয়া হয়। কখনো হুবহু বাক্য, কখনো

---

১. সূরা কাহফ, আয়াত ৫৪

ভিন্ন উপস্থাপনা। তবে, প্রতিবারই দেয় এক নতুন বার্তা। তাই পুনরাবৃত্তি নয়, প্রতিবার পাঠই এক নতুন উচ্চারণ।

কোরআন বলে: "আমি কোরআনকে সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য– তবে কেউ কি শিক্ষা নেবে?"[১]

অর্থাৎ সূরা আল-ক্বামারের ১৭, ২২, ৩২, ও ৪০ নম্বর আয়াতে একই আয়াত, "وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ" (ওয়ালাক্বদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিজজিকরি ফা হাল মিন মুদদাক্বির)- যার অর্থ, "আর অবশ্যই আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব; কেউ কি আছে যে উপদেশ গ্রহণ করবে?"

সূরা আল-ক্বামার (৫৪)-এর এই চারটি আয়াতে একই বার্তা বারবার দেওয়া হয়েছে। সূরা আল-ক্বামার ১৭ নম্বর আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা ২২, ৩২ ও ৪০ নম্বর আয়াতে একইভাবে বলা হয়েছে। এই আয়াতটি চারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে, যা কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও উপলব্ধির গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এই পুনরাবৃত্তি কেরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও উপলব্ধিকে সহজ করার জন্য করা হয়েছে।

আয়াতটি চারবার বলা হয়েছে– শুধু মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য নয়, প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য। এ বিষয়ে আরও আলোচনা জরুরি। তা না করলে পাঠক বুঝতে পারবে না যে, কোরআনের আয়াত কেন একক জায়গায়, একক ঘটনায় সীমাবদ্ধ নয়? কেন কোরআনের কোনো আয়াতকে একটা সরল ঘটনা দিয়ে, তা গ্রহণ করে চুপ থাকা যাবে না? কেন বোঝা ও ব্যাখ্যার দরকার আছে? উক্ত আয়াত ওই সময়, নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নাযিল হলেও, কেন সেই আয়াত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে সংপৃক্ত? আসুন আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আদম (আ.)-এর কাহিনির পুনরাবৃত্তি—কোরআনের অলংকার ও অন্তর্নিহিত শিক্ষা:

আদম (আ.) পৃথিবীর প্রথম মানব, আমাদের আদি পিতা ও আল্লাহর একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী। তাঁর সৃষ্টি, শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ, জান্নাত থেকে অবরোহন, আর সন্তানের ইতিহাস– এসব বিষয় কোরআনে একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু

১. সূরা আল-ক্বামার,আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০

আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রতিবার তাঁর কাহিনি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে, নতুন কোনো শিক্ষণীয় বিষয় যুক্ত হয়েছে।

এখানে আমরা কোরআনের তিনটি সূরায় আদম (আ.)-এর কাহিনির বিশ্লেষণ করব– যার মাধ্যমে কোরআনের অলংকারশৈলী ও শিক্ষাগত কৌশল স্পষ্ট হবে।

১. সুরা আলে ইমরান [৩:৫৯]: ঈসা (আ.) ও আদম (আ.)-এর তুলনা

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো, তিঁনি তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।"[১]

এই আয়াতে আদম (আ.)-এর সৃষ্টিগত দিক তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ছিলেন নিছক মাটি, কোনো পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্ট। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা খ্রিষ্টানদের ভুল ধারণা খণ্ডন করেছেন, যারা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করত।

আদম (আ.)-এর মতোই ঈসা (আ.)। আল্লাহর আদেশেই সৃষ্টিকর্ম সংঘটিত হয়। অতএব; অলৌকিক সৃষ্টি কখনো ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নয়। অর্থাৎ, আদম (আ.)-কে আমার 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন' পিতা-মাতা ছাড়া সৃজন করেছিলেন, অনুরূপ মারিয়ামের গর্ভে আমার 'রাব্বে কারীম' ঈসা (আ.)-কে দিয়েছিলেন, পিতা ছাড়াই জন্ম দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছে করলে সব পারেন। পিতা ছাড়া জন্ম মানে এই নয় যে, সে ঈশ্বরের পুত্র।

২. সূরা আল-আ'রাফ [৭:১১-১৩]: অহংকারের শাস্তি ও প্রথম অবাধ্যতা:

এই অংশে কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইবলিসের অহংকার ও তার সিজদা না করার পেছনের দম্ভ।

"আমি আগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছি, আর সে কাদামাটি থেকে!" -[৭:১২]

আল্লাহ্ বলেন: "তোমার এ অধিকার নেই যে, তুমি এখানে অহংকার করবে। বের হও, নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।" [৭:১৩]

পাপের প্রথম রূপ ছিল অহংকার। এটা শুধু ইবলিসের নয়, এসব মানুষের মধ্যেও প্রবাহিত এক ভয়ংকর আত্মঘাতী বিষ। আল্লাহর দরবারে সৃষ্টিগত বৈষম্যের যুক্তি চলে না। এখানে চলছে আজ্ঞাবহতার মানদণ্ড।

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯

৩. সূরা আল-ইসরা [১৭:৬১-৬২]: প্রতিশ্রুত পথভ্রষ্টতা ও কেয়ামতের আগাম চিত্র:

এই আয়াতে আদম (আ.)-এর প্রতি ইবলিসের বিদ্বেষ নতুন এক মাত্রা পায়।

"যদি আপনি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেন, আমি অবশ্যই তার বংশধরদের বেশিরভাগকেই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।" -[১৭:৬২]

এখানে ইবলিস দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্রের কথা ঘোষণা করছে। যেখানে আদমের (আ.) সন্তানদের ভেতরে প্রবেশ করে তাদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই অংশে দেখা যায়: শয়তান আদমের প্রতি তার হীনমন্যতা থেকে প্রতিশোধ নিতে চায়। আল্লাহর দেওয়া অবকাশকে সে নিজের জন্য এক যুদ্ধকালীন সময়সীমা ভাবছে। মানুষকে ধ্বংস করার আগ্রহ তার আত্মার রোগেরই বহিঃপ্রকাশ।

মানবজাতির বিরুদ্ধে ইবলিসের ষড়যন্ত্র সুদূরপ্রসারী। এই ষড়যন্ত্র শুধু আদমের বিরুদ্ধেই নয়, সমস্ত মানব সভ্যতার, বিশেষ করে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে।

পুনরাবৃত্তির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও কার্যকারণ

১. প্রসঙ্গ অনুযায়ী নতুন বার্তা:

একবার আদম (আ.)-এর তুলনা আনা হলো ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক জন্মের প্রেক্ষিতে। একবার তাঁর বিরুদ্ধচরিত্র ইবলিসের অহংকারকে শিক্ষা হিসেবে উপস্থাপন করা হলো। আবার একবার তাঁর সন্তানদের ধ্বংসে শয়তানের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করা হলো।

২. পাঠকের চেতনা নির্মাণ ও গভীর উপলব্ধি

পাঠকের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী একই কাহিনি বিভিন্নভাবে উপস্থাপন পাঠকের মনে নতুন নতুন ভাবনা জাগায়, চেতনা জাগিয়ে তোলে।

৩. সাহিত্যিক অলংকার হিসেবে পুনরাবৃত্তি

আরবি ভাষার অলংকারে 'তাকরার' বা পুনরাবৃত্তি একটি শক্তিশালী উপাদান। এটা অর্থ জোরদার করে, স্মরণযোগ্য করে তোলে এবং আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

আদম (আ.)-এর কাহিনির পুনরাবৃত্তি কোরআনের এক অমূল্য শিক্ষামূলক ও দার্শনিক দিক। এটা দেখায়— একই ঘটনা কীভাবে আলাদা প্রসঙ্গে ভিন্ন ব্যাখ্যা ধারণ

করতে পারে। এটা ভাষার অলংকার, চিন্তার বিকাশ এবং ঈমানী সংহতির জন্য অপরিহার্য উপায়।

কোরআন: ইতিহাস নয়, হেদায়াতের কিতাব

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন— কেন কোরআনে কোনো নবীর কাহিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় বলা হয়নি? একটা সূরাতে বললেই তো হতো! কেন বিভিন্ন সূরার একাধিক আয়াতে একই নবী, রাসূল, গোত্র, সম্প্রদায়, যুদ্ধ, শাসন এবং ঘটনা ইত্যাদি বলা হলো? কারণ কী? এক সূরাতে বলা হলো না কেন?

উত্তর খুব স্পষ্ট: কোরআন কোনো ইতিহাসের বই নয়। ইতিহাসেরর উপকরণ আছে, তবে তা কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয়। কোনো ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিকের লেখা গ্রন্থ– মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নয়। এটা হেদায়াতের কিতাব। যার উদ্দেশ্য মানুষকে সঠিক পথ দেখানো, কঠিন সময়ে শক্তি জোগানো। তাই যখনই রাসূল (সা.)-এর জীবনে কোনো সংকট বা চ্যালেঞ্জ এসেছে, কোরআনের একাংশে তখন সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনি অবতারণা করা হয়েছে, যাতে তাঁর হৃদয় সুদৃঢ় হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

"কাফিররা বলে, 'তাঁর উপর পুরো কোরআন একসাথে কেন নাযিল করা হলো না?' এটা এজন্য যে, আমি এর মাধ্যমে তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করব। আর আমি তা আবৃত্তি করেছি ধীরে ধীরে।" [সূরা ফুরকান,আয়াত ৩২]

অর্থাৎ কাফেরদের প্রশ্ন: কাফেররা প্রশ্ন করে যে, কেন কোরআন একটি কিতাব আকারে সম্পূর্ণ একসাথে নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে?

আল্লাহর উত্তর: আল্লাহ তায়ালা এর উত্তরে বলেন যে, কোরআনকে ধীরে ধীরে নাযিল করার কারণ হলো, এটা নবীর (সা.) হৃদয়কে সুসংহত করবে এবং ধীরে ধীরে পাঠ করার মাধ্যমে এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

শব্দ বা আয়াতের পুনরাবৃত্তি: একটি অলংকার

আরবি ভাষায় 'তাকরার' অর্থাৎ শব্দ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক কৌশল। এটা সাধারণত কোনো বিষয়কে জোরদারভাবে উপস্থাপন করতে, স্পষ্টভাবে আলাদা করতে বা একটি বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, সুরা কাফিরুনে আল্লাহ বলেন:

لَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি)– এই বাক্যটি দুইবার এসেছে। কেন?

কারণ; কাফেরদের উপাস্য যেমন ছিল পরিবর্তনশীল, তেমনি তাদের ইবাদত পদ্ধতিও ছিল অনিশ্চিত। আর রাসূল ﷺ-এর উপাস্য ছিলেন চিরস্থায়ী এক আল্লাহ, যার ইবাদতে কোনো আপস নেই, পরিবর্তন নেই। এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি সেই তফাৎকে নিশ্চিত ও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

"আমি তাঁর ইবাদত করি না, যার ইবাদাত তোমরা করো।"

সারা দুনিয়ার কাফের মুশরিকরা যেসব বাতিল উপাস্যের উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করত বা করে– সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

কোরআনের প্রতিটি পুনরাবৃত্তি সুপরিকল্পিত, অর্থবহ এবং গভীর প্রজ্ঞার ফল। এটা পাঠকের হৃদয়ে অর্থ বদ্ধমূল করে, চিন্তা জাগায় এবং ঈমান দৃঢ় করে। কোনো আয়াত বা শব্দ কেবল পুনরাবৃত্তির জন্য পুনরাবৃত্তি হয়নি। প্রতিটি অংশের পেছনে রয়েছে হেদায়াত, নির্ভুল জ্ঞান এবং অপার কৌশল।

আল্লাহর কিতাবে একটি শব্দও অনর্থক নয়। প্রতিটি আয়াত, শব্দ ও অক্ষরে রয়েছে নিদর্শন। তাই প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যাও একাধিক হতে পারে। উদ্দেশ্য আছে প্রতিটি আয়াতের। যদি তৎকালীন সময়ের জন্যই হতো এই মহাগ্রন্থ, তাহলে এভাবে কখনোই 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন' অবিকৃত করে সংরক্ষিত করে রাখতেন না। কখনও মনে প্রশ্ন জাগে না– পৃথিবীতে এমন কোন্ গ্রন্থ আছে, যে গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ-বর্ণ-বাক্য মানুষ নির্ভুল মুখস্থ রাখতে পারে? কীভাবে ত্রিশ পারার প্রতিটি লাইন একজন হাফেজ না দেখে বলতে পারে?

অক্ষরজ্ঞানহীনও অন্যের মুখে শুনে শুদ্ধ করে কোরআনের সূরা বলতে পারে। কোরআন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে মানুষের কলভে, যা কখনোই বিকৃত ও ধ্বংস হবে না। এমন করে রাখার কি কোনোই উদ্দেশ্য নেই? প্রায় দেড় হজার বছর আগের বিধান, ঘটনা, ভবিষ্যদ্বাণী যদি শুধু নিদিষ্ট সরল বর্ণিত ঘটনার মতোই হতো, যদি সাদৃশ্যকরণই হতো– তাহলে এভাবে কোরআনকে রাখা হতো বলে আমার মনে হয় না। 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন' এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবগত আছেন। আমার মতো নাদানের এটা বোঝা সম্ভব না। ধারণা করতে পারি শুধু। ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি আয়াতের অসংখ্য দিক আছে, যে যেমন দেখবে তেমনই বের হবে। কোরআনে

অজ্ঞতার সুযোগ নেই। অপব্যাখ্যাও করা যাবে না। বাহ্যিক ও আত্মিক, চর্মচক্ষু ও অন্তর্দৃষ্টি– উভয় দিয়ে চিন্তা করতে হবে যেমন, তেমনই দেখতে হবে। তবেই কিছু পাওয়া যেতে পারে।

এই মহাগ্রন্থ শুধু আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয়; একে পাঠ করলে পাঠক অবলোকন করেন শব্দের এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্য-সুষমা, যার প্রতিটি শব্দ একেকটি দীপ্তিমান তারা হয়ে হৃদয়ের গহ্বরে আলোক বর্ষণ করে।

তবে, এই পবিত্র কিতাবের ভাষা শুধু অলঙ্কারিক নয়, পরিসংখ্যানের দিক থেকেও এক বিস্ময়। অনেক গবেষকের শ্রমসাধ্য পর্যালোচনায় উঠে এসেছে– পুরো কোরআনে রয়েছে মোট ৭৭,৪৭৬টি শব্দ। তবে, এ সংখ্যা নির্ভর করে কোন পদ্ধতিতে শব্দ গণনা করা হয়েছে তার উপর। অনেক গবেষক শুধু মূল শব্দ অর্থাৎ 'ইসম' (বিশেষ্য) ও 'ফেয়েল' (ক্রিয়া) যুক্ত করেছেন, 'হরফ' (অব্যয় পদ)– যেমন: 'লা', 'ওয়া', 'ফা' ইত্যাদি গণনায় আনেননি। এমন অসংখ্য গবেষণা আছে। তাদের শব্দ গণনার নিয়মও ভিন্ন। বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন শব্দসংখ্যা দেখানো হয়েছে। যে বা যারা যেভাবে গণনা করেছে, সেভাবেই সংখ্যা নির্ণয় হয়েছে। তাই এখানে সংখ্যা যাই থাকুক, গণনা পদ্ধতি ভিন্ন হবার দরুন কেউই ভুল নয়। তাদের দিক থেকে তারা সবাই সঠিক। আমি এখানে জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণাপত্রের সংখ্যাকে উপজীব্য করেছি।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শব্দসংখ্যা:

- সর্বোচ্চ শব্দযুক্ত সূরা: সূরা আল-বাকারা– ৬,১২০টি শব্দ।
- সর্বনিম্ন শব্দযুক্ত সূরা: সূরা আল-কাউসার – মাত্র ১০টি শব্দ।

কিছু পরিসংখ্যানগত অন্তর্দৃষ্টি:

- এক হাজারের অধিক শব্দযুক্ত সূরার সংখ্যা: ২৫টি। এদের মধ্যে প্রধানত মক্কি সূরাগুলো দীর্ঘ এবং ভাষাগতভাবে সমৃদ্ধ।
- সবচেয়ে বেশি শব্দসংখ্যা বিশিষ্ট সূরাগুলো:
  - সূরা বাকারা (৬১২০)।
  - সূরা আন-নিসা (৩৭৪৭)।
  - সূরা আলে ইমরান (৩৪৮২)।
  - সূরা আল-আ'রাফ (৩৩২৪)।
  - সূরা আল-আন'আম (৩০৫১)।

- সংক্ষিপ্ততম সূরাগুলো:
  - সূরা আল-কাউসার (১০)।
  - সূরা আল-আসর (১৪)।
  - সূরা আল-ইখলাস (১৫)।
  - সূরা কুরাইশ (১৭)।
  - সূরা আন-নাসর (১৯)।

ভাষিক ব্যাখ্যা

এই তালিকায় শব্দের গাণিতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, বৃহৎ সূরাগুলোর ভাষাতত্ত্ব, তর্ক, যুক্তি, ইতিহাস এবং শরীয়তের বিধানের বিশদ ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র সূরাগুলো হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করে এমন ভাবগম্ভীরতা ও অর্থবহ শব্দে সমৃদ্ধ যা শিশু, নারী, বৃদ্ধ সকল শ্রেণির পাঠকের জন্য হৃদয়গ্রাহী।

গবেষণা ও তথ্যের ভিন্নতা

কোরআনের শব্দসংখ্যা নির্ধারণে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করায় বিভিন্ন উৎসে পরিসংখ্যানিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। পূর্বেই বলেছি– অনেক গবেষক হরফ (অব্যয় পদ) যেমন: 'ওয়া', 'লা', 'ইন্না' ইত্যাদি বাদ দিয়ে মূল শব্দ (Content Words) গণনা করেন। এই নিবন্ধে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলো মূলত ইসম (Special Noun) এবং ফেয়েল (Verb) ভিত্তিক।

আল-কোরআনের প্রতিটি শব্দ শুধু ধর্মীয় বিধান নয়, একটি চিরন্তন সত্য, একটি প্রজ্ঞা, একটি প্রার্থনা। তার প্রতিটি শব্দ যেন স্বয়ং আল্লাহর ভাষার সুরে গাঁথা এক ঐশী জ্যোতি।

"তোমাদের কাছে এক আলো ও এক সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে"।[১]

অর্থাৎ, "হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট আমার (এই) রাসূল এসে পড়েছে, যে (তাওরাত ও ইঞ্জিল) গ্রন্থের এমন বহু কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে, যা তোমরা গোপন কর এবং অনেক বিষয় এড়িয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব এসেছে, যা (সত্যকে) সুস্পষ্ট করে।"

---

১. সূরা আল-মায়েদাহ্,আয়াত ১৫

অতএব; শব্দসংখ্যার এই গাণিতিক পর্যালোচনা শুধু সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুশীলন নয়, তা এক আন্তরিক উপলব্ধি, কোরআনের প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য প্রকাশ।

আল-কোরআন এমন এক মহাগ্রন্থ, যার প্রতিটি আয়াত বহুমাত্রিক তাৎপর্য বহন করে, আর প্রতিটি শব্দ পরিপূর্ণভাবে অভিসন্ধিপূর্ণ।

কোরআনের কোনো আয়াতকে শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ হিসেবে দেখলে তার প্রকৃত তাৎপর্য ও শক্তিকে সীমাবদ্ধ করা হয়। অনেক আয়াত রয়েছে যা কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নাযিল হলেও, তার তাৎপর্য প্রযোজ্য সর্বকালের জন্য। আবার কিছু আয়াত এমনও আছে, যেগুলো নির্দিষ্ট ঘটনা বা সময়ের পটভূমিতে কার্যকর ছিল, তবে সেগুলোর ব্যাখ্যা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ভিন্ন অর্থ ও প্রজ্ঞা নিয়ে ফিরে আসে।

উদাহরণস্বরূপ: জিহাদের আয়াতগুলো অনেক সময় যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলেও এগুলো চিরন্তন আত্মরক্ষার নীতিকে বহন করে। আবার কিছু আয়াত এমন আছে যেগুলো নবী (সা.)-এর যুগে কোনো সমস্যা সমাধানে নাযিল হয়, কিন্তু সে সমস্যার রূপান্তর হলে আয়াতের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাও পরিবর্তিত হতে পারে।

এটা বুঝতেই হবে– কোরআনের উদ্দেশ্য একক ঘটনার সরল বা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়, এর আয়াতগুলো বহুস্তর বিশিষ্ট, প্রতিটি প্রজন্ম তার প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে হেদায়াত আহরণ করতে পারে। বিরাট ভূমিকা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। একটা আয়াতের অর্থ বের করতে যেয়ে তথা উক্ত আয়াত যে তদানীন্তনকালের জন্য প্রযোজ্য নয়, তার অবতারণা করতে যেয়ে বিরাট হয়ে গেল। এপর্যায়ে রেখে আসা মূল বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

একই ঘটনা, ভিন্ন আলোকে উপস্থাপন: ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইন

কোরআনে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে মূলত দুটি স্থানে আলোচনা করা হয়েছে– সূরা কাহফে যুলকারনাইন-কর্তৃক তাদের নিয়ন্ত্রণের বর্ণনা এবং সূরা আম্বিয়ায় তাদের চূড়ান্ত মুক্তির ইঙ্গিত।

১. সূরা কাহফ [১৮:৮৩–৯৮]: ঐতিহাসিক বর্ণনা ও প্রতিরোধ

এখানে যুলকারনাইনের ভ্রমণের তিনটি দিক বর্ণনা করা হয়েছে। এক পর্যায়ে তিনি এক জাতির মুখোমুখি হন যারা অভিযোগ করে যে ইয়াজুজ ও মাজুজ ধ্বংসাত্মক জাতি। তারা দুনিয়ায় 'ফ্যাসাদ' সৃষ্টি করে, চাষাবাদ, শান্তি ও সভ্যতা ধ্বংস করে।

"তারা বলল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে; আপনি কি তাদের ও আমাদের মাঝে এক প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?" [১৮:৯৪]

তখন যুলকারনাইন তাদের জন্য লোহা ও তামা দ্বারা একটি বিশাল প্রতিবন্ধক তৈরি করেন– যা ঐ সময়ের জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই আয়াতগুলো থেকে বলা যেতেই পারে, এই জাতি কেবল কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় বা ভয়ংকর প্রথাগত ডাকাতের দল নয়, তারা একটি রাজনৈতিক-সামরিক বা সভ্যতাবিনাশী শক্তি, যাদের কর্মকাণ্ড এমন যে তাদেরকে অস্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

২. সূরা আম্বিয়া [২১:৯৬-৯৭]: চূড়ান্ত মুক্তি ও ফিতনার সময়কাল

"যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তারা সব উচ্চ স্থান হতে ধেয়ে আসবে।"

"তখন সত্য প্রতিশ্রুতি (আখিরুজ্জামান) পূর্ণ হবে এবং কাফিরদের চোখ হতবাক হয়ে যাবে..."

এই আয়াতে কেয়ামতের প্রাক্কালে ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এর আগে তাদের সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল এবং মুক্তি ঘটার পরে তারা বিশ্বে এমন ভয়াবহ অস্থিরতা সৃষ্টি করবে যা শুধু ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ.)-এর যুগে দমন করা সম্ভব হবে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র

যুলকারনাইন যখন প্রাচীর নির্মাণ করেন, তখন তিনি বলেন:

"এটা আমার রবের রহমত, আর যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি এসে যাবে, তখন তিনি এটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন।" [১৮:৯৮]

অর্থাৎ, এটা কোনো চিরস্থায়ী সমাধান নয়, বলা যায় এক সাময়িক-ব্যবস্থা। কিন্তু সেই প্রতিরোধ ভেঙে যাওয়ার পর যে সময় আসবে, সেটা হবে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর বৈশ্বিক সংকট। তাই মনে করি, ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু আদিম বর্বর জাতি নয়, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় প্রযুক্তি নির্ভর, আক্রমণাত্মক, কুফরি সভ্যতার প্রতীক– যারা মানবতা, প্রকৃতি, বিশ্বাস এবং নৈতিকতা ধ্বংসে লিপ্ত।

তারা বিশ্বে এমন এক জিনগত (genetic), তথ্যগত (informational) ও অর্থনৈতিক (financial) আগ্রাসন চালাচ্ছে যার প্রতিফল আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি। তারা হচ্ছে এমন এক শক্তি-সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি, যারা উচ্চ স্থান থেকে ধেয়ে আসবে অর্থাৎ স্যাটেলাইট, এয়ার ডোমিন্যান্স, মিডিয়া ও তথ্যনিয়ন্ত্রণ-এর মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে একটি একক শাসনের দিকে নিয়ে যেতে চায়।

আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা: কালোত্তীর্ণ কিন্তু প্রেক্ষাপটভিত্তিক

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বোঝা জরুরি, যা ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনের কোনো আয়াতকে চিরস্থায়ী বা শুধুই অস্থায়ী বলা ঠিক নয়। অনেক সময় একই আয়াত একাধিক পর্যায়ে বিভিন্ন অর্থ বহন করে: একটি নির্দিষ্ট সময়ের সমস্যা সমাধান, ভবিষ্যৎ সময়ের সংকেত এবং নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ স্থাপন।

উদাহরণত; ইবলিস ও আদমের কাহিনি (সূরা আ'রাফ, সুরা কাহাফ, সূরা ইসরা) ভিন্ন ভিন্ন দিক তুলে ধরে: একদিকে অহংকারের পরিণতি, অন্যদিকে পরিকল্পিত প্রতিশোধ, সর্বশেষ জ্বিন ও মানুষের দ্বন্দ্বের নীতিগত কাঠামো।

ঠিক একইভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের ঘটনাবলি বর্তমানের নতুন বিশ্বব্যবস্থার আগমন, নিও-ইম্পেরিয়ালিজম, তথ্য-যুদ্ধ ও জেনেটিক ফিতনার সাথে যুক্ত। সুতরাং, কোরআন যুগের সাথে পুনর্জীবিত হয় না, যুগ তার কাছে উন্মোচিত হয়।

কোরআনের আয়াত কোনো আবদ্ধ অর্থের পাত্র নয়। কোরআন জীবন্ত, চলমান এবং প্রতিটি সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক। একই আয়াত ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্ন বার্তা বহন করে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন শিক্ষা দেয়।

ইয়াজুজ-মাজুজের বর্ণনা হোক বা যুলকারনাইনের সুশাসনের দৃষ্টান্ত, সবই আমাদের জন্য আজও জাগ্রত, প্রাসঙ্গিক এবং চিন্তার গভীরে আলোড়ন তোলার মতো।

মূল তত্ত্ব: কোরআনের আয়াত বহুমাত্রিক, কাহিনিগুলো তাত্ত্বিক দিকনির্দেশনা দেয়, পুনরাবৃত্তি কোনো দুর্বলতা নয়, এক সাহিত্যিক অলংকার ও বার্তাবহ অস্ত্র এবং সবচেয়ে বড় কথা– কোরআন একটি চিরন্তন জীবন্ত গ্রন্থ, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য হেদায়াত হয়ে থাকবে।

পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লামা ইকবাল ও শায়খ ইমরান নযর হোসেনের তত্ত্ব জানা যাক

কেয়ামতের অন্যতম প্রধান আলামত হিসেবে ইয়াজুজ-মাজুজ এক রহস্যময় এবং শক্তিশালী জাতির আগমন, যা মুসলিম উম্মাহর কাছে চিরকাল আলোচনার বিষয়। কোরআন ও হাদীসে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকলেও, আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তাদের আগমন ও প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন স্কলাররা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল ও শায়খ ইমরান নযর হোসেনের মতো চিন্তাবিদরা এই বিষয়টি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন, যা প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। যদিও বিতর্কিত বিশ্বময়, এজন্য আগের পাতায় আমি তাদের তত্ত্ব ও এই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেছি। এবার সবিস্তারে জানা যাক।

বর্ণনা মতে, ইয়াজুজ-মাজুজ হলো হযরত নূহ (আ.)-এর বংশোদ্ভূত দুটি জাতি, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে পারদর্শী। পবিত্র কোরআনের সূরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ যুলকারনাইন জনৈক জাতির অনুরোধে লোহার পাত ও গলিত তামা ব্যবহার করে তাদের জন্য একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। এই প্রাচীর তাদের আটকে রেখেছিল, যেন তারা পৃথিবীর বুকে ফেতনা ছড়াতে না পারে।

আল্লামা ইকবালের প্রতীকী ব্যাখ্যা:

আল্লামা ইকবাল, ইয়াজুজ-মাজুজকে শুধু একটি ঐতিহাসিক বা ভবিষ্যৎ জাতি হিসেবে দেখেননি। তার গভীর উপলব্ধি ছিল যে, ইয়াজুজ-মাজুজ একটি বিশেষ মানসিকতা বা বিশ্বব্যবস্থার প্রতীক। তিনিই সম্ভবত পৃথিবীতে প্রথম, যিনি ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে এমন তত্ত্ব প্রকাশ করেন। যা অবিশ্বাস্যভাবে আজ দৃশ্যমান হয়েছে ও হচ্ছে।

১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে ইউরোপীয় ক্রুসেডার শক্তি, বিশেষ করে ব্রিটিশ বাহিনী, দীর্ঘ ৭০০ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে জেরুজালেম দখল করে। এই ঘটনা মুসলিম বিশ্বে এক গভীর ধাক্কা আনে। ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই আল্লামা ইকবাল তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'বাং-ই-দারা'-এর 'যরিফানা' অধ্যায়ে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবিতার চরণ রচনা করেন। তিনি লিখেছিলেন:

کھُل گئے، یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشمِ مسلم دیکھ لے تفسیرِ حرفِ یَنسِلُون

[বাং-ই-দারা, যরিফানা: ২৩]

বাংলা অর্থে: "ইয়াজুজ ও মাজুজের দলবল এখন উন্মুক্ত, হে মুসলিম! 'ইয়ানসিলুন' শব্দের অর্থের ব্যাখ্যা এখন তোমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে।"

আল্লামা ইকবাল এই চরণে কোরআনের একটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লামা ইকবালের এই কবিতার সূত্র হলো কোরআনের সূরা আল-আম্বিয়া [২১:৯৫-৯৬]-এর আয়াত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা জেরুজালেম, ইসরায়েল ও ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (৯৫) حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ(৯৬)

"যে নগরীকে (অর্থাৎ জেরুজালেম) আমরা ধ্বংস করেছি, সেই নগরীর অধিবাসীরা আর সেখানে ফিরতে পারবে না যতক্ষণ না ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) পৃথিবীর প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়বে।"

এখানে "يَنسِلُونَ (ইয়ানসিলুন)" শব্দের অর্থ হলো, "তারা দ্রুত বেরিয়ে আসবে, দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং বৈশ্বিক আধিপত্য বিস্তার করবে।"

আল্লামা ইকবাল এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্ব-ব্যবস্থা বাস্তবে শুরু হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের চোখের সামনে ঘটমান ঘটনাই তার প্রমাণ।

১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণা এবং ব্রিটিশ সেনাদের হাতে জেরুজালেম পতনের মাধ্যমে ইহুদী-খ্রিষ্টান জোটের হাতে মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এ ঘটনার পর শুরু হয় এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যেখানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এবং পরবর্তীতে আমেরিকান সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব। এগুলো মিলিতভাবে মুসলিম বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তনের খেলা শুরু করে।এই শক্তিগুলোকেই আল্লামা ইকবাল রূপকভাবে 'ইয়াজুজ ও মাজুজ' বলেছেন।

হাদিসে বর্ণিত আছে— ইয়াজুজ-মাজুজ গ্যালিলি সাগর (Sea of Galilee) অতিক্রম করবে এবং এর সব পানি শেষ করে ফেলবে।

আল্লামা ইকবাল যাদের 'ইয়াজুজ-মাজুজ' বলেছেন, তারা কোনো পৌরাণিক জাতি নয়, একটি বিশ্বব্যাপী শক্তি কাঠামো– ইহুদী-খ্রিষ্টান জোটের প্রভাবে পরিচালিত পশ্চিমা সভ্যতা, ইসরায়েলী রাষ্ট্র, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ (Pax Americana) এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ (Pax Britannica)।

এই শক্তিগুলো আজও বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক ক্ষমতা এবং গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে আরব দেশগুলো, তাদের চাপের কাছে নত হয়েছে।

তবে ব্যতিক্রম কেবল সেইসব দেশ, যারা পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে। কিন্তু পশ্চিমা ব্লকের শক্তি, কূটনীতি ও সামরিক জোটের কারণে ইসরায়েলী স্বার্থ এখনো সুরক্ষিত রয়েছে।

আল্লামা ইকবালের কবিতা, কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী, ১৯১৭ সালের জেরুজালেম দখল এবং বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট একত্রে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়:

ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থা এখন বাস্তবতা, মুসলিম উম্মাহর জন্য এটা বড় এক সতর্কবার্তা এবং ইসরায়েলী রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের ভবিষ্যৎ কোরআন ও হাদীসে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা ইকবালের দৃষ্টি আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ তিনি মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান করেছিলেন ইয়াজুজ-মাজুজের ফাঁদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং কোরআনের আলোয় ইতিহাসকে নতুনভাবে বুঝতে।

তার 'তুলু-ই-ইসলাম' এবং 'খিজর-ই-রাহ' কবিতায় তিনি ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রসঙ্গ এনেছেন। আল্লামা ইকবাল সূরা আম্বিয়ার আয়াত ও বর্তমান বিশ্বের অশান্তির মধ্যে সরাসরি সংযোগ করেছেন। তার মতে, পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির বিস্তার, জিওপলিটিক্যাল প্রাধান্য এবং ইসরায়েলী রাষ্ট্রের উদ্ভব– সবই ইয়াজুজ-মাজুজীয় সভ্যতার প্রমাণ।

আল্লামা ইকবালকে বলতেই পারেন, ভ্রান্ত আকিদা লালন করত। এজন্য দানবীয় আকৃতির পাহাড়ে বন্দী রাক্ষস ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে এসব বলে গেছে বা বর্তমান বিশ্বকে মিলিয়েছে। সে আপনি তা বলতে পারেন। এপর্যায়ে সাম্প্রতিক ঘটনাতে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

গ্যালিলি সাগরের শুকিয়ে যাওয়া:

১. সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তথ্য:

২০২৫ সালের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানা গেছে যে, Sea of Galilee (Lake Kinneret)-এর পানি ঐতিহাসিকভাবে নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেছে। [ইসরায়েল ওয়াটার অথরিটি রিপোর্ট, মার্চ ২০২৫]

- পানি হ্রাস: ৪০%
- ইকোসিস্টেম ধসের ঝুঁকি: অত্যন্ত উচ্চ
- ২০২৩ সাল থেকে ইসরায়েল কৃত্রিমভাবে মেডিটেরেনিয়ান থেকে ডেসালিনেটেড পানি পাম্প করছে।

২. কোরআনিক প্রেক্ষাপট:

কিছু তাফসিরকারক ও আল্লামা ইকবালের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, গ্যালিলি সাগরের শুকিয়ে যাওয়া ইয়াজুজ-মাজুজ ও ইসরায়েল পতনের অন্যতম লক্ষণ।

“ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার সময় গ্যালিলি সাগরের পানি তারা পান করবে, এমনকি শেষ দলটি এসে বলবে, ‘এখানে একসময় পানি ছিল।’”[১]

৩. ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (২০২৫):

গাজায় ইসরায়েলের চলমান গণহত্যার অভিযোগে জাতিসংঘের একাধিক রিপোর্টে ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। [UN OHCHR Report, July ২০২৫]:

- War Crimes: হ্যাঁ।
- Genocide: সম্ভাব্য।
- ICJ মামলা চলছে।

৪. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

সূরা ইসরা [১৭:৪-৭] অনুযায়ী, ইসরায়েলী জাতি দুইবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আল্লামা ইকবাল তার ‘খিজর-ই-রাহ’ কবিতায় বলেন: “ইহুদী সভ্যতা নিজ হাতে নিজের কবর খুঁড়ছে, কারণ সে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেছে।"

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭

৫. আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভক্তি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সংকট এবং চীন-রাশিয়া-ইরান অক্ষ ইসরায়েলের কৌশলগত অবস্থানকে বিপন্ন করেছে।

গ্যালিলি সাগরের সংকট ইয়াজুজ-মাজুজের যুগের সূচক হতে পারে। তার মতে, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা, তার বস্তুবাদী দর্শন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং সুদভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে এক ধরনের 'ইয়াজুজ-মাজুজ' মানসিকতার উন্মোচন করেছে। জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ এবং নারীর বাণিজ্যিকীকরণ– এই বিষয়গুলো আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে ছিল সেই ইয়াজুজ-মাজুজি শক্তির প্রকাশ, যা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও আধ্যাত্মিকতার জন্য হুমকি। তিনি মুসলিমদের চোখ খুলে আধুনিক বিশ্বের এই ফেতনাকে চিহ্নিত করতে বলেছিলেন, যা শুধু একটি ভৌগোলিক প্রাচীর ভাঙার চেয়েও গভীরতর।

শায়খ ইমরান নযর হোসেনের বিশ্লেষণ

শায়খ ইমরান নযর হোসেন ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট এবং সরাসরি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা বেশ বিতর্কিত। তার মতে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়েই খুলে গিয়েছিল এবং তারা কোনো ভবিষ্যৎ জাতি নয়, তারা বর্তমান বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলোই তাদের প্রতিনিধিত্ব শায়খ ইমরান গগ (Gog) এবং ম্যাগগ (Magog) এই দুটিকে যথাক্রমে অ্যাংলো-আমেরিকান-ইজরায়েলী জোট এবং রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন) বা রুশ জোটকে ইয়াজুজ-মাজুজ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে, তার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ পাতাতে সংশোধন করে তিনি বলেন– প্রথম সংস্করণে তাড়াহুড়ো করতে যেয়ে ভুল হয়ে গেছে। সংশোধন করে তিনি আবারও মতামত দিয়েছেন, উক্ত দুই চক্রের মধ্যেই ইয়াজুজ-মাজুজের উপস্থিত আছে। তারা আলাদা একটা ইয়াজুজ ও আরেকটা মাজুজ নয়। উভয় চক্রের মধ্যেই ইয়াজুজ-মাজুজের সরব উপস্থিত আছে।

তার যুক্তি হলো, এই শক্তিগুলোর বিশ্বব্যাপী আধিপত্য, রাজনৈতিক চালবাজি, অর্থনৈতিক শোষণ এবং মুসলিম দেশগুলোর উপর তাদের প্রভাব– এগুলোই হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসযজ্ঞের আধুনিক রূপ। তিনি খাযার ইহুদীদের ইয়াজুজ-মাজুজের বংশধর হিসেবে দেখেন, যারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং জেরুজালেমে তাদের ফিরে আসাকে ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তির

সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। তার মতে, সূরা আম্বিয়ার [৯৫-৯৬] আয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের (জেরুজালেম) লোকেরা ফিরে আসার আগে ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তির যে শর্ত, তা বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্রের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে।

তিনি তার বিশ্লেষণকে কোরআন, হাদীস, ইতিহাস এবং বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার সমন্বয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, যা অনেককেই নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

আল্লামা ইকবাল ও শায়খ ইমরান নযর হোসেনের ব্যাখ্যাগুলোকে নিছক কল্পনা বা বিদআত বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ। তবে তাদের বিশ্লেষণের মূল বার্তাটি হলো, কেয়ামতের আলামতগুলো কেবল অলৌকিক ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত নয়, এগুলোর মধ্যে কিছু প্রতীকী অর্থ এবং বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতাও থাকতে পারে।

যদি ইয়াজুজ-মাজুজকে শুধু একটি বর্বর এবং রূপকথার দৈত্য জাতি হিসেবে দেখা হয়, তাহলে মুসলিম উম্মাহ তাদের আগমনের জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে থাকবে। কিন্তু যদি তাদের আধুনিক বস্তুবাদী বিশ্বব্যবস্থা বা আগ্রাসী শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, তাহলে মুসলিমদের করণীয় হয়ে দাঁড়ায় ভিন্ন।

১. আধ্যাত্মিক জাগরণ: আল্লামা ইকবালের মতে, ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনা মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ। বস্তুবাদিতা, সুদভিত্তিক অর্থনীতি এবং নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য।

২. জ্ঞান ও গবেষণার গুরুত্ব: শায়খ ইমরানের বিশ্লেষণ মুসলিমদেরকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি এবং বিশ্বশক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করার তাগিদ দেয়। শত্রুকে চিনতে পারাই প্রতিরোধের প্রথম ধাপ।

৩. ঐক্য ও প্রতিরোধ: ইয়াজুজ-মাজুজের মূল চরিত্র হলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ধ্বংসযজ্ঞ। এই বিশৃঙ্খলা যখন আধুনিক রূপ নেয়, তখন মুসলিমদের উচিত নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৪. কোরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন: সর্বশেষে, সব ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষার দিকে ফিরে আসা অত্যাবশ্যক। কেয়ামতের আলামতগুলো আল্লাহর ওয়াদারই অংশ। তাই, মুসলমাদের উচিত আল্লাহর উপর

ভরসা রেখে নিজেদের ঈমানকে মজবুত করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথে জীবন পরিচালনা করা।

ইয়াজুজ-মাজুজের আগমনের নির্দিষ্ট সময় বা পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তাদের দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা যে মানবজাতির জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ফেতনা মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।

ইয়াজুজ-মাজুজ (Gog and Magog) এবং যুলকারনাইন (Dhu al-Qarnayn) নিয়ে আগের পাতাগুলোতে আপনি ইতোমধ্যে পড়েছেন। আবারও পুনরাবৃত্তি করব। একই বিষয় আবারও আনা হয়েছে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার জন্য একটা সামগ্রিক বিষয় বোঝানোর জন্য। আলোচনার প্রয়োজনে আগের কিছু আলাপ পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

কোরআন ও হাদীসে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইন

যুলকারনাইনের পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিক ও তাফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট মনে করেন, কেউ সাইরাস দ্য গ্রেটও মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক বাদশাহ বা নবী। কোরআন তাকে 'দুই শিং বিশিষ্ট' (যুলকারনাইন) হিসেবে বর্ণনা করে।

ইয়াজুজ-মাজুজ: ইয়াজুজ-মাজুজ এমন দুটি জাতি বা গোষ্ঠী, যাদের উৎপাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে যুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, কেয়ামতের পূর্বে তারা সেই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। হাদীসে তাদের সংখ্যাধিক্য এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তারা এতটাই প্রবল হবে যে, কোনো শক্তিই তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। অবশেষে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ধ্বংস করবেন।

ঐতিহ্যগতভাবে, ইয়াজুজ-মাজুজকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ দুটি মানবগোষ্ঠী হিসেবে দেখা হয়। তবে, আধুনিক পণ্ডিতরা এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

রূপক বনাম আক্ষরিক: ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যার পাশাপাশি আল্লামা ইকবাল এবং শায়খ ইমরান নযর হোসেনের মতো পণ্ডিতদের রূপক ব্যাখ্যাগুলো আজকের বিশ্বে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। যদি ইয়াজুজ-মাজুজকে শুধু শারীরিক জাতি হিসেবে দেখা

হয়, তবে তাদের উত্থানের কারণ ও প্রভাব বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে কতটা কার্যকর তা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এর পরিবর্তে, যদি তাদেরকে এমন এক শক্তি হিসেবে দেখা হয় যা নৈতিকতা ও ভারসাম্যকে ধ্বংস করে, তবে তা আধুনিক বিশ্বের সংকটগুলোকে ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হয়।

প্রাচীর: যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরকে শুধু একটি ভৌগোলিক প্রাচীর হিসেবে না দেখে অন্যভাবেও দেখা যায়। এই প্রাচীরের একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। কাদের বন্দী রাখা হয়েছে? কেন রাখা হয়েছিল, এদের অবস্থান কী? এসব নিয়েও আছে অসংখ্য স্কলারের থিসিস। জায়োনিস্ট গোত্রও হতে পারে ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি, ইহুদী আর খ্রিষ্টানও হতে পারে।

বিশ্বব্যবস্থার প্রভাব: আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন স্পষ্টতই দেখা যায়। এই শক্তিগুলো বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা তৈরি করছে, যেমনটি হাদীসে ইয়াজুজ-মাজুজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ: মিথ, বাস্তবতা ও ফেতনার প্রতিরোধ

১. দৈত্যাকার চেহারা, কান দিয়ে ঘুমানো– মিথ না সত্য?

ইয়াজুজ-মাজুজ বিষয়ে বহু মুসলিম সমাজে এক প্রকার কল্পজগৎ গড়ে উঠেছে। তাদের যেন বহু হাত, হাতির মতো কান, বিশালাকৃতি, বিশ্রী চেহারার কোনো অমানুষিক দানব জাতি– এইসব কাহিনি আসলে ইস্রাঈলিয়াত বা বাইবেলীয় রূপকথা থেকে মুসলিম হাদীস সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

কিছু প্রচলিত মিথ: তারা এতবড় যে এক কান বিছানার মতো পেতে আরেক কান দিয়ে নিজেদের ঢেকে ঘুমায়!, তাদের নাক থেকে আগুন বের হয়!, তারা প্রতি রাতে যুলকারনাইনের প্রাচীর খুঁড়ে ফেলে, বা জিহবা দিয়ে চাটে, কিন্তু সকালে সব আগের মতো হয়ে যায়!, তারা আকাশে তীর ছুড়ে বলে, "আমরা ঈশ্বরকে জয় করেছি"!

এসব বিশ্বাসের উৎস

তাবারী, কাব আল আহবার ও অন্যান্য প্রাক-ইসলামী ইহুদী-খ্রিষ্টান প্রভাবিত বর্ণনায় এগুলো পাওয়া যায়।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস, যেমন: ইবনে হাজার আল আসকালানি, ইমাম নববী, ইবনে কাসির– এসব বর্ণনাকে 'অবিশ্বস্ত', 'জাল', 'মিথ', 'ইস্রাঈলীয়' এবং 'অপ্রমাণিত' বলেছেন।

যুক্তিপূর্ণ অবস্থান

কোরআন বা সহীহ হাদীসে কোথাও দৈত্য, কান, চেহারা বা আকারের বিশেষ বর্ণনা নেই। বরং সূরা কাহফে স্পষ্ট বলা হয়েছে তারা মানুষেরই একটি জাতি, যারা সংখ্যা ও ধ্বংসের দিক থেকে ভয়ংকর।

২. ইয়াজুজ-মাজুজ ও ঐতিহাসিক জাতির সম্ভাব্য মেলবন্ধন

ইতিহাসবিৎ ও গবেষকরা বিভিন্ন সময়ে ইয়াজুজ-মাজুজকে নিচের জাতির সঙ্গে তুলনা করেছেন:

ক. তাতার ও মঙ্গোল জাতি (১২শ শতাব্দী): চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করা হয়েছিল। মুসলমানদের অনেকেই মনে করতেন– এরা বুঝি ইয়াজুজ-মাজুজ।

তবে এই জাতির ধ্বংস ও মুসলিম জাগরণ (মামলুক, সেলজুক) পরবর্তীকালে এটাকে আখিরুজ্জামানী ইয়াজুজ-মাজুজ নয় বলেই প্রমাণিত করে।

খ. খাযার জাতি: খাযাররা একসময় ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং অনেক গবেষক বিশ্বাস করেন– আজকের 'আশকেনাজি ইহুদী' গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ তারা।

তারা মধ্য-এশিয়ার দিকে বসবাস করত এবং কিছু ব্যাখ্যায় তাদের রাজনৈতিক/ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে ইয়াজুজ-মাজুজের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

তবে, এই ব্যাখ্যাগুলো ঐতিহাসিক যুক্তিনির্ভর হলেও সর্বজনস্বীকৃত নয়। কিন্তু কিছু বিষয় আছে, যা এই দাবীকে একভাবে প্রমাণ করে।

৩. ধ্বংস কীভাবে হবে? ঈসা (আ.)-এর ভূমিকা

সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে– ইয়াজুজ ও মাজুজ এমন এক ফেতনা হবে, যাদের ধ্বংস কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে। কোনো সেনাবাহিনী, কোনো অস্ত্র, বা কোনো রাজনৈতিক শক্তি তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না।

সহীহ মুসলিম থেকে বর্ণনা

ঈসা (আ.) যখন দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের বলবেন– "আমি এমন এক জাতিকে পাঠাচ্ছি, যাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কেউ লড়াই করতে পারবে না।"

তখন ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ চারপাশ ধ্বংস করে দেবে। সবকিছু খাবে, পানির উৎস শুকিয়ে ফেলবে।

ঈসা (আ.) দোয়া করবেন এবং আল্লাহ তাদের নাকে পোকা পাঠাবেন, ফলে তারা এক রাতে নিধন হবে।

এখানে স্পষ্ট যে– মানবজাতি বা সামরিক শক্তি নয়, বরং ঈশ্বরীয় হস্তক্ষেপেই ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

ইয়াজুজ ও মাজুজকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মিথ প্রচলিত রয়েছে, তা কোরআন ও সহীহ হাদীসসম্মত নয়। তারা মানুষ এবং তাদের প্রতিচ্ছবি আজকের দুনিয়ার বহু রাষ্ট্রীয় ও আদর্শিক কাঠামোয় বিদ্যমান।

তাদের ধ্বংস আল্লাহর পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে, তবে মুসলমানদের করণীয়– এই ফিতনার যুগে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি, চিন্তাগত প্রতিরোধ এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা।

ইয়াজুজ-মাজুজ: কোরআনের ভাষ্য, ভবিষ্যদ্বাণী ও আধুনিক তত্ত্ব

ইয়াজুজ ও মাজুজ– এই দুই রহস্যময় জাতি নিয়ে কোরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে, তা কেয়ামতের পূর্ববর্তী এক ভয়াবহ ফিতনার আভাস দেয়। এদের উদ্ভব, আচরণ, ভয়ংকর আগ্রাসন এবং আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত পরিণতি। সবকিছু মিলিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু অতীতের কোনো জাতি নয়, ভবিষ্যতের এক মহাবিপর্যয়ের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের নাম, বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস, কোরআনের আয়াত ও প্রাচীন কিতাবসমূহের আলোকে আমরা যদি বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করি, তবে স্পষ্ট হয় যে, এরা শুধু ইতিহাসের বিষয় নয়; এরা হলো ভবিষ্যতের এক ভয়ংকর বাস্তবতা।

নাম ও অর্থমূল্য: তরঙ্গের মতো ধেয়ে আসা জাতি

ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দুটি নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। কেউ বলেন, এগুলোর উৎপত্তি 'আজ্জা' ধাতু থেকে যার অর্থ 'আগুনের মতো দহনশীল'। আবার অনেকে বলেন, শব্দদুটি এসেছে আরবি 'মওজ' (موج) শব্দ থেকে যার অর্থ 'তরঙ্গ' বা 'ঢেউ'। এ যুক্তি অনুযায়ী, ইয়াজুজ-মাজুজ এমন জাতি যারা মহাসাগরের ঢেউয়ের মতো আচমকা বের হয়ে পড়বে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

এই অভিধা তাদের গতিশীলতা, সংখ্যা এবং ধ্বংসাত্মক আচরণের ইঙ্গিত দেয়। তারা ধর্ম, সভ্যতা, প্রকৃতি– সবকিছুকে গ্রাস করতে সক্ষম এমন এক বেপরোয়া জাতি, যাদের বিস্তার হবে তীব্র ও সর্বগ্রাসী।

উৎপত্তি ও পরিচয়: আদম সন্তানেরই একটি ধ্বংসাত্মক শাখা

হাদীস ও বাইবেলীয় সূত্রে স্পষ্ট হয় যে ইয়াজুজ-মাজুজ আদম (আ.)-এর বংশধর, তথা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা কোনো ফেরেশতা বা অতিপ্রাকৃত সত্তা নয়। সূরা কাহাফ (১৮:৯৪)-এ উল্লেখ আছে তারা এমন এক জাতি যারা বারবার সমাজে 'ফ্যাসাদ' সৃষ্টি করেছে। অনেকে বিশ্বাস করেন, তারা হচ্ছে জাপেট (Japheth)-এর বংশধর– যিনি হজরত নূহ (আ.)-এর পুত্র।

বাইবেলে, বিশেষত জেনেসিসের ১০ম অধ্যায়ে গগ এবং ম্যাগগ (Gog & Magog) নামে যে দুটি জাতির কথা বলা হয়েছে, ইসলামী তাফসিরবিদগণ তার সাথেই ইয়াজুজ-মাজুজকে চিহ্নিত করে থাকেন।

কোরআনের ভাষ্য: যুলকারনাইনের প্রাচীর ও তাদের আটকে পড়া

সূরা কাহাফে [১৮:৯৩-৯৮] ইয়াজুজ-মাজুজকে ঘিরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেদিনের মানুষ যুলকারনাইনকে অনুরোধ করে, যেন তাদের মাঝে ও ইয়াজুজ-মাজুজদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়, কারণ এরা সমাজে ভয়াবহ অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।

"...আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর তৈরি করব...তারা তা পার হতে পারবে না, আর ভেদ করতেও পারবে না।"[1]

এই প্রাচীরের প্রকৃতি ও অবস্থান নিয়ে বহু মত রয়েছে। কারও মতে এটা বর্তমান ককেশাস অঞ্চলে (Caucasus Mountains), আবার কারো মতে এটা চীনের গ্রেট ওয়ালের অংশ হতে পারে। কিন্তু কোরআনের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– এটা একটি জ্ঞান-ভিত্তিক, কৌশলগত ও কঠিন প্রকৌশল নির্মাণ যা এক পর্ব পর্যন্ত তাদের গতিপথ রুদ্ধ করে রেখেছে।

হাদীসের বর্ণনা: ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের আগে ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, তারা এত বিশাল সংখ্যায় থাকবে যে তাদের একটি দল একটি নদীর পানি পান করে শেষ করে ফেলবে, এমনকি যারা পরে আসবে তারা বলবে– "এখানে তো কোনো পানি ছিলই না!"

---

১. সূরা কাহাফ,আয়াত ৯৫-৯৭

তারা বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বলবে, "আমরা দুনিয়ার সব মানুষ হত্যা করেছি, এখন আকাশের সত্তাদের হত্যা করব।" তারপর তারা আকাশের দিকে তীর ছুঁড়বে, যা রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে। এটা হয়তো আত্মঘাতী অহংকার ও প্রযুক্তিগত উন্মাদনার রূপক হতে পারে। (এখানে কিছু সমস্যা আছে। বর্ণনাগত বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলাপ আছে।)

কিন্তু আল্লাহ ঈসা (আ.)-এর দোয়ার মাধ্যমে তাদের এক ঝটকায় ধ্বংস করবেন– তাদের ঘাড়ের পেছন থেকে একপ্রকার পোকা সৃষ্টি করে। এত অধিক সংখ্যক লাশ হবে যে পৃথিবী দুর্গন্ধে ভরে যাবে এবং তখন আল্লাহ আসমান থেকে বিশেষ প্রজাতির পাখি পাঠাবেন যারা তাদের দেহ সরিয়ে নিয়ে যাবে। এমনই বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন রেওয়াতে।

অর্থাৎ, হজরত ঈসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তার অনুসারীদের নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নেবেন। তারা এত ক্ষুধিত হবেন যে গরুর মাথা তাদের কাছে সোনা থেকেও মূল্যবান হবে। অতঃপর ঈসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা দোয়া করবেন, তখন আল্লাহ 'নাগাফ' নামক এক কীট পাঠিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজের কাঁধের পেছন থেকে তাদের ধ্বংস করবেন।

ভোর বেলায় দেখা যাবে তারা সবাই মৃত, যেন এক প্রাণেই মৃত্যু হয়েছে। এরপর পাখি এসে তাদের লাশ সরিয়ে নেবে।[১]

সূরা আম্বিয়া: তরঙ্গের মতো আগমন

"যখন ইয়াজুজ ও মাজুজ ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন তারা পর্বত থেকে তরঙ্গের মতো ছুটে আসবে।"[২]

এই আয়াতে তাদের গতি, জনসংখ্যা ও বিধ্বংসী স্বভাব– তিনটি বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তরঙ্গ হচ্ছে এমন একটি উপমা যা সীমাহীন শক্তির ইঙ্গিত বহন করে। তারা ধ্বংস করবে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি মানবতার স্তম্ভ।

---

১. ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪০৭৫

২. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৯

ইয়াজুজ-মাজুজ কী আজও বন্দী?

অনেক চিন্তাবিদ ও গবেষক মনে করেন, ইয়াজুজ-মাজুজ আজ আর কোনো লৌহপ্রাচীরের পেছনে বন্দী নেই, তারা আগেই মুক্ত হয়ে গেছে এবং এখন মানবসভ্যতার ভেতরেই বিচরণ করছে– সাইবার আগ্রাসন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, যুদ্ধবাদী প্রযুক্তি, বৈশ্বিক অর্থনীতি ও চিন্তন কাঠামোর মাধ্যমে।

তাদের মধ্যে কেউ অস্বাভাবিক লম্বা, কেউ বেঁটে– এই বিষয়গুলো জৈব প্রকৃতির বিবর্তন ও জেনেটিক বৈচিত্র্যের প্রতীকও হতে পারে। আধুনিক ক্লোনিং, ডিজিটাল ডিএনএ প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধীন নতুন প্রজন্ম হয়তো সেই ইয়াজুজ-মাজুজ-ই, যারা অদৃশ্যভাবে সভ্যতাকে গ্রাস করছে।

ইসলামী বিশ্বদর্শনে তাদের ভূমিকা: দাজ্জাল পরবর্তী ধ্বংসযজ্ঞ:

হজরত ঈসা (আ.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানেরা যখন দাজ্জালকে পরাজিত করবে, তখন ইয়াজুজ-মাজুজ আরও প্রকট হবে এবং নতুন করে সভ্যতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। অতএব; তারা হচ্ছে দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ফেতনা, যা ইসলামের সর্বশেষ জমানার বড় পরীক্ষাগুলোর একটি।

ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়টি শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। এটা এক বহুমাত্রিক বাস্তবতা, যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝে এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধন তৈরি করে। কোরআনে এদের নাম এসেছে সীমিত পরিসরে, কিন্তু হাদীসে এসেছে বিস্তারিত ব্যাখ্যায়।

তাদের রূপ হতে পারে প্রতীকী বা বাস্তব, কিন্তু তারা হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদের জন্য এক চূড়ান্ত পরীক্ষা, এক ধ্বংসাত্মক আগ্রাসন, যার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ঈমান, হিকমাহ এবং সঠিক দিকনির্দেশনা।

মানবজাতির অংশ ইয়াজুজ-মাজুজ

কোরআনে আল্লাহ বলেন:

"وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ"

"আর আমরা তার (নূহের) বংশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছিলাম।"[১]

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্লাবনের পর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ নূহ (আ.) এর তিন পুত্রের বংশধর। ঐতিহাসিকভাবে, এই তিন পুত্র হলেন:

১. সূরা আস-সাফফাত,আয়াত ৭৭

শেম\সাম (Sheem): আরব, সিরিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর পিতা।

হাম (Ham): আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি) জনগোষ্ঠীর পিতা।

জাফেথ\ইয়াফেস (Yafith): চীন, তুর্কি এবং ইয়াজুজ-মাজুজ জাতির পূর্বপুরুষ।

তাফসীরে জালালাইন, ফাতহুল কাদীর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তাফসিরে উল্লেখ রয়েছে যে ইয়াজুজ-মাজুজ ইয়াফেস এর বংশধর, অর্থাৎ তারা নূহ (আ.)-এরই সন্তান।

অর্থাৎ অধিকাংশ মুফাসসিরীনদের মতে নূহ (আ.)-এর অবশিষ্ট বংশধর বলতে তাঁর তিনটি সন্তান ছিল; হাম, সাম ও ইয়াফেস। মানুষের পরবর্তী জন্মধারা তাদের থেকেই চলে আসছে। যার জন্য নূহ (আ.)-কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। অর্থাৎ আদম (আ.)-এর মতো, নূহ (আ.) দ্বিতীয় মানব-পিতা। সামের বংশ থেকে আরব, পার্সিক, রোম এবং ইহুদী ও নাসারার জন্ম। হামের বংশ থেকে সুদান (পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত) অর্থাৎ সিন্ধু, ভারতীয় উপমহাদেশ, (দক্ষিণ মিশরের) নবী, (আফ্রিকার) নিগ্রো, হাবশী, ক্বিবত্বী এবং বর্বর ইত্যাদি হয়েছে এবং ইয়াফেসের বংশ থেকে (বুলগারিয়ার) স্বাকালিবা, (তুর্কিস্তানের) তুর্কী, খাযার এবং ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদি জাতির জন্ম হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর) (এ ব্যাপারে কোনো সঠিক দলিল ও প্রমাণ নেই। তবে, এভাবেই বর্ণনা পাওয়া যায়।)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—
"প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন ইয়াজুজ-মাজুজ জাহান্নামী হবে, আর একজন মুমিন।"[১]

এই হাদীস ইঙ্গিত করে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা হবে বিপুল ও ভয়ানকভাবে বিভ্রান্ত। তারা যুদ্ধ করবে, ধ্বংস করবে এবং একপর্যায়ে পৃথিবীর সব জলসম্পদ পর্যন্ত নিঃশেষ করে ফেলবে।

তারা এখন কোথায়?

বিভিন্ন ইসলামী গবেষক ও ভূগোলবিদরা ধারণা করেন, এই প্রাচীর আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান, কিংবা ককেশাস পর্বতমালা অঞ্চলে অবস্থিত। তবে এটা আল্লাহর গায়েবী ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১১১

আধুনিক চিন্তাবিদেরা ইয়াজুজ-মাজুজকে বিপুল জনসংখ্যা, আধিপত্যবাদ, প্রযুক্তি-নির্ভর আগ্রাসন ও বৈশ্বিক অরাজকতার প্রতীক হিসেবেও ব্যাখ্যা করেন।

যেমন: প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষকরণ, তথ্য ও মিডিয়ার বিস্ফোরণ, পরমাণু ও জৈব অস্ত্রের ব্যবহার এবং ভার্চুয়াল দুনিয়ায় মানুষের নিয়ন্ত্রণহীনতা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—
"যখন পাপকাজ খুব বেড়ে যাবে, তখন আল্লাহর শাস্তি আসবে– even if among you are righteous people."[১]

সুতরাং, শুধু ভালো মানুষ থাকা যথেষ্ট নয়, সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও পাপের প্রতিরোধ করাটাও আবশ্যক। ইয়াজুজ-মাজুজের মতো ফেতনা থেকে বাঁচতে হলে চাই ঈমান, ইখলাস ও দ্বীনের উপর অটল থাকা।

কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে স্পষ্ট হয়, তারা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিকৃত প্রবৃত্তির এক ভয়ঙ্কর জাতি, যাদের আগমনে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে চরম ফিতনা ও দুর্বিপাক।

ইয়াজুজ ও মাজুজের গতি-প্রকৃতি

কোরআন বলছে, তারা ফ্যাসাদ ফিল-আরদ্বের (পৃথিবীতে চরম ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা) চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি। তারা অবশ্যই মানবজাতির অংশ, তবে তাদের চরিত্র দ্বিমুখী। একদিকে মুখে উদারতা, সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও বাস্তবে তারা ঈমানদারদের জন্য ভয়ঙ্কর নির্যাতকেরূপে আবির্ভূত হয়। ঠিক যেন 'দুই মুখো সাপ'– মুখে শান্তি, অন্তরে আগুন। বা মুখে মধু, অন্তরে বিষ।

তারা নিজেদের পরিচয় দেয় ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী হিসেবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর স্রষ্টার অনুসারীদের সবচেয়ে বড় বিরোধী। ঈমানদারদের উপর অত্যাচার চালানোয় তারা এতটাই দক্ষ যে, তাদের নির্যাতন অনেক সময় জুলুমের চরম সীমা ছাড়িয়ে যায়।

আধুনিক ইতিহাসে এই গোষ্ঠীটি দুটি বিপরীত পরাশক্তিতে ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছে: ইঙ্গো-মার্কিন-ইসরায়েলী জোটে এবং রুশ-চীন ও পূর্ব-নেতৃত্বাধীন জোটে। তথা, ইয়াজুজ-মাজুজ এই দুই চক্র বা জোটের মধ্যে মিলেমিশে আছে।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১০৯

তারা উভয় জোটেই উপস্থিত থেকে বিশ্বকে এক ভয়ঙ্কর সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ যেন একই বিষাক্ত বীজ, দুই ভিন্ন শাখায় ফলন দিয়ে যাচ্ছে, যাদের উদ্দেশ্য একটিই: বিশ্বব্যাপী ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা। তারা উভয় পক্ষকেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, আর তারই পরিণতিতে ঘটবে এক মহাসংঘর্ষ, যার ফল হবে ভয়াবহ।

তবে সহীহ হাদীস অনুযায়ী, এই সংঘাতের পরও ইয়াজুজ-মাজুজের অস্তিত্ব বিলীন হবে না। তারা ঈসা (আ.)-এর আগমনের সময় আবার সক্রিয় হবে। তারা পাহাড়-পর্বত বা আক্ষরিক অর্থে উঁচু আসন থেকে নেমে এসে ঈসা (আ.)-কে হত্যার চেষ্টা করবে, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রাকৃতিক গজব তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে।[১]

ইয়াজুজ মাজুজের শাব্দিক ও জেনেটিক পরিচয়: আদি-পিতা ইয়াফেথ

বাইবেলের 'Book of Genesis' (আদিপুস্তক ১০) অনুসারে, 'Magog' অর্থাৎ মাজুজ হলো হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র জাফেথ (ইয়াফেস) একটি বংশধর। নূহের প্লাবনের পূর্বে সমগ্র মানবজাতি বসবাস করত মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে। শিরক ও নবীর অবাধ্যতার কারণে মহান আল্লাহ্ সেখানে এক বিশাল প্লাবন পাঠান। তখন কেবল নূহ (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা নৌকায় চড়ে রক্ষা পান।

প্লাবনের পর মানবজাতির পুনরাবির্ভাব ঘটে নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র- সাম, হাম ও ইয়াফেস– এই তিন বংশধর থেকেই। শেম বা সাম হলেন আরব ও হিব্রু জাতির জনক। হাম আফ্রিকান ও এশীয় জাতির। আর ইয়াফেস হলেন ইউরোপীয়, তুর্ক, রুশ ও মঙ্গোলীয় জাতির পূর্বসূরী। বাইবেলের (আদিপুস্তক ১০)-এর মতোই ফাতহুল ক্বাদীরে প্রায় এমনই বলা হয়েছে, তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। তা ইতোমধ্যে পূর্বের পাতায় পড়েছেন। ইহুদী ও খ্রিষ্টান বেশ কয়েকটি গসপেলেও এভাবে বলা হয়েছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ মূলত ইয়াফেসের (জাফেথ) বংশধর, যারা ককেশাস পর্বতমালা অতিক্রম করে রাশিয়া অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। প্রাচীন দলিল ও ইতিহাসে তাদেরকে অত্যাচারী ও ধ্বংসাত্মক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নূহ (আ.)-এর পূর্ববর্তী মানবজাতি ছিল ভিন্ন শারীরিক গঠনের। তারা ছিল বিশাল আকৃতির, বহু শতাব্দী পর্যন্ত আয়ুপ্রাপ্ত, যাদের দৈহিক শক্তি ও গতিশক্তি ছিল আজকের মানুষের তুলনায় বহুগুণ বেশি। এরা ছিল একধরনের 'সুপারহিউম্যান'।

---

১. সহীহ মুসলিম

কোরআন বলছে, আদম (আ.)-কে যখন ভারতীয় উপমহাদেশে অবতরণ করানো হয়, তখন তিনি হেঁটে আরব অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারতেন।

নূহ (আ.)-এর প্লাবনে এই সুপারহিউম্যানদের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের দেহাবশেষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, যা আজ বিজ্ঞানীরা ফসিল হিসেবে আবিষ্কার করে। তবে তারা ভুলভাবে একে হোমো সেপিয়েন্সের বিবর্তনের নিদর্শন হিসেবে অপব্যাখ্যা করে। উচ্চতা ও গঠন অতীতে কেমন ছিল, তার একটা উদাহরণ ফেরাউনের মমি দেখলেই বোঝা যায়। যদিও ফেরাউন যুলকারনাইন যুগের বহু শতাব্দীর পরের মানুষ। বর্তমান আমেরিকা ও ইউরোপের দ্বীপপুঞ্জ দেশগুলোতে দেখা যায় বৃহৎ আকৃতির মানুষজন।

ভৌগোলিক অবস্থান ও বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণী

ইয়াজুজ ও মাজুজদের বসবাসের স্থানের খোঁজ পাওয়া ইতিহাসে খুবই কঠিন। তবে কোরআনে বলা হয়েছে, যুলকারনাইন তাদের একটি প্রাচীরের আড়ালে আটকে দিয়েছিলেন, যা এখনো খোলা হয়নি। বাইবেল বলছে, শেষ সময়ে এই গোষ্ঠী উত্তর দিক থেকে জেরুজালেম বা পবিত্র ভূমির উপর আক্রমণ চালাবে। এই উত্তরদিকীয় আগ্রাসনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখা যায় ইহুদী ও খ্রিষ্টান গ্রন্থে, বিশেষত ইজিকিয়েল (Ezekiel) ৩৮-৩৯ অধ্যায়ে। সেখানে Gog of the land of Magog-কে বর্ণনা করা হয়েছে এক শেষ দিনের চূড়ান্ত যোদ্ধা ও ধ্বংসকারী শক্তি হিসেবে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ শুধু কোনো প্রাচীন রহস্য নয়; তারা আধুনিক বিশ্বের এক জীবন্ত বাস্তবতা। তাদের বৈশিষ্ট্য হলো– ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে ঈমানদারদের উপর আগ্রাসন, পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসাদ ও যুদ্ধের পরিকল্পনা, প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং দ্বিমুখী নৈতিকতা ও মতবাদ প্রচার।

তাদের সনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ; কেয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় একটি আলামত হলো ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়া। অতএব; মুসলিমদের জন্য এখন সময় এসেছে– এই সেক্যুলার, ঈমানবিরোধী ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা থেকে আত্মরক্ষার কৌশল গ্রহণের এবং কোরআনের আলোকে সত্যকে চিনে তা আঁকড়ে ধরার।

ইয়াজুজ ও মাজুজ: বাইবেল ও হাদীসের আলোকে তাদের অভিযাত্রা ও অবস্থান

ইয়াজুজ ও মাজুজ, এ এক রহস্যময় মানবগোষ্ঠী, যাদের সম্পর্কে শুধু কোরআন নয়, ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থসমূহেও বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। বিশেষ করে বাইবেলের নবী ইজিকিয়েলের (Ezekiel) মুখে উচ্চারিত যে ভয়াবহ দৃশ্যপট তুলে ধরা হয়েছে, তা ইসলামের হাদীস সমূহের বিবরণীর সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিলে যায়।

বাইবেলীয় প্রেক্ষাপট: উত্তরের আগ্রাসন ও বহু জাতির সহাবস্থান:

বাইবেলের Ezekiel ৩৮:২-৬ এ বলা হয়েছে:

> "Son of man, direct your face against Gog, of the land of Magog, the prince, leader of Meshech and Tubal, and prophesy concerning him. Say: Thus said the Lord: Behold, I am against you, Gog, the prince, leader of Meshech and Tubal ... Persia, Cush and Put will be with you ... also Gomer with all its troops, and Beth Togarmah from the far North with all its troops— the many nations with you."

এই শ্লোকটির আলোকে বোঝা যায়, শেষ সময়ে 'ইয়াজুজ ও মাজুজ'– এই জোড়া নেতৃত্ব উত্তর দিক থেকে জেরুজালেম অভিমুখে অগ্রসর হবে। তাদের সঙ্গে পারস্য (আজকের ইরান), কুশ (আফ্রিকা), পুত (লিবিয়া অঞ্চল) এবং তোগারমার (আনাতোলিয়া বা তুর্কি অঞ্চল) সৈন্যবাহিনী থাকবে। এটা একটি বহুজাতিক জোট, যা ধর্ম বা নৈতিকতা নয়, ধ্বংস ও আগ্রাসনের লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত।

মুসলিমরা বিশ্বাস করে, বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণী কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে, ইয়াজুজ ও মাজুজদের আগমনের সময় আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-কে ওহী দিয়ে নির্দেশ দেবেন যেন তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নেন:

"হে ঈসা, আমি এমন এক জাতিকে পাঠিয়েছি যাদের সঙ্গে লড়াইয়ে কেউ পারবে না। তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করো।"[১]

---

১. সহীহ মুসলিম

এতেই শেষ নয়। হাদীসে বলা হয়:

“তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ধেয়ে আসবে। তাদের প্রথমদল টাইবেরিয়াস হ্রদের পানি পান করবে, আর যখন শেষ দলটি সেখানে পৌঁছাবে, তারা বলবে, এখানে একসময় পানি ছিল!”[১]

উল্লেখ্য, টাইবেরিয়াস হ্রদ বা গ্যালিলী সাগর জেরুজালেমের উত্তর দিকে অবস্থিত। কাজেই, তাদের অগ্রগতি উত্তর দিক থেকেই হওয়াটা কেবল বাইবেল নয়, সহীহ হাদীসের সাথেও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে:

“তারা হাঁটতে হাঁটতে আল-খামর নামক পাহাড়ে পৌঁছাবে। এটা বায়তুল মাকদিসের (জেরুজালেম) একটি পাহাড়।”[২]

এইসব দলিল থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়– ইয়াজুজ মাজুজদের মুক্ত হওয়ার পর তাদের অভিযান উত্তর দিক থেকে পবিত্রভূমির দিকে পরিচালিত হবে।

শনাক্তকরণ বিভ্রান্তি

ইয়াজুজ ও মাজুজের অবস্থান নির্ণয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, ধর্মীয় দলিলকে রাজনৈতিক ও জাতিগত বিদ্বেষে রঙিন করা। কেউ যদি তুরস্কের বিরোধী হয়, সে বলে বসে: “তুরস্ক তো জেরুজালেমের উত্তরে, তাই নিশ্চয়ই তুর্কিরাই ইয়াজুজ মাজুজ।” অন্য কেউ রাশিয়াবিদ্বেষী হলে গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে উত্তর দিক বরাবর রেখা টেনে বলবে: “মস্কো তো উত্তরেই, তাই রাশিয়াই হচ্ছে সেই কুখ্যাত জাতি।” অথচ এ পদ্ধতি সার্বিকভাবে ভুল এবং দলিলবিরোধী।

কোরআনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল গ্রন্থ, যা ইয়াজুজ ও মাজুজদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য দেয়। তাই মুসলিমদের উচিত বাইবেলীয় প্রফেসিগুলোকে কোরআনের আলোয় যাচাই করে সঠিক স্থানে স্থাপন করা।

যুলকারনাইনের যাত্রা ও ভূগোল: রহস্যময় কালো সমুদ্রের সন্ধান

আমরা ইতোমধ্যে আগের পাতাগুলোর আলোচনার মাধ্যমে জেনেছি, কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন পূর্ব ও পশ্চিম– উভয় দিকেই ভ্রমণ করেছিলেন। বিশেষত পশ্চিমগামী অভিযানের বিবরণে বলা হয়, তিনি এমন একটি সমুদ্র বা জলাধারে

---

১. সহীহ মুসলিম
২. সহীহ মুসলিম

পৌঁছান যার পানি ছিল অস্বাভাবিক কালো– 'হামিয়া'। এই সমুদ্রের গাঢ়তা এমন ছিল যে, তা দেখে মনে হতো সূর্য তারমধ্যে অস্ত যায়।

তাই আমরা যদি যুলকারনাইনের অভিযাত্রাকে ভূগোলের মানচিত্রে খুঁজে পেতে চাই, তবে আমাদের দুইটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে: ১. এমন একটি সমুদ্র বা হ্রদ, যার পানি গভীর ও পরিমাণে বিপুল। ২. যার রং প্রকৃতিগতভাবে কালচে বা গাঢ়– অন্য সাধারণ জলাধারের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী।

এই সমুদ্রের অস্তিত্ব যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থান সনাক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোরআনে পূর্ব ও পশ্চিমে তাঁর অভিযাত্রার বর্ণনার মধ্যেই প্রাচীর নির্মাণের ঘটনা স্থাপন করা হয়েছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজের মতো ঐতিহাসিক ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক একটি বিষয়ে আলোচনায় আবেগ, ঘৃণা বা রাজনৈতিক পক্ষপাত যেন কখনো প্রাধান্য না পায়। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী, ইসলামের হাদীস এবং কোরআনের অসাধারণ স্পষ্ট ও গভীর বর্ণনা আমাদের সামনে এক ভৌগোলিক ও নৈতিক মানচিত্র উন্মোচন করে। আমরা যদি সেই মানচিত্র ধরে অনুসন্ধান চালাই, তবে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থান, গতিপথ এবং পরিণতি সম্পর্কে অধিকতর নির্ভুল ও গভীর ধারণা লাভ সম্ভব।

সূরা কাহাফের ভৌগোলিক ইঙ্গিত—যুলকারনাইনের ভ্রমণ ও প্রাচীরের অবস্থান

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনের সূরা কাহাফে যুলকারনাইনের তিন দিকের অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন: পশ্চিমে, পূর্বে এবং এরপর মাঝামাঝি অঞ্চলে, যেখানে তিনি একটি বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রতিটি অভিযানের বর্ণনায় এমন ভৌগোলিক ও প্রকৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে আমরা বাস্তব জগতে তাঁর ভ্রমণপথ ও কর্মকাণ্ডের অবস্থান অনুধাবন করতে পারি।

পশ্চিমে ভ্রমণ— সূর্য অস্ত যায় কালো জলরাশিতে:

"তিনি ভ্রমণ করলেন যতক্ষণ না সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছালেন। তখন তিনি সূর্যকে এক ঘোলা (অথবা কালো) জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং সেখানে এক জাতিকে পেলেন..."[১]

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৮৬

যুলকারনাইন এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিলেন, যেখান থেকে মনে হচ্ছিল সূর্য সাগরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সমুদ্রটি এতটাই গাঢ় ও কালচে ছিল যে সূর্যের অস্ত যাওয়াকে মনে হচ্ছিল এক বিষণ্ন দৃশ্যের মতো। আর এমনটা তখনই সম্ভব, যখন পানির স্বাভাবিক রঙ গাঢ় হয়ে পড়ে– যা বিশাল গভীরতার কারণে হতে পারে, অথবা শৈবাল ও লবণাক্ততার কারণে।

পূর্বে ভ্রমণ—সূর্যোদয়ের উন্মুক্ত ভূমি

"যতক্ষণ না তিনি সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি এক জাতিকে পেলেন, যাদের জন্য আমরা সূর্য থেকে আত্মরক্ষার কোনো পর্দা বা আবরণ রাখিনি।"[১]

এই বর্ণনা পূর্বের চূড়ান্ত সীমার একটি জায়গার– যেখানে হয়তো বনভূমি বা পর্বত নেই এবং সেখানকার মানুষ খোলা আকাশের নিচে বাস করে। সূর্যের কিরণে তারা সরাসরি আক্রান্ত হয়, আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থেকে বাঁচার জন্য প্রকৃতির কোনো প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা তাদের নেই।

ভূগোলের সংকেত: দুই সমুদ্র, এক পর্বতমালা:

সূরা কাহাফের এই আয়াতগুলো আমাদের সামনে কিছু স্পষ্ট ভৌগোলিক ইঙ্গিত হাজির করে:

ক. পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তে বিশাল জলাধার থাকবে।

খ. তাদের মাঝে থাকবে দুর্গম ও অবিচ্ছিন্ন পাহাড়ের সারি।

গ. সেই পর্বতের মাঝে থাকবে একটি গিরিপথ বা খোলা ফাঁকা স্থান, যেখান দিয়ে শত্রুরা দক্ষিণ থেকে উত্তর বা বিপরীতে প্রবেশ করতে পারত।

এমন একটি গিরিপথকে বন্ধ করে দিতেই যুলকারনাইন সেই ঐতিহাসিক প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। কোরআনে সেই ফাঁকা জায়গাকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন তা একটি উন্মুক্ত সামুদ্রিক খোলসের মতো, নিচে যুক্ত, উপরে আলাদা।

"আমাকে লোহার খণ্ড এনে দাও!"... তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যকার ফাঁকা স্থানকে লোহার স্তূপে ভরাট করলেন... এরপর তাতে গলিত তামা ঢেলে দিলেন।"[২]

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯০

২. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯৬

প্রাচীরটি এমনভাবে গড়া হয়েছিল যে ইয়াজুজ মাজুজরা তা না আরোহন করতে পারবে, না ধ্বংস করতে পারবে। এতে মানবজাতি তাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে।

ভৌগোলিক অনুসন্ধান: কোন অঞ্চল সব শর্ত পূরণ করে?

পবিত্রভূমি (জেরুজালেম)-এর উত্তর দিকে আমরা যদি এমন একটি অঞ্চল খুঁজি যা পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি বিশাল সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, যাদের একটির পানি হবে অস্বাভাবিক কালো বা ঘোলা এবং এই দুই সমুদ্রের মাঝে থাকবে এক অবিচ্ছিন্ন পাহাড়ের সারি, যার মাঝখানে একটি গিরিপথ থাকবে, যা প্রাচীর নির্মাণের জন্য আদর্শ।তাহলে এমন এলাকা বিশ্বে খুব বেশি নেই। ভূমধ্যসাগর ও তার আশপাশের এলাকা এই বিবরণের সাথে খাপ খায় না। এটা খোলা, পরিচিত ও বাণিজ্যিকভাবে দীর্ঘকাল ব্যবহৃত।

অন্যদিকে, ভূমধ্যসাগরের উত্তরে রয়েছে কৃষ্ণসাগর বা কালোসাগর– একটি গভীর, অন্ধকারাভ জলরাশি, যার পানি রঙে কালচে। এর কারণ: গভীরতা অনেক বেশি (দ্বিতীয় গভীরতম), শৈবাল ও কম লবণাক্ততা একে ঘোলা ও গাঢ় রঙের করে তোলে, ফলে সূর্যাস্তের সময় এই সাগরে সূর্যের পতন এক রূপক অর্থে 'অস্তাচল'-এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি তৈরি করে।

এর ঠিক পূর্বদিকে রয়েছে ক্যাস্পিয়ান সাগর– বিশ্বের বৃহত্তম স্থলবেষ্টিত জলাধার। কৃষ্ণসাগর ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের মাঝখান দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে ককেশাস পর্বতমালা, যা ইউরোপ ও এশিয়াকে পৃথক করেছে এবং আজও পর্বতবেষ্টিত দুর্গম অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত।

ককেশাস অঞ্চল—সম্ভাব্য প্রাচীরের অবস্থান:

ককেশাস পর্বতমালা: কৃষ্ণসাগর থেকে শুরু হয়ে ক্যাস্পিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর ও দক্ষিণে ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির বসতি। এর মাঝে দারিয়াল গিরিপথ রয়েছে– একটি প্রাকৃতিক ফাঁকা স্থান, যেটা উত্তর থেকে দক্ষিণে যাতায়াতের পথ হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে ব্যবহৃত।

এখানেই বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ও মুসলিম ভূগোলবিদগণ যুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মাণের ঘটনাকে স্থাপন করেছেন। এই পথ দিয়েই পূর্বে বহু বেদ্বীন জাতি দক্ষিণে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে এসেছে এবং এই ফাঁকাটিকে রোধ করাই ছিল যুলকারনাইনের কৌশল।

যুলকারনাইন বললেন: "আমাকে লোহার খণ্ড এনে দাও।" তিনি গিরিপথকে লোহার স্তূপে পূর্ণ করলেন এবং গলিত তামা ঢেলে দিলেন [১৮:৯৬]।

ককেশাস পর্বতের দারিয়াল গিরিপথ বা ডারবেন্ট দুর্গকে বহু ঐতিহাসিক (আল-মাসউদি, ইবনে খুরদাধবিহ) এই প্রাচীরের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। এটা প্রাচীনকালে 'লোহার ফটক' নামেই পরিচিত ছিল।

পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর (কালো জলরাশি), পূর্বে ক্যাস্পিয়ান সাগর (বিশাল জলাধার), মাঝখানে ককেশাস পর্বতমালা, আর গিরিপথে প্রাচীর নির্মাণ।

অর্থাৎ, ককেশাস হলো ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝামাঝি এক বিশাল পর্বতশ্রেণি, যা কৃষ্ণসাগর থেকে শুরু হয়ে ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পর্বতমালাই উত্তর ও দক্ষিণকে স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত রেখেছে। উত্তর দিকে বসবাস করত যাযাবর ও যোদ্ধা জাতিগোষ্ঠী, আর দক্ষিণে ছিল সভ্য ও উন্নত সমাজ।

এই পর্বতমালার মাঝখানে একটি সরু ফাঁকা স্থান রয়েছে, যা ইতিহাসে দারিয়াল গিরিপথ নামে পরিচিত। এটা উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার একমাত্র সহজ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ডাকাত, দস্যু, যাযাবর যাই বলি না কেন তথা এদেরকেই বলা হয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি। এই গিরিপথ দিয়েই দক্ষিণাঞ্চলে নেমে এসে লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাত অর্থাৎ সম্পদ লুট করত আর বাসিন্দাদের হত্যা করত, নারীদের উপর নির্যাতন চালাত। ফলে, এটা দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কোরআনুল কারিমে সূরা কাহফে বলা হয়েছে, যুলকারনাইন এক যাত্রায় এমন এক জাতির কাছে পৌঁছেছিলেন, যারা ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। তারা যুলকারনাইনের কাছে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণের আবেদন জানায়। তখন তিনি লোহা ও গলিত তামা ব্যবহার করে এক দৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেন, যা ইয়াজুজ-মাজুজকে আটকিয়ে দেয়। এই প্রাচীর এতই মজবুত ছিল যে, ইয়াজুজ-মাজুজ বহু চেষ্টা করেও তা ভেদ করতে পারেনি।

প্রাচীন ঐতিহাসিক ও মুসলিম ভূগোলবিদদের মতামত:

বহু মুসলিম ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিক এই প্রাচীরের অবস্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে ককেশাস পর্বতমালার দারিয়াল গিরিপথকেই সবচেয়ে সম্ভাব্য স্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে কাসির (রহ.) [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৭] বলেছেন—যুলকারনাইনের প্রাচীর ককেশাস পর্বতমালায় নির্মিত হয়েছিল এবং সেটাই ইয়াজুজ-মাজুজকে দক্ষিণে প্রবেশ থেকে রোধ করে।

আল-ইদ্রিসি (রহ.) [নুজহাতুল মুশতাক, দ্বাদশ শতক] ককেশাস অঞ্চলের দারিয়াল গিরিপথে বিশাল প্রাচীরের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

ইয়াকুত হামাভি (রহ.) [মুজামুল বুলদান] দারিয়াল গিরিপথকে ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীরের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তাবারি (রহ.) [তারিখুর রসুল ওয়াল মুলুক] উল্লেখ করেছেন যে, ককেশাসে লোহা ও তামার সংমিশ্রণে তৈরি এক প্রাচীরের কথা স্থানীয় জনগণ প্রচলিতভাবে জানত।

এমনকি কিছু খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকও এই গিরিপথকেই প্রাচীরের অবস্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কারণ এখানে বহু পুরনো লোহার গেট ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। তাদের মতে, এটা উত্তর দিক থেকে আসা যাযাবরদের প্রতিরোধ করার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

ককেশাস অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পুরনো দুর্গ, প্রাচীর ও লোহার গেটের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে। কিছু ইউরোপীয় গবেষক মনে করেন, এই প্রাচীর মূলত স্কিথিয়ান ও মঙ্গোলীয় উপজাতিদের রোধ করার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

কিছু আধুনিক গবেষক মনে করেন, ইয়াজুজ-মাজুজ আসলে স্কিথিয়ান বা মঙ্গোলীয় জাতি, যারা উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। ককেশাস অঞ্চলের প্রাচীর তাদের গতিপথ রোধ করেছিল বলেই দক্ষিণাঞ্চলের সভ্যতা দীর্ঘ সময় নিরাপদ ছিল। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেও ককেশাসে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ, লোহার গেট ও প্রাচীরের চিহ্ন মিলেছে, যা যুলকারনাইনের প্রাচীরের স্মৃতি বহন করতে পারে।

তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, দারিয়াল গিরিপথই যুলকারনাইনের প্রাচীরের স্থান কি না! এ বিষয়ে চূড়ান্ত জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আছে। অতএব; ককেশাস ও দারিয়াল গিরিপথকে কেন্দ্র করে প্রাচীরের বহু তত্ত্ব থাকলেও, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকৃত অবস্থান আজও রহস্যাবৃত।

তবে মুসলিম ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক এবং আধুনিক গবেষকরা সবাই প্রায় একমত যে, এ অঞ্চলে সত্যিই এক বিশাল প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল।

তাহলে এখানে এটা বোঝা গেল যে, ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি কোনো দানব ও পাহাড়ের গুহায় বা গিরিপথে বন্দী কোনো অমানব জাতি নয়। এরা একটা মানব গোত্র। বর্তমান সব দেশ যেমন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বর্ডার গার্ড রেখে শত্রুদের রোধ করা হয়, অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। তেমনই লুটতরাজ ভয়ংকর গোত্রকে আটকানোর জন্য, ইয়াজুজ-মাজুজ নামক আগ্রাসনবাদী, ডাকু দলের কবল থেকে অঞ্চলের মানুষজনকে রক্ষা করার জন্য, এমনই কোনো প্রাচীর ছিল– যা যুলকারনাইন নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তাদের অনুরোধে ও তাদের রক্ষার জন্য।

এখন ইয়াজুজ-মাজুজের অতিরিক্ত যে সংখ্যার কথা ধারণা করা হয়, বৃহৎ যে আকৃতির কথা বলা হয়। সেই পরিমাণ বৃহৎ আকৃতির ও বৃহৎ সংখ্যার গোত্র মনে হয় না এই পাহাড়ের গিরিপথে বন্দী থাকা সম্ভব! আমরা এখন এটা বলতেই পারি– এই ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি ইহুদী-খ্রিষ্টান ও তাদের অনুসারী গোত্রের মধ্যকার একটা বিরাট অংশ।

রূপকথার কোনোকিছুকে বিশ্বাস করে, তা ধারণ করে, পোক্ত থেকে– সেইসব বলে বেড়ালে অমুসলিম, অবিশ্বাসীরা বিদ্রুপ ও কটাক্ষের ছলে হাসাহাসি করবে। এতসংখ্যক ইয়াজুজ-মাজুজ কীভাবে হাজার হাজার বছর একটা গুহা বা প্রাচীরে বন্দী হয়ে থাকবে? রোধ করার কথা বলা হয়েছে, আবার মুক্তি পাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই জাতির আগ্রাসন শেষ নয়, এরা আবারও ফিরবে, সমগ্র বিশ্বে লুটতরাজ, লুণ্ঠন, হত্যা এবং আগ্রাসন চালাবে। তা হয়ে গেছে খেলাফত শাসনব্যবস্থার পতন ও মুসলমানদের পরাজয়ের মাধ্যমে। তথা, যেদিন খেলাফত শাসনব্যবস্থার অবসান, মুসলিম শাসকদের থেকে মসনদ কেড়ে নিয়ে অবৈধ ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ওইদিনই আক্ষরিকভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ জাতির মুক্তি মিলেছিল। এরা সেই ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি। এই পর্যায়ে এই দাবী আরও শক্তপোক্ত করার জন্য আমরা আবারও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের অনুসন্ধানে ধাবিত হব।

সূরা কাহাফের আয়াতসমূহ শুধু নৈতিক শিক্ষা নয়, এটা গভীর ভৌগোলিক রহস্য বহন করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা কোরআনে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এমন ভৌগোলিক চিহ্ন দিয়ে গেছেন, যেগুলোর অনুসরণ করলে আজকের আধুনিক মানচিত্রেও আমরা তাঁর দেখানো পথে পৌঁছাতে পারি। কৃষ্ণসাগর, ক্যাস্পিয়ান সাগর এবং ককেশাস পর্বতমালা– এই তিন উপাদান আমাদের সামনে সেই মানচিত্র খুলে দেয়, যেখানে ইয়াজুজ মাজুজদের আগমন, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং মানবজাতির রক্ষার উপাখ্যান লুকিয়ে আছে।

দুই সাগর, এক পর্বতমালা এবং সেই রহস্যময় প্রাচীর

আমরা ইতোমধ্যে কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এমন এক ভৌগোলিক অঞ্চল শনাক্ত করতে পেরেছি, যার দুই প্রান্তে রয়েছে দুই বিশাল সমুদ্র– পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর, পূর্বে ক্যাস্পিয়ান সাগর। এই দুই সাগরের মাঝখান দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে এক বিরাট, অবিচ্ছিন্ন পার্বত্যপ্রাচীর– ককেশাস পর্বতমালা। এখন আমাদের লক্ষ্য সেই সরু গিরিপথের সন্ধান, যেখান দিয়ে যুলকারনাইন প্রবেশ করেছিলেন এবং যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজদের রোধ করতে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্মাণ করেন। সেই গিরিপথের অস্তিত্ব, সেই প্রাচীরের ভগ্নাংশ, আর সেই অঞ্চলের ধাতব সম্পদ– সবকিছুই আমাদের অনুসন্ধানের পরবর্তী ধাপ।

দারিয়াল গর্জ: ককেশাসের প্রবেশদ্বার

ককেশাস পর্বতমালার গহীনে অবস্থিত এক সংকীর্ণ গিরিপথ, যা ইতিহাসজুড়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত– দার-এ-আলান (Alans-এর ফটক), Porta Caucasica, Porta Sarmatica কিংবা Fortes Iberica. আজকের দিনে আমরা একে চিনি দারিয়াল গর্জ নামে। এটা এক প্রাকৃতিক গেইট, যা রাশিয়ার ভাদিকাভকায (Vladikavkaz) শহর থেকে জর্জিয়ার তিবিলিশি পর্যন্ত বিস্তৃত জর্জিয়ান মিলিটারি হাইওয়ের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই রাস্তাটি প্রথম নির্মিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে এবং ঊনবিংশ শতকে রুশ সম্রাট জার আলেকজান্ডার প্রথম একে আধুনিকভাবে পুনর্নির্মাণ করেন। আজও এটা উত্তর ও দক্ষিণ ককেশাসের সংযোগকারী প্রধান পথ।

এই হাইওয়ে এমনভাবে এঁকেবেঁকে পর্বতের ফাঁকে এগিয়ে চলে যে, এটা প্রায় ২৩০০ মিটার উচ্চতায় পৌঁছে যায় ক্রেসটোভি গিরিপথ অতিক্রম করে। পথে পড়ে মধ্যযুগীয় দুর্গসমূহ– আনানাওরি দুর্গ, আরাগভি নদী এবং সর্বোচ্চ শিখর কাজবেগী (৫০৩৩ মিটার)। হাইওয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে, রাশিয়ার সীমান্তঘেঁষা এলাকাতেই অবস্থিত দারিয়াল গর্জ। সেখানে রাস্তা মাত্র কয়েক কিলোমিটার জুড়ে এবং তা ১৫০০ মিটার উঁচু গ্রানাইট পাহাড়ের সরু গিরিখাতের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। প্রকৃতির নির্মিত এই সংকীর্ণ পথ এতটাই কৌশলগত ছিল যে, ইতিহাসে এটা বহুবার দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাচীন দুর্গ ও প্রাচীর—যুলকারনাইনের স্মৃতি

দারিয়াল গর্জ ইতিহাসে শুধু একটি গিরিপথ নয়, এটা বহু শতাব্দী ধরে রক্ষাকবচের প্রতীক। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০ সাল থেকে এই গিরিপথে প্রাচীন দুর্গ নির্মিত হতে থাকে। আজও এসব দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃশ্যমান, যেগুলো রোমান, পার্সিক এবং জর্জিয়ানদের দ্বারা একাধিকবার সংস্কার ও ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী ঐতিহ্য এবং কিছু বাইবেলিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মহান সম্রাট যুলকারনাইন এই গিরিপথেই নির্মাণ করেছিলেন সেই কিংবদন্তীতুল্য প্রাচীর, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে:

"অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছালেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন এর পার্শ্ববর্তী এক জাতি, যারা কথাবার্তা বুঝে না... তিনি বললেন: আমাকে লোহার খণ্ড এনে দাও... পরে তাতে গলিত তামা ঢেলে দিলেন।"[১]

এই প্রাচীর ইয়াজুজ-মাজুজদের অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করেছিল দক্ষিণের জনপদকে। প্রাচীরটি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যে তারা তা আরোহন করতে পারত না, আবার ধ্বংসও করতে পারত না। কালের পরিক্রমায়, এই প্রাচীর এক সময় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ধীরে ধীরে ভাঙন ধরে এবং সেই ভাঙন দিয়েই ইয়াজুজ-মাজুজদের কিছু গোত্র পুনরায় মুক্ত হয় বা তাদের অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি ও ইউরোপীয় অস্থিরতা

প্রাচীরের পতন প্রায় ৫০০-৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ধরা পড়ে। প্রাচীরের ওপাশে বিচ্ছিন্ন যাযাবর জীবনযাপনকারী ইয়াজুজ-মাজুজদের প্রথম বহির্গত গোত্র ছিল খাযার। তাদের উত্তরসূরি হান গোত্র নৌযাত্রায় দক্ষ হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে স্ক্যান্ডিনেভীয় অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই আগ্রাসনের ফলে জন্ম নেয় ইউরোপের ইতিহাসের প্রথম বৃহৎ শরণার্থী সংকট। পশ্চিমা সভ্যতায় সৃষ্টি হয় আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা ও নতুন সামাজিক বিন্যাস।

ধ্বংসাবশেষের সন্ধানে— লোহা, তামা ও প্রত্নতত্ত্ব

এখন, আমরা যখন দারিয়াল গর্জকে যুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মাণস্থল হিসেবে চিহ্নিত করি, তখন এর প্রত্নতাত্ত্বিক ভিত্তি খোঁজার সময় এসেছে। কোরআন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, প্রাচীরটি নির্মাণ হয়েছিল লোহার খণ্ড ও গলিত তামা ব্যবহার করে। সুতরাং, আমরা দারিয়াল গর্জের সেই গভীর নিম্নভূমিতে এমন

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯৩-৯৬

কোনো ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করব, যেখানে প্রাচীন লোহা, ব্রোঞ্জ, তামা কিংবা পিতলের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চল নিজেই আদি ধাতু উৎপাদন অঞ্চলের একটি, বিশেষ করে লোহা ও তামার খনি এখানেই পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের মানুষ লৌহ খণ্ড সহজেই সংগ্রহ করতে পারত, এবং কোরআনের ভাষায়, তারা তা এনে দিয়েছিল যুলকারনাইনের নির্দেশে।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য: প্রাচীন গ্রন্থ ও নামের অর্থ

প্রাচীন ঐতিহাসিক জোসেফাস উল্লেখ করেন যে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট লোহার দরজা বা গেট নির্মাণ করেছিলেন এক অজ্ঞাত গিরিপথে, যেটাকে পরবর্তীতে গ্রিক ও ল্যাটিন ঐতিহ্যে অনেকেই দারিয়াল গর্জ বলেই চিহ্নিত করেছেন। এমনকি এই গিরিপথের নাম 'দার-ই-আলান'। অর্থাৎ আলানদের ফটক, বহু শতাব্দী ধরে চলমান। পার্সিক, রোমান, তাতার ও জর্জিয়ান ভাষ্য অনুযায়ী, এটাই ছিল ককেশাসের মূল প্রবেশদ্বার– Portae Caucasica, Portae Sarmatica, Iberian Gates, এমনকি Portae Caspiae (যদিও পরবর্তীতে এই নাম ডারবেন্টের জন্যও ব্যবহৃত হয়।).

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের প্রতিচ্ছবিতে এবং ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে থাকা টুকরো সূত্রগুলো একত্রে মিলিয়ে যখন আমরা দারিয়াল গর্জে এসে পৌঁছেছি, তখন এটা আর শুধু একটি প্রাকৃতিক গিরিপথ থাকে না, এটা হয়ে ওঠে মানবজাতির ইতিহাসে এক প্রাচীন আত্মরক্ষার প্রতীক। কোরআনের বর্ণনা, ভৌগোলিক নিদর্শন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র একে একে যেন নির্দেশ করে এই অঞ্চলই সেই রহস্যময় স্থান, যেখানে এক মহান নেতা মানবতার সুরক্ষায় গড়েছিলেন সেই অতিকায় প্রাচীর। তারপরও আমি আবারও বলব– এই বিষয়ে আমার 'রাব্বে কারীম' অবগত।

ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে- কোরআনের যুলকারনাইন হলো, সম্রাট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। তবে, কিছু মুসলিম গবেষক আরেকটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন, যাদের মতে ইতিহাসের সেই মহান নেতা ছিলেন পারস্যের সাইরাস দ্য গ্রেট, যিনি বিশ্বসভ্যতার জন্য অন্য এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

যুলকারনাইন-এর পরিচয় নিয়ে মোটাদাগে তিনটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে বিবেচনা করা হয়:

ক. আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট (Alexander the Great):
ঐতিহ্যবাহী মত: অধিকাংশ চিরায়ত মুসলিম তাফসিরকার, বিশেষ করে মধ্যযুগের, যুলকারনাইনকে ইস্কান্দার যুলকারনাইন নামে পরিচিত মেসিডোনিয়ার শাসক আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

স্বপক্ষের যুক্তি— বিশ্বব্যাপী অভিযান: কোরআনে যুলকারনাইনকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আলেক্সান্ডারের বিশাল সাম্রাজ্য জয় ও বিশ্বব্যাপী অভিযানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রাচীন উপাধি: প্রাচীন গ্রিক ও সিরিয়াক সাহিত্য ও লোককথায় আলেক্সান্ডারকে 'দুই শিং'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হতো, যা সম্ভবত তাঁর দেবত্ব দাবী বা সামরিক শক্তির প্রতীক ছিল।

বিপক্ষে যুক্তি—ধর্মীয় বিশ্বাস: কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী যুলকারনাইন ছিলেন একত্ববাদী (মুমিন) এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত। কিন্তু ইতিহাসে আলেক্সান্ডার একজন বহু-ঈশ্বরবাদী (Polytheist) গ্রিক শাসক হিসেবে পরিচিত। এই মৌলিক পার্থক্যটিই আধুনিক গবেষকদের কাছে তাঁর যুলকারনাইন হওয়ার সম্ভাব্যতাকে দুর্বল করে দেয়।

প্রাচীর নির্মাণ: আলেক্সান্ডার ইয়াজুজ-মাজুজের বিরুদ্ধে কোনো বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন– এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় না। তারা যুলকারনাইনকে আলেক্সান্ডার বলে তত্ত্ব দেয়, উক্ত প্রাচীর আলেক্সান্ডার নির্মাণ করেছে, সেই বিষয়ে আগের পাতায় পড়েছেন। তাই আমরা এখন এক বাক্যে ধরে নিতে পারি– আলেক্সান্ডার কোনোভাবেই বাদশাহ যুলকারনাইন নয়।

খ. সাইরাস দ্য গ্রেট (Cyrus the Great):
আধুনিক ও শক্তিশালী মত: ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই মতবাদটি জোরদার হতে শুরু করে। ভারতের আবুল কালাম আজাদ এবং ইরানের আল্লামা তাবাতাবাই-এর মতো প্রভাবশালী আধুনিক পণ্ডিতরা এটিকে সমর্থন করেন।

স্বপক্ষের যুক্তি—'দুই শিং'-এর ব্যাখ্যা [দলিল: দানিয়েলের কিতাব] বাইবেলের ভাববাদী দানিয়েলের কিতাবে (Daniel ৮:৩) সাইরাস-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদায়-পারস্য (Media-Persia) সাম্রাজ্যকে দুই শিং বিশিষ্ট মেষের মাধ্যমে প্রতীকী রূপ দেওয়া হয়েছে। 'এই দুই শিং-এর অধিকারী' উপাধিটি আরব উপদ্বীপের ইহুদীদের কাছে সুপরিচিত ছিল, যার অ্যারাবিক রূপ হলো 'যুলকারনাইন'।

ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা (দলিল: সাইরাস সিলিন্ডার): কোরআনে যুলকারনাইন -এর যে ন্যায়পরায়ণতা, দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি এবং একত্ববাদী ভাবধারার কথা

বলা হয়েছে, তা সাইরাসের চরিত্রের সাথে মিলে যায়। তিনি ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ইহুদীদের মুক্তি দেন এবং তাদেরকে ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন। তাঁকে বাইবেলে মসীহ (Messiah) বা আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীর নির্মাণ: যদিও ইয়াজুজ-মাজুজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রাচীর নির্মাণের সরাসরি ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, তবে দারিয়াল গিরিপথ বা ককেশাস অঞ্চলে তিনি হয়তো কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন, যা কোরআনের বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

বিপক্ষে যুক্তি—প্রাচীরের প্রমাণ: যুলকারনাইন-কর্তৃক নির্মিত বিশাল প্রাচীরের [১৮:৯৬] মতো কোনো স্থাপনার সঙ্গে সাইরাসের সরাসরি সম্পৃক্ততার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

'দুই শিং' বলতে যুলকারনাইন যুগ ও তার পরবর্তী যুগ তথা দুই যুগকে বোঝানো হয়েছে। আমি আগের সামগ্রিক আলোচনায় অনেকবার বলেছি, আরবিতে 'ক্বারন' (Qarn) শব্দের আরেকটি অর্থ হলো যুগ বা শতাব্দী (Century/Era)।

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দালিলিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই শব্দটির উৎপত্তি আরও গভীরে। বাইবেলের সংযোগ (রূপক): পূর্ববর্তী উত্তরে যেমন বলা হয়েছে, বাইবেলের দানিয়েলের কিতাব-এ দুই শিং বিশিষ্ট মেষ বলতে দুই সাম্রাজ্য (মাদায় ও পারস্য)-কে একত্রিতকারী সাইরাসকে বোঝানো হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে 'দুই শিং' হলো ক্ষমতার উৎস বা দুটি একত্রীকৃত অঞ্চলের প্রতীক।

যদিও আভিধানিকভাবে 'দুই শিং' বলতে দুটি স্থান বা দিকের (পূর্ব ও পশ্চিম) ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং কোরআনের ভ্রমণ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তবে 'দুই যুগ' বা 'দুই সাম্রাজ্য'-এর প্রতীকী ব্যাখ্যাও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য এবং পণ্ডিতদের দ্বারা সমর্থিত।

এটা একটি রূপক উপাধি, যা যুলকারনাইন-এর অসাধারণ ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং তাঁর শাসনের ব্যাপক বিস্তারকে বোঝায়। আমি ইহুদী পণ্ডিতদের ভিডিয়ো দেখেছিলাম বছর কয়েক আগে। তারা হিব্রু ভাষায় যুলকারনাইন উচ্চারণ করে এভাবে, 'বা'আল হাক্কারনাইম'। এরপর হিব্রু, ইহুদী ইত্যাদি ওয়েবসাইট ঘেটেঘুটে এই শব্দ নিয়ে যা পেয়েছি তা হলো, দুই শিং-এর ধারণাকে হিব্রুতে প্রকাশ করা হয় בַּעַל הַקְּרָנַיִם (Ba'al Haqqərānayim) দিয়ে, যার অর্থও হলো 'দুই শিং-এর মালিক/অধিকারী'।

বানান (হিব্রু): בַּעַל הַקְּרָנַיִם উচ্চারণ (আক্ষরিক): বা'আল হাক্কারনাইম (Ba'al Haqqərānayim)। এই শব্দটি বাইবেলে (Daniel ৮:২০) ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে—"দুই শিং বিশিষ্ট মেষ (the ram which thou sawest having the two horns) বলতে মাদায় ও পারস্যের রাজাদের বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে সাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করা হয়"। এই সাদৃশ্য থেকেই অনেকে যুলকারনাইনকে সাইরাস হিসেবে চিহ্নিত করেন।

আপনি যদি হিব্রুভাষী কাউকে যুলকারনাইন-এর ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তারা বা'আল হাক্কারনাইম শব্দটি ব্যবহার করবেন। এটা লিখে সঠিক উচ্চারণ বোঝানো যাবে, তাদের মুখ থেকে শুনে বুঝতে হবে। অনেকটা এমনই উচ্চারণ হবে, শুধু আলাদা টান বৃদ্ধি পাবে মৌখিক উচ্চারণে।

গ. ইয়েমেনের হিমিয়ারাইট রাজা (A Himyarite King of Yemen):

আংশিক মত; কোনো কোনো আরব ঐতিহাসিক, যেমন: ইবনে হিশাম, মনে করেন যুলকারনাইন আসলে হিমিয়ার সাম্রাজ্যের একজন রাজা ছিলেন, কারণ 'যু' (Dhu) উপাধিটি ইয়েমেনী রাজাদের নামের সাথে যুক্ত হতো।যেমন: 'যু-নুওয়াস', 'যু-ইয়াজান'।

যুলকারনাইন-এর পরিচয় নিয়ে কোরআন ও হাদীস উভয় ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে, ঐতিহাসিক দলিল ও কোরআনের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করলে, সাইরাস দ্য গ্রেট-এর পক্ষেই যুক্তিগুলো অধিকতর শক্তিশালী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। সব না মিললেও বেশ কিছু বিষয় মিলে যায়।

তবে, এই বিতর্কের বাইরে আমাদের একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে। দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষা। কারণ; কোরআন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, যুলকারনাইন যখন ওই অঞ্চলে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হন, যারা তাঁর ভাষা খুব কমই বুঝতে পারত।

“তিনি (ভ্রমণ করতে থাকলেন) যতক্ষণ না তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মাঝে পৌঁছালেন। তিনি সেখানে এমন এক জাতিকে পেলেন যারা তাঁর কথা (অর্থাৎ তাদের ভাষা) খুব কমই বুঝতে পারছিল।” [১]

ককেশাসের বিচ্ছিন্ন ভাষা: জর্জিয়ান ভাষা

এই ভাষাগত বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে প্রাকৃতিক প্রার্থী হলো জর্জিয়ান ভাষা– একটি প্রি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা, যা প্রায় ৫০০০ বছর ধরে এই অঞ্চলের মানুষের

---

১. সূরা কাহাফ, আয়াত ৯৩

মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মাধ্যম। এটা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও স্বতন্ত্র ভাষা, যা তৎকালীন বিশ্ব ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৯ম শতাব্দীর গর্জিয়ান ইতিহাসবিৎ লিওন্টি ম্রোভেলি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কার্টলিস ৎসকোভরেবা' (জর্জিয়ার জীবন) এ বর্ণনা করেছেন, কীভাবে রাজা পারনাভাজ জর্জিয়ান লিপি সৃষ্টি করেন এবং জর্জিয়ান ভাষাকে গোটা জর্জিয়ার প্রান্তিক অঞ্চলে বিস্তৃত করেন। পারনাভাজ ছিলেন ইউপ্লোসের বংশধর, যিনি মৎসখেতোস এবং কর্টলসের সন্তান ছিলেন, যারা নবৈতিহাসিক কাল থেকে জাফেথের [নূহ (আ.) পুত্র] বংশধর বলে বিবেচিত।

ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি— নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় শুরু

ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তির বিষয়টি নবী মুহাম্মদ (সা.) সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে– এই বিষয়টি সহীহ্ বুখারী হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট। কমপক্ষে আটটি হাদীসে এ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়, যা ইঙ্গিত করে যে মুক্তির প্রক্রিয়া প্রায় ১৪০০ বছর আগে 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী (সা.) একবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছিলেন:

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এপরিমাণ খুলে গেছে।"[১]

এই সময় নবী (সা.) তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির আগা এবং শাহাদাত আঙ্গুলের আগাকে মিলিয়ে এক গোলাকার ছিদ্রের আকার দেখিয়েছিলেন, যা প্রাচীরের ত্রুটিকে নির্দেশ করে।

ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র (রহ.) ... যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্ঠের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে (ছিদ্র হয়ে) গেছে। এ কথার বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলির অগ্রভাগকে তাঁর সাথের শাহাদাতের আংগুলির অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান

১. সহীহ্ বুখারী,হাদীস ৩৩৪৬

লোকজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ যখন পাপাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। (তখন অল্প সংখ্যক নেক লোকের বিদ্যমানেই মানুষের ধ্বংস নেমে আসবে।)[১]

ছিদ্রের পরিমাণ ও মুক্তির সংকেত

অন্য এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন যে ইয়াজুজ-মাজুজের দেওয়ালে একটি ছিদ্র হয়েছে, যার পরিধি প্রায় ৯০ সংখ্যার মতো। এই ছিদ্রের সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা ক্রমশ বড় হচ্ছে, যা মুক্তির অগ্রদূত।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন, যখন তিনি কাবার চারপাশে তাওয়াফ করছিলেন, তখন কালো পাথরের কোণায় এসে বলেছিলেন:
"আল্লাহু আকবার, ইয়াজুজ-মাজুজের দেওয়ালে এমন একটি ছিদ্র হয়েছে।"[২]

মুতাওয়াতির হাদীসের গুরুত্ব

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ শুধু একবার বা দুবার বর্ণিত হয়নি, বরং বিভিন্ন সাহাবী এবং বিশুদ্ধ সূত্র থেকে একাধিকবার আলাদা আলাদা ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মুতাওয়াতির হাদীস যা ইসলামীক শাস্ত্রে সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পন্ন।

অর্থাৎ, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরের ছিদ্র এবং তাদের মুক্তির সূচনা রাসূল (সা.) -এর সময় থেকেই ঘটতে শুরু করেছে, এটা একটি অটল সত্য। তথা বলা যেতে পারে তারা ধীরে ধীরে বের হয়েছে অর্থাৎ দুশমনরা সময়-অসময় এসে জোগাড় হয়েছে। কেয়ামতের আগমুহূর্তে এদের সংখ্যা আরও অধিক হবে, তখনই বলা যাবে পুর্নাঙ্গ মুক্তি সাথে তাদের ধ্বংস। আমি চেষ্টা করেছি আমার মতো বলার। ভুল হলে তাগিদ দেবেন। আমার বোঝার ধারা এমনই, আমি ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিকে বন্দী রাক্ষস জাতি মনে করি না, মানুষ জাতি মনে করি।

এই সূচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে ইয়াজুজ-মাজুজ এখনো মুক্তি লাভের পথে এবং তাদের কার্যকলাপ ধীরে ধীরে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা ইয়াজুজ-মাজুজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করব, যা তাদের সনাক্তকরণকে আরও স্পষ্ট ও সহজ করবে।

---

১. ইসলামীক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সহীহ বুখারী
২. সহীহ্ বুখারী

অভিশপ্ত ইহুদী পুনরুত্থান এবং জেরুজালেমের রহস্য

কোরআনে ইয়াজুজ-মাজুজকে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে সূরা আম্বিয়ার দুটি আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের কথা বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তায়ালা সেই শহরটিকে ধ্বংস করে দেন এবং এর অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করেন। সেই শহরের অধিবাসীরা "এই শহর আমাদের" এই দাবী নিয়ে আর কখনো ফিরে আসতে পারবে না বলেও ঘোষণা করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা তখন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্ত হয় এবং তারা পৃথিবীর প্রতিটি সুবিধাজনক স্থান দখল করে নেয়।

"নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে একটি শহরের উপর (জেরুজালেম), যাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, (এবং এর অধিবাসীরা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে)। তারা আর ফিরে আসতে পারবে না, যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ছে।"[১]

জেরুজালেম— নামহীন পবিত্র শহর

এই শহরের নাম কোরআনে সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি, যদিও এটা ইতিহাস, নবীগণের জীবনী ও বাইবেলের বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে এটা জেরুজালেম। এটা রহস্যময়, ধাঁধার মতো একটি ঘটনা কারণ; কোরআনে 'জেরুজালেম' বা 'কুদ্স/ বায়তুল মুকাদ্দাস' শব্দটি একটিবারও উল্লেখিত হয়নি, অথচ এটা এমন একটি শহর যা বহু নবীর সাথে জড়িত। এই শহরে মসজিদ আল-আকসা অবস্থিত, যা শুধু আল্লাহ্র গৃহই নয়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিরাজের সময় সেই অলৌকিক যাত্রার গন্তব্যস্থলও।

১. সূরা আম্বিয়া,আয়াত ৯৫-৯৬

শেষযুগে জেরুজালেমের গুরুত্ব

কোরআনের এই রহস্যময় আবরণ সম্ভবত শেষযুগের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক ঘটনার জন্য রাখা হয়েছে। কারণ; জেরুজালেম হবে শেষকালের মূল কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঘটনাবলি সংঘটিত হবে।

বর্তমানে জেরুজালেমের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই দেখা যায় যে, ঐ রহস্যের মেঘটি অনেকাংশে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইহুদীরা ঈসা (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করার পর তাঁকে হত্যা করেছে বলে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে গর্ব করে এবং বিশ্বাস করে যে মসীহর আগমন এখনো বাকি। তারা ভাবছে যে, মসীহের আগমনেব সঙ্গেই তাদের 'গোল্ডেন এজ' বা স্বর্ণযুগ প্রত্যাবর্তিত হবে।

ইহুদী প্রত্যাবর্তনের শর্তসমূহ

ইহুদীরা বিশ্বাস করে তাদের স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হতে হবে—

১. অ-ইহুদীদের হাত থেকে পবিত্রভূমি মুক্ত করতে হবে (তথা মুসলিম নিধন করতে হবে বা তাদের ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

২. নির্বাসিত ইহুদীরা পবিত্রভূমিতে ফিরে আসবে।

৩. ইসরায়েল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

৪. সোলোমনের (নবী সুলাইমান আ.) মন্দির পুনরুদ্ধার করা হবে।

৫. ইসরায়েল সমগ্র পৃথিবীর একটি মহাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৬. দাঊদ (আ)-এর সিংহাসনে বসে একজন ইহুদী রাজা শাসন করবে, যিনি হবে ঈশ্বর প্রদত্ত মসীহ। ৭. এই শাসন চিরস্থায়ী হবে।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

এই বিশ্বাসের সাথে মিলে যায় ইতিহাসের কিছু প্রধান ঘটনা:

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল অ্যালেনবি যখন তুর্কি মুসলিমদের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করেন, তখন থেকে পবিত্রভূমি ইহুদীদের জন্য মুক্ত বলে বিবেচিত হতে শুরু করে। প্রাচীন নির্বাসনের প্রায় ২০০০ বছর পর ইহুদীরা পুনরায় পবিত্রভূমিতে প্রত্যাবর্তন শুরু করে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায় এবং সেটাকে প্রাচীন ইসরায়েল দাবী করে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বইয়ের আগের

অধ্যায়ে জেনেছেন। এজন্য সবিস্তারে না বলে, আংশিক বললাম। বর্তমান ইসরায়েল পারমাণবিক অস্ত্র-সহ আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত।

ইসরায়েলের রাজনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি ‘ইন্তিফাদা’ এবং ৯/১১ হামলার পেছনে সন্দেহাতীতভাবেই ইসরায়েলের এবং এর গোপন সংস্থা মোসাদ ও মার্কিন সিআইএ-এর অংশগ্রহণ রয়েছে বলে বহু গবেষক মত প্রকাশ করেছেন। তথা, নাইন-ইলেভেন ছিল তাদের সৃষ্ট, যাতে পরিকল্পিতভাবে যোগ করা হয়েছে ওসামা বিন লাদেন এবং মুসলমানদের।

ইসরায়েল প্রতিবেশী অঞ্চলে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে চলেছে, যা তানাখ প্রতিশ্রুত ‘মিশর থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত’ অঞ্চল বিস্তারের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। এরপর মসজিদ আল-আকসার ধ্বংস ও সোলোমনের মন্দির পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ সম্ভাব্য।

নিষ্কর্ষ—ভণ্ড রাষ্ট্র ইসরায়েল

বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্র বাইবেলের ঐতিহাসিক ইসরায়েল নয়, এটা ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গঠিত একটি ভণ্ড রাষ্ট্র যা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাজ করছে।

এই বাস্তবতা ও সূচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, শেষকালে ইয়াজুজ-মাজুজের পুর্নাঙ্গ মুক্তি এবং তাদের কার্যকলাপ পৃথিবীর রাজনীতিতে কতটা বড় পরিবর্তনের সূচনা করবে।

কোরআনে জেরুজালেম—একটি নগরী হিসেবে রহস্যময় উল্লেখ

কোরআনে বারবার জেরুজালেমকে সরাসরি নাম নিয়ে উল্লেখ না করে কেবল একটি ‘নগরী’ বা ‘শহর’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। শেষযুগে জেরুজালেমের ভূমিকার ওপর আল্লাহর তরফ থেকে যে রহস্যময় মেঘের আবরণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যা এই নগরীর প্রতি বিশেষ এক নজরেই বোঝা যায়।

মূসা (আ.) যুগ ও সোনার বাছুরের পূজা

একবার নবী মূসা (আ.) সিনাই পর্বতের চূড়ায় আল্লাহর তলব পেয়ে গিয়েছিলেন, আর এই সুযোগে তাদের অনুসারীরা সামরির প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে সোনার তৈরি বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কোরআন স্পষ্টভাবে এই ধরনের

উপাসনাকে শিরক বলেছে, যার ফলাফল আল্লাহর শাস্তি। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সূরা কাহাফের চার ঘটনা অধ্যায়ে আংশিক বলেছিলাম। কেন এই ঘটনার অবতারণা এখানে আনলাম, তার কারণ একটু পরেই পেয়ে যাবেন।

“অবশ্য যারা ঐ (সোনার) বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই ক্রোধ ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। যারা (আল্লাহর বিরুদ্ধে) মিথ্যা আবিষ্কার করে, এভাবেই আমরা তাদের শাস্তি দিয়ে থাকি। আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তওবার পর ক্ষমাকারী ও করুণাময়।”[১]

সিনাই মরুভূমিতে বনী ইসরায়েলের অবস্থান ও তাদের বিভাজন

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরায়েল তখন সিনাই মরুভূমিতে অবস্থান করছিল এবং তারা ১২টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ মূসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পাথরে যষ্ঠি দিয়ে আঘাত করার জন্য, যার ফলে বারটি জলধারা থেকে বের হয় এবং প্রতিটি গোত্র তাদের নিজ নিজ জমিতে আবাস গড়ে তোলে। আল্লাহ্ তাদের জন্য মেঘের ছায়া ও মন্না ও সাল্ওয়া বর্ষণ করেন।

“আর আমি তাদেরকে (বনী ইসরায়েলকে) ১২টি গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি এবং নির্দেশ দিয়েছি মূসাকে, যখন তাঁর কাছে তাঁর সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হলো বারটি প্রশ্রবণ। প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাটি। আর আমি তাদের উপর মেঘের ছায়া দান করলাম এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মন্না ও সাল্ওয়া এবং বললাম, আমি তোমাদের জন্য যে উত্তম আহার্য দান করেছি, সেখান থেকে আহার কর। কিন্তু তারা বিদ্রোহ করল; তারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদের আত্মারই ক্ষতি করল।”[২]

জেরুজালেমের নগরীতে বসবাস ও আদর্শ আচরণ

কোরআন জেরুজালেমকে শুধু ‘একটি নগরী’ হিসেবে উল্লেখ করে সেখানে বাস করার নির্দেশ দেয় এবং তাদেরকে বিনয়, প্রণতি ও দয়াশীলতার সাথে বাস করতে আহ্বান জানায়। আল্লাহ আশ্বাস দেন, যারা সৎকর্ম করবে, তাদের দোষ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের জন্য অতিরিক্ত সৎফল বর্ষণ করবেন।

---

১. সূরা আ'রাফ,আয়াত ১৫২-১৫৩
২. সূরা আ'রাফ,আয়াত ১৬০

"আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হলো যে, তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং তোমাদের যেমন ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু বিনয় সহকারে কথাবার্তা বল এবং প্রণত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেব; অবশ্যই আমি সৎকর্মীদের অতিরিক্ত দান করব।"[১]

ইয়াজুজ মাজুজ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর নিষেধাজ্ঞা

কোরআনে আরও একটি রহস্যজনক নগরীর কথা উল্লেখ আছে, যাকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং তার অধিবাসীদেরকে আর ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই নিষেধাজ্ঞা তখন পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ না ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তারা পৃথিবীর সব উচ্চভূমি থেকে দ্রুত নেমে এসে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

"এবং যে শহরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবশ্যম্ভাবী; যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হয় এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসে।"[২]

ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থায় শাসন

যখন ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীর প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে নেমে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং তাদের একটি বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা পুরো মানবজাতির ওপর শাসন করবে।

কোরআনের এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, জেরুজালেমকে সরাসরি নাম না দিয়ে শুধু একটি নগরী হিসেবে উল্লেখ করার পেছনে শেষযুগের এক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি, তাদের বিস্তার ও বিশ্ব-শাসনের আগে পর্যন্ত এই নগরীর ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

এছাড়া, অতীত ও বর্তমান ইতিহাস মিলিয়ে বোঝা যায় যে, এই নগরীর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব শেষযুগের গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

জেরুজালেম- এক 'অজ্ঞাত নগরী'

কোরআনে জেরুজালেম শহরকে সরাসরি নাম নিয়ে উল্লেখ না করে একাধিক স্থানে 'একটি নগরী' বা 'ঐ ভূমি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা একটি গভীর রহস্য ও

---

১. সূরা আ'রাফ,আয়াত ১৬১
২. সূরা আম্বিয়া,আয়াত ৯৫-৯৬

সতর্কতার প্রতীক, যা শেষযুগে জেরুজালেমের বিশেষ ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অবশ্যই এমন কোনো রহস্য আছে, যা আমাদের জানার পরিধির বাইরে। কোনো হিকমত না থাকলে অবশ্যই 'রাব্বে কারীম' তা উল্লেখ করতেন। সেই গূঢ় রহস্য কী, তা একদিন প্রকাশ করবেন স্বয়ং আমার 'রাব্বে কারীম'।

বনী-ইসরায়েলের দুইবারের ফ্যাসাদ এবং শাস্তি

আল্লাহ্ বনী-ইসরায়েলকে সতর্ক করেছিলেন তাদের দুইবার ঐ ভূমিতে দুর্নীতি ও ভয়ংকর অত্যাচার সৃষ্টি করার বিষয়ে এবং দুইবারই তারা সেই অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি পাবে। কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে:

"আমি বনী-ইসরায়েলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা দুইবার ঐ ভূমিতে ফ্যাসাদ (দুর্নীতি ও ভয়ংকর অত্যাচার) সৃষ্টি করবে এবং শক্তিমদমত্ত হয়ে অহংকারী হয়ে উঠবে; এবং দুইবারই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।"[১]

প্রথমবারের শাস্তি ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে। তখন বখতে-নাসারের নেতৃত্বে ব্যাবিলনীয় বাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে, শহর পুড়িয়ে দেয়, বহু বাসিন্দাকে হত্যা করে এবং সুলাইমান (আ.)-কর্তৃক নির্মিত মসজিদ ধ্বংস করে দেয়। ইহুদীদের উল্লেখযোগ্য অংশকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনাটি নবী ইয়ারমিয়া (Jeremiah) বাইবেলে পূর্বেই সতর্ক করেছিলেন।

দ্বিতীয়বারের শাস্তি আসে খ্রিষ্টাব্দ ৭০ সালে, যখন যীশুক ক্রুশবিদ্ধ (তাদের ভ্রান্ত ধারণা মতে, ঈসা নবী কখনোই ক্রুশবিদ্ধকরণ হননি।) করার পর ইহুদীরা গর্বিত হয়ে উল্লাস করেছিল। তখন রোমান সেনাপতি টাইটাসের নেতৃত্বে রোমান বাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে শহর ধ্বংস ও অধিবাসীদের হত্যা করে। পবিত্র মসজিদ আল-আকসাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে নবী ঈসা (আ.) সতর্ক করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন, "একটি পাথরও অপর পাথরের উপর থাকবে না; সব ভেঙ্গে যাবে।"

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

কোরআনে আরও উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য ঐ ভূমি উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন—

"আমি উপদেশের পর (তাওরাত নাযিলের পর) যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎ বান্দারা ঐ ভূমির উত্তরাধিকার লাভ করবে।"[২]

---

১. সূরা বনী-ইসরায়েল, আয়াত ৪

২. সূরা আম্বিয়া,আয়াত ১০৫

জায়োনবাদ ও আধুনিক জেরুজালেমের রাজনীতি

১৮৯৭ সালে জায়োনবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়, যা মূলত একটি সেক্যুলার আন্দোলন হিসেবে যাদের আল্লাহর ধারায় বিশ্বাস ছিল না, তারা 'গড প্রোমিসড ল্যান্ড' বা ঈশ্বর প্রদত্ত ভূমিতে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। 'জায়োন' নামটি এসেছে জেরুজালেমের 'জুডাহ' পাহাড় থেকে।

ইউরোপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বর্ণবাদ ও সংখ্যালঘু ইহুদী নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায়, প্রধানত আশকেনাজি ইহুদীরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তারা নিজেদের 'গডের নির্বাচিত জাতি' বলে দাবী করলেও, আদতে এটা একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছিল, যার মাধ্যমে তারা পবিত্র ভূমিতে ফিরে আসার পথ প্রস্তুত করেছিল।

১৯১৩ সালে ফেডারেল রিজার্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ১৯১৪ সালে খাযার ইহুদীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে তারা তুরস্কের অটোমান খিলাফতকে যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করে, মুসলিম বিশ্বকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলে। এতে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যভঙ্গ হয় এবং আরব বিশ্বে জাতীয়তাবাদের বিষ রপ্তানি হয়। মক্কা-মদিনার খাদেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় জায়োনিস্ট এজেন্ট আল-সউদ।

প্রচলিত ইতিহাসে এই তথ্য পাওয়া যায় না, গতানুগতিক ইতিহাসে পাওয়া যায়– প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরু হয়েছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যান্ডকে সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা হত্যার পর ইউরোপীয় জোটগুলোর (Triple Entente vs. Central Powers) মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা থেকে।

আল-সউদ পরিবার ছিল আরব উপদ্বীপের একটি গোত্র, যারা ব্রিটিশদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে অটোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং ১৯৩২ সালে সৌদি আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। খেলাফত শাসনব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য শুধু জায়োনিস্ট ইহুদী আর খ্রিষ্টান অপশক্তি দায়ী ছিল না, আরবের সৌদ বংশের জায়োনিস্ট এজেন্টরাও দায়ী ছিল।

'এ হিস্টোরি অব সৌদি অ্যারাবিয়া' বইয়ে মাদাবি আল রাশেদ লিখছেন, প্রথমে রাশিদিদের পরাজিত করে পুরো নজদের দখল নিয়ে নেন ইবনে সউদ। এরপর হজ যাত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে ১৯২৪ সালে হেজাজে সামরিক অভিযান শুরু করেন ইবনে সউদ। ততদিনে শরিফ হুসেইনের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্কে

ফাটল দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ সহায়তা না পেয়ে আকাবায় পালিয়ে যান শরিফ হুসেইন। ফলে পুরো হেজাজ এবং নজদের নিয়ন্ত্রণ আসে ইবনে সউদের হাতে।

মক্কা মদিনা ও জেদ্দার নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পর ১৯২৬ সালে আবদুল আজিজ বিন সউদ নিজেকে হেজাজের বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। আগে থেকেই তিনি ছিলেন নজদের সুলতান। পরের বছরের জানুয়ারিতেই তিনি নজদ এবং হেজাজ মিলিয়ে 'কিংডম অব নজদ অ্যান্ড হেজাজ' ঘোষণা করেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃতিও আদায় করেন।

যদিও সেসময় তিনি নিজের পদবি ইমাম হিসাবেই বলতেন। যদিও দাপ্তরিক সব কাজকর্মে তাকে বাদশাহ হিসাবেই বর্ণনা করা হতো। এরপর তিনি আরবদের চিরাচরিত জীবনযাপনের ধরনেও পরিবর্তন আনার নির্দেশ দেন।

১৯৩২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর একটি বাদশাহী ডিক্রি জারি করে হেজাজ এবং সউদকে এক দেশ হিসাবে ঘোষণা করেন ইবনে সউদ। ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি রাজকীয় আদেশ জারি করেন যে, এখন থেকে আরব অঞ্চল 'আল মামলাকাতুল অ্যারাবিয়া আস-সাউদিয়া' বা রাজকীয় সৌদি আরব নামে পরিচিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক চার্লস ক্রেনের সহায়তা কার্ল এস উইটশেল ১৯৩২ সালে সৌদি আরবে এসে তেলের সন্ধানে একটি জরিপ শুরু করেন। এরপর ১৯৩৫ সাল থেকে ড্রিলিং শুরু হয় আর ১৯৩৮ সালে প্রথম তেলের উৎপাদন শুরু হয়। এরপর থেকেই পুরো সৌদি আরবের চেহারা বদলে যেতে শুরু করে। যা বিট্রিশদের দালালি দিয়ে শুরু হয়েছিল, সেটা রঙ বদলে রূপ নেয় জায়োনিস্ট ইহুদী ও আমেরিকার দালালি হিসেবে। এরপর কী হয়েছিল, তা বইয়ের আদিতে পড়েছেন ইতোমধ্যে। তাই সেদিকে আর যাচ্ছি না

প্রচলিত ইতিহাস যায় বলুক, তবে ইতিহাসের গোপন সত্য উঁকি দিয়ে বলে, টাইটানিক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, ফেডারেল রিজার্ভ প্রতিষ্ঠা অতঃপর একটা যুদ্ধ। পরিণতি খেলাফত শাসনব্যবস্থার পতন, মুসলিম শাসকদের গদিচ্যুত হওয়া। সবকিছুর মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কীভাবে?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্চার জেমস বেলফোর একটি চিঠি লেখেন ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে, যা পরে 'বেলফোর ঘোষণা' নামে পরিচিত হয়। এই চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় ইহুদীদের জন্য পবিত্র ভূমিতে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে।

বেলফোর ঘোষণা একটি সরকারি ঘোষণা না হলেও, এর প্রভাব ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে এবং ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। রথচাইল্ড পরিবার, ফেডারেল রিজার্ভ, বেলফোর ইত্যাদি বিষয় ইতোমধ্যে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু প্রাসঙ্গিকতা ঠিক রাখার জন্য আলোকপাত করলাম।

এইভাবে, কোরআনের সতর্কবার্তা, ইতিহাসের দুইবারের শাস্তি, জায়োনবাদী আন্দোলন ও আধুনিক বিশ্ব-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, জেরুজালেম এবং পবিত্র ভূমি শুধু একটি ভূখণ্ড নয়, এ এক গভীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মহাযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের অধীনে ইসরায়েলকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। আমেরিকা এই স্বাধীনতার প্রথম রাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রদানে দ্রুত এগিয়ে আসে এবং মেসীয়াহর মতো ভূমিকা পালন করে। এরপর আমেরিকা ইসরায়েলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় দেশগুলোর সমন্বয়ে ১৯৪৯ সালে ন্যাটো (NATO) গঠন করে।

ন্যাটো হলো জায়োনিস্ট ইহুদী-খ্রিষ্টান মিত্রদের একটি জোট, যারা ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষায় যে-কোনো সময় যে-কোনো দেশে হামলার জন্য প্রস্তুত থাকে। লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোতে এ যুদ্ধবিরোধী ন্যাটোর কার্যক্রম তার প্রমাণ।

বিশেষ করে তুরস্কের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি রাষ্ট্রকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করা ইসরায়েলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা এনেছে। মুসলিম বিশ্বে হামলার জন্য তুরস্কের এয়ারবেস ব্যবহার করে ইসরায়েল ও তার মিত্ররা বড় সুফল পাচ্ছে।

ইসরায়েল: ইয়াজুজ-মাজুজের ব্লাডলাইন

ইসরায়েল এমন একটি রহস্যময় রাষ্ট্র, যার সীমানা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য মিশরের নীলনদ থেকে শুরু করে ইরানের সীমান্তবর্তী ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ এমন এক বিরাট এলাকা যেখানে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত চলমান সহিংসতা থামবে না।

ইতিহাসের আলোকেও আমরা জানতে পারি, যারা আজ পবিত্রভূমিতে নিজেদের 'GOD's chosen People' দাবী করে সন্ত্রাস ও অস্থিরতা ছড়াচ্ছে, তারা আসলে আদৌ দাউদ (আ.) বা ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর নয়, এরা খাযার

ইহুদী, অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজের ব্লাডলাইন। এরা প্রকৃত বনী ইজরায়েলীয় নয়[১]। অনুযায়ী, এই জায়োনবাদী ইহুদীরাই পবিত্রভূমিতে ফিরে এসে ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেছে।

খাযার ইহুদী

এই জায়োনবাদী ইহুদীদের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, যদিও তা খুব সীমিত আকারে। কারণ; জায়োনবাদীরা আজ বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন শ্রেণিতে অবস্থান করায়, তাদের বিরোধী অনেক লেখা প্রকাশ পায় না।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ও জেনেটিক্স গবেষক ড. এরান এলহাইক তার গবেষণায় প্রমাণ দিয়েছেন যে, বর্তমান ইহুদীরা মূলত খাযারিয়ার বাসিন্দা; তারা ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর নন। এরা কিং বুলান নামক খাযার শাসকের উত্তরসূরী, যাদের পূর্বপুরুষরা ককেশাস অঞ্চলের মূর্তিপূজক বা স্যাটানিক উপাসক ছিলেন। ৮ম শতকে তারা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে, যা ইসলামের আগমনের অনেক পরে।

অর্থাৎ, আধুনিক ইসরায়েলের সন্ত্রাসবাদী ইহুদীরা কখনোই আদিম ইসরায়েলের বাসিন্দা বা প্রকৃত বনী ইসরায়েল ছিল না। খাযাররা পরবর্তীতে রাশিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়। পরে ইউরোপ ও আমেরিকার সরাসরি সহায়তায় তারা পবিত্রভূমি দখল করতে সক্ষম হয়।

তবে, অনেক গবেষক মনে করেন, আশকেনাজি ইহুদীদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সেমিটিক এবং ইউরোপীয় উভয় জনগোষ্ঠীর ডিএনএ-এর মিশ্রণ রয়েছে। অর্থাৎ, তারা সম্পূর্ণভাবে খাযার বংশোদ্ভূত নয়, তাদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের আদি বংশধারারও উপস্থিতি আছে।

ঐতিহাসিক ও ভাষাগত প্রমাণসমূহ

১৮৬৭ সালে ইহুদী স্কলার আব্রাহাম হারকাভি স্পষ্ট করেন যে, আজকের ইহুদী ভাষা, ইদিশ ভাষা প্রকৃতপক্ষে খাযার ভাষার বিকৃতি। অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষ কেনানের অধিবাসী নয়, ককেশাসের আর্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

তবে, অনেক ভাষাবিদ এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলেছেন যে, ইদিশ (Yiddish) ভাষা মূলত মধ্য-ইউরোপের উচ্চ জার্মান (High German) ভাষার একটি উপভাষা,

১. সূরা আম্বিয়া,আয়াত ৯৬

যেখানে কিছু হিব্রু ও স্লাভিক ভাষার শব্দ মিশেছে। ইদিশ ভাষার উৎপত্তি নিয়ে খাযার ভাষার সম্পর্ক একটি প্রান্তিক (marginal) তত্ত্ব বলে মত দিয়েছে।

১৮৯৯ সালে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হিউস্টোন স্টুয়ার্ট চ্যাম্বারলেন 'দ্যা ফাউন্ডেশন অব দ্যা নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইহুদীরা একটি জাতি নয় বরং 'শিকড়হীন' জনগোষ্ঠী। এছাড়া, ১৯৭৬ সালে ইহুদী লেখক আর্থার কোস্টলার 'The Thirteenth Tribe' বইতে প্রমাণ করেছেন যে, আসকেনাজী ইহুদীরা আসলে ১৩তম গোত্র, যাদের খাযার বংশ বলে বিবেচনা করা হয়। এরা নবী ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর নন।

বাস্তবত, আধুনিক ইসরায়েলী ইহুদীর ৯০% সাদা, নীলচে চোখ এবং সোনালি চুলের অধিকারী। শারীরিকভাবে এদের আরব বংশের সাথে মিল থাকা উচিত ছিল, কারণ আরবরা ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর এবং ইসরায়েলীরা ইসহাক (আ.)-এর বংশধর। তবে, আধুনিক ইসরায়েলী ইহুদীরা খাযার বংশোদ্ভূত হওয়ায় আদি ইসরায়েলীরা থেকে শারীরিক ও বংশগত ভাবে পৃথক। ইহুদীদের পবিত্রভূমিতে প্রত্যাবর্তন মূলত ইয়াজুজ-মাজুজের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

গ্যালিলী হ্রদের সংকট ও ইয়াজুজ-মাজুজের পানির অপচয়

পবিত্র ভূমির প্রধান মিঠা পানির উৎস হিসেবে গ্যালিলী হ্রদ (অথবা টাইবেরিয়াস, কিনেরেট হ্রদ) দীর্ঘদিন ধরে ইজরায়েলী, ফিলিস্তিনি এবং জর্ডানবাসীদের জীবন নির্বাহের জন্য অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে। যেসব মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করেন, তারা তাদের পানির চাহিদার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে এই হ্রদের ওপর নির্ভরশীল।

যদি কোনো কারণে গ্যালিলী হ্রদ শুকিয়ে যায়, তা হলে ইজরায়েলীরা সহজেই সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা দূরীকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের পানির অভাব পূরণ করতে পারবে। কিন্তু ফিলিস্তিনি ও জর্ডানির জন্য এই ধরনের বিকল্প নেই। ফলে, তারা পানির জন্য ইসরায়েলের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যাবে।

ইসরায়েলী শাসকদের সুদী অর্থনীতির চালিকাশক্তি ইতোমধ্যেই ফিলিস্তিনিদের দারিদ্রসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে, ফলে তাদের জন্য পানির এই প্রকল্প থেকে পানি কেনার সামর্থ্যও থাকবে না। এর দরুন ফিলিস্তিনি ও জর্ডানিরা পানির জন্য রাজনৈতিকভাবে ইসরায়েলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আর যদি তা করতে না পারে, তাহলে তাদের বেঁচে থাকার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তমানে গ্যালিলী

হ্রদের পানির স্তর এমন নিম্নমুখী যে, ইসরায়েল 'পানির চাল' ব্যবহার শুরু করার সময় খুব কাছাকাছি। পানির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এর আগের অধ্যায় বলা হয়েছে।

কোরআন ও পানির মহত্ত্ব

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক জীবন্ত সত্তার সৃষ্টি পানির মাধ্যমেই হয়েছে[১]। পানিকে 'মা' বলা হয়েছে, অর্থাৎ সকল জীবের প্রাণধারণের মূল উৎস। আরও বলা হয়েছে, আল্লাহর আসন, অর্থাৎ তাঁর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পানির ওপর অবস্থিত ছিল।[২]

অতএব; পানিকে সম্মান করা এবং অপচয় কঠোরভাবে বর্জন করা। পানির অপচয় রোধ করা। পানি আল্লাহর অশেষ নেয়ামত।

নবী (সা)-এর হাদীসে পাওয়া যায়, ইয়াজুজ-মাজুজরা এমন মাত্রায় পানির অপচয় করবে যে, পবিত্র ভূমির গ্যালিলী সাগর (টাইবেরিয়াস হ্রদ) পর্যন্ত শুষ্ক হয়ে যাবে।

"...তাদের প্রথমজন যখন টাইবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে, সে সেখান থেকে পানি পাবে; আর যখন তাদের শেষজন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে, একসময় এখানে পানি ছিল...।"[৩]

অর্থাৎ, ইয়াজুজ-মাজুজদের অতিমাত্রায় পানির অপব্যবহারে প্রকৃতিও জলাধার পূরণ করতে পারবে না, ফলে হ্রদের পানির উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকবে যতক্ষণ না হ্রদ শুকিয়ে যাবে। এরা শুধু পৃথিবীর পানির সম্পদ ধ্বংস করবে না, পানির প্রতি সম্মানকেও ম্লান করবে।

আমরা হয়তো ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকৃত স্বরূপ ও পানির মূল্য বুঝতে পারি না, কিন্তু ইসরায়েল যারা তাদের পানি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করে ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করছে, তারা পানির এই মূল্য ও সংকট ভালো করেই জানে।

রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, "প্রবাহমান নদীর তীরে বসেও এক ফোঁটা পানির অপচয় করো না।" কারণ; পানি হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। রাসূল (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, গ্যালিলী সাগরের পানির উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, যা ইয়াজুজ-মাজুজদের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রমের প্রমাণ।

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩০
২. সূরা হুদ, আয়াত ৭
৩. সহীহ্ মুসলিম

অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জেরুজালেমে ফিরে আসা খাযার ইহুদীরা কৃষি ও শিল্প খাতে গ্যালিলী সাগরের পানি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে আসছে, যা একদিন এই হ্রদকে শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত করবে।

বাইবেলেও গ্যালিলী সাগরের শুষ্ক হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়–
"মেসীয়াহ... গ্যালিলী ভূমিতে আবির্ভূত হবেন, কারণ এই পবিত্র ভূমির এই অংশে প্রথম Babilonian নির্বাসন শুরু হয়েছিল, তাই তিনি এখানে প্রথম প্রকাশ পাবেন।"[১]

গ্যালিলী সাগরের পানি এতটাই কমে গেছে যে, পানির পাম্প চালানোই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। ইসরায়েলী পানির কর্তৃপক্ষ Mekorot জানিয়েছে, এই পানির স্তর এত নিম্নে নেমে এসেছে যে, পাম্পগুলো কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে না। এই পাম্পগুলোর মাধ্যমে আগে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কৃষি ও কলকারখানার জন্য পানি সরবরাহ করা হতো। ইসরায়েল সরকার নির্বিচারে এই মূল্যবান পানিকে অপচয় করছে।

Lake Kinneret কর্তৃপক্ষের Yitzhak Gal জানান– "আমাদের গবেষণায় নিশ্চিত হয়েছি, গত ১৫০ বছরের মধ্যে গ্যালিলী সাগরের পানির পরিমাণ এখন সবচেয়ে কম। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা রোমান যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পানি মজুদের তুলনা করেছি এবং এখনকার অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ।"

---

১. Zohar III, Shemoth ৭b, ৮b, ২২০a; Otzar Midrashim, ৪৬৬

আরবদের প্রতি ইয়াজুজ-মাজুজের বৈরিতা ও তাদের ভাগ্য

ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে আরব জাতির সম্পর্ক হবে গভীর বৈরিতা এবং নিপীড়নের। তারা আরবদের বিশেষভাবে অত্যাচারের শিকার করবে। এই নিপীড়ন শুধু শারীরিক নয়, সাম্প্রদায়িক অবজ্ঞা, অবহেলা এবং মানবতার চোখে আরবদের প্রতি ঘৃণার প্রচারও থাকবে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, ক্রুসেড যুদ্ধকালীন সময়ে আরবরা পরাজিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী যুগে জেরুজালেমে ইহুদী আগ্রাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৯/১১- 'False Flag অপারেশন' এবং তারপর 'War on Terror' নামক যুদ্ধে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া-সহ আরব অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে ন্যাটোর বোমাবর্ষণ এই নিপীড়নের ধারাবাহিক অংশ। সাথে আফগানিস্তানে আগ্রাসন। যাতে শিশু-নারী হত্যা করে ন্যাটো বাহিনী। নাইন-ইলেভেন ছিল আমেরিকার পরিকল্পিত নাটক। যাকে ঢাল বানিয়ে এরা মুসলিম দেশগুলোতে আগ্রাসন চালিয়ে গেছে।

ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণে ইসলামী খেলাফত ও বৈধ হজ প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকবে না। তাদের দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইয়াজুজ-মাজুজীয় শাসনব্যবস্থা যতদিন অব্যাহত থাকবে, ততদিন ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন বা সঠিক হজের আয়োজন করা সম্ভব হবে না।

আরবদের উপর ইয়াজুজ-মাজুজের নিপীড়ন শুধু শারীরিক নির্যাতন নয়, একটি গভীর সামাজিক ও মানসিক অবজ্ঞার মাধ্যমে বিশ্বের আরব সমাজকে বিচ্ছিন্ন ও একাকী করে ফেলার ষড়যন্ত্র। এখানে বলে রাখা জরুরি যে, 'আরব' মানে দেশ 'সৌদি আরব' নয়। আরব অর্থে মধ্যপ্রাচ্যের আরবীয় দেশও বলা যেতে পারে আবার অ্যারাবিক কোরআন অনুসরণ করা অর্থাৎ বিশ্বের সকল মুসলমানও হতে পারে। মানে আমাদের বাংলাদেশও এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ; আমরা মুসলমানরা

সবাই কোরআন অনুসরণ করি। এখানে শুধু আরব বলতে নির্দিষ্ট সৌদি আরবকে ইঙ্গিত করা হয়নি, সমগ্র মুসলমানদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। আপনাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই, এটা ভাবার অবকাশ নেই যে, যা হবার সৌদি আরবের সাথে হবে। এমন ভাবলে ভুল ভাববেন। এখানে পৃথিবীর সকল মুসলমান অর্থে 'আরব' ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা এমন এক ধাঁচে পরিচালিত হচ্ছে যা সম্পদের প্রবাহকে সমাজের সব অংশে ছড়িয়ে দেয় না; বলা যায় শুধু ধনী ও ক্ষমতাশালীদের মধ্যেই সম্পদ সীমাবদ্ধ। ফলে, ধনীরা স্থায়ীভাবে ধনী হয়ে থাকেন, আর দরিদ্ররা একধরনের দারিদ্র্যের জটিল জালে বন্দী হয়ে পড়েন। এই ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনৈতিক-ব্যবস্থায় ধনীরা যেন 'জোঁকের মতো' গরিবদের রক্ত শোষণ করে নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদ আরো বাড়িয়ে নিচ্ছে। এর ফলে দরিদ্র জনগণ দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, মূল্যবোধের অবক্ষয়-সহ বিভিন্ন দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে।

আমি এই পর্যায়ে একটা সিনেমার উদাহরণ টানব। কোরিয়ান একটা সিনেমা দেখেছিলাম। নাম: 'হিউম্যান, স্পেস, টাইম এন্ড হিউম্যান' (Human, Space, Time and Human) সিনেমাটি ধনী-গরিবের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তার ফলস্বরূপ সৃষ্ট শোষণ ও নিপীড়নের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে। সিনেমার জাহাজটি যেন আমাদের এই পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, যেখানে ক্ষমতার ভারসাম্যতা কতটা ভঙ্গুর এবং কীভাবে তা মানুষকে দানবে পরিণত করতে পারে, তা নিদারুণভাবে দেখানো হয়েছে।

সিনেমার শুরুতে দেখা যায়, জাহাজে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষজন থাকলেও, একটা দুর্ঘটনার পর যখন সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যখন খাবার ও সম্পদের অভাব দেখা দেয়, তখনই ধনী এবং ক্ষমতাবানদের বিকৃত রূপ বেরিয়ে আসে। তারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে দুর্বল ও দরিদ্রদের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। ছিনিয়ে নেয় গরিবের খাবার, এতে হত্যার মতো নৃশংসতাও তারা প্রকাশ করে। সিনেমার কিছু চরিত্র যারা সমাজের উচ্চ স্তরের প্রতিনিধি ছিল, যেমন: রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী, তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ধরে রাখতে এবং টিকে থাকার জন্য যে-কোনো অনৈতিক কাজ করতে দ্বিধা করে না।

সম্পদের অভাব যত বাড়তে থাকে, শোষণের মাত্রাও তত তীব্র হয়। খাবার এবং পানির মতো মৌলিক চাহিদাগুলো হয়ে ওঠে ক্ষমতার হাতিয়ার। যারা শক্তিশালী, তারা দুর্বলদের থেকে খাবার কেড়ে নেয়, তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক

নির্যাতন চালায় এবং এমনকি যৌন সহিংসতাও ঘটায়। সিনেমাতে এই দৃশ্যগুলো অত্যন্ত নির্মমভাবে দেখায় যে, যখন সমাজ থেকে আইন, নৈতিকতা ও মানবিকতা উঠে যায়, তখন কীভাবে ধনীদের হাতে গরিবরা চরমভাবে শোষিত হয়। সিনেমার একটি মূল বার্তা হলো, এই শোষণ শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটা শারীরিক এবং মানসিক স্তরেও ঘটে থাকে।

নির্মাতা 'কিম কি-দুক' এই সিনেমার মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান বাস্তবতার এক কঠোর সমালোচনা করেছেন। আমাদের সমাজে যেমন অল্প কিছু ধনী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং দরিদ্ররা তাদের শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, তেমনি জাহাজের ভেতরের পরিস্থিতিও একই চিত্র তুলে ধরে। এখানে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামরত মানুষেরা যেন সমাজের শোষিত শ্রেণিরই প্রতিচ্ছবি। নির্মাতা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই বৈষম্য যদি চলতে থাকে, তাহলে একসময় হয়তো আমাদের এই পৃথিবীও ঐ জাহাজের মতোই এক ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হবে, যেখানে মানবতা বিলীন হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে তা যে হয়ে গেছে, সেটা আমাদের চোখের সামনেই দৃশ্যমান।

এই শোষণের মাঝেও কিছু চরিত্র মানবিকতার শেষ বিন্দুটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করে। সিনেমার বৃদ্ধ ব্যক্তিটি বা অন্য কিছু চরিত্র নিজেদের সীমিত সম্পদ ভাগ করে নিতে চায় এবং অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করে। এটা যেন এই প্রশ্নই তোলে যে, চরম সংকটের মুখেও কী মানুষ তার মানবিকতা ধরে রাখতে পারে, না কি অধিকাংশ মানুষই শোষক বা শোষিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়?

সব মিলিয়ে, 'হিউম্যান, স্পেস, টাইম এন্ড হিউম্যান' সিনেমাটি অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের এক মর্মান্তিক চিত্র। এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এই বৈষম্য দূর করতে না পারলে আমাদের সমাজের পরিণতিও ঐ জাহাজের মতোই ভয়াবহ হতে পারে।

জাহাজের নিচের ডেকে বা মালবাহী স্থানে অবস্থান করছে বিশ্বের দরিদ্র ও শ্রমজীবী জনগণ, যারা দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে ধনীদের বিলাসবহুল জীবনধারণের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই দরিদ্র জনগণের জীবন নিরাপত্তাহীনতায় ভরা; চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, নারী-নির্যাতন ইত্যাদি তাদের নিত্যসঙ্গী।

তবে, জাহাজের প্রথম শ্রেণির ধনীদের জন্য উন্নত মানের পরিষ্কার পানি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে দরিদ্র জনগণ দূষিত

পানি পান করে, রাসায়নিক-জাতীয় ও জেনেটিকালি পরিবর্তিত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু চিকিৎসা নেওয়ার সামর্থ্য থাকে না।

এই সমাজব্যবস্থা আসলে একধরনের 'অর্থনৈতিক দাসত্ব' যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও প্রতারণার মাধ্যমে বজায় রাখা হয়েছে।

বিশ্ব-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী যারা 'মুক্ত ও সৎ বাজারের' কথা বলেন, তারা নিজেরাই মানুষের হাতে কাগজের মুদ্রা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেন, যা ক্রমশ নিজের মূল্য হারাচ্ছে। যখন দরিদ্রতার গভীরতা বৃদ্ধি পায়, তখন এই গোপনশীল শাসকগোষ্ঠী মৌলিক খাদ্য ও শ্রমবাজারে কৃত্রিম মূল্যনিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যাতে দরিদ্র জনগণ বিদ্রোহ করতে না পারে এবং নিপীড়নের সত্যতা বুঝতে না পারে।

কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো এই অবস্থা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। মানব ইতিহাসে এত উন্নত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা কখনোই হয়নি, কিন্তু এত বৃহৎ বৈষম্য আর কখনো দেখা যায়নি। তিনি বলেছিলেন, "এই অন্যায্য অর্থনৈতিক বিন্যাসের বিচার করার জন্য আরেকটি নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের প্রয়োজন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পৃথিবীতে এমন একটি অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে কেউ দাস হিসেবে কাজ করত না, সম্পদ সকলের মাঝে সমানভাবে প্রবাহিত হতো, আর ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য স্থায়ী হতো না। তৎকালীন বাজার ছিল মুক্ত, সুবিচারভিত্তিক এবং মুদ্রার নিজস্ব মূল্য ছিল। রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ ছিল, তাই ব্যাংক ও লুণ্ঠনজীবীরা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে পারত না। মজুরি বা দ্রব্যমূল্য আরোপ করা হতো না; কর্মক্ষম মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণে কর সংগ্রহ করা হতো। সমাজে মূল্যবোধ এমন ছিল যে, যারা দানের সামর্থ্য রাখত তারা দান করেই দরিদ্রদের সাহায্য করত।

আজকের অধিকাংশ সরকার যেখানে ব্যর্থ, রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে সফল হয়েছিলেন। ইসলামী যুগের প্রথম দশকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি এতটাই ছিল যে, জাকাত আদায় করতে হতো না, কারণ কেউ জাকাতের যোগ্যতা অর্জন করত না।

আজকের নিপীড়নমূলক অর্থনৈতিক-ব্যবস্থার সূত্রপাত কোথায় এবং কারা এটা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই জরুরি।

বিশ্বকে শাসন করার জন্য অর্থনৈতিক দখল অপরিহার্য। সকল মানুষের সম্পদ এবং সময়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এমন একটি অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা তৈরি করা, যেখানে সবাই বাধ্য হয়ে যুক্ত হয় এবং সময়ের সঙ্গে সেই ব্যবস্থা অন্যদের সম্পদ ও সময় হ্রাস করে অর্থনীতির অন্তরালের কিছু শক্তিধর ব্যক্তির হাতে শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়। এই ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার (International Monetary System) মাধ্যমে, যা হাজার বছরের পুরনো স্বর্ণ ও রূপার দীনার ও দীরহামকে প্রতিস্থাপন করেছে কাগজের অমূল্য মুদ্রা দিয়ে। যারা এই সিস্টেমকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধও চালানো হয়েছে, যেমন লিবিয়ার গাদ্দাফি এর উদাহরণ।

দীনার ও দীরহামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'অন্তর্নিহিত মূল্য' (Intrinsic Value)। অর্থাৎ এই মুদ্রাগুলোর নিজস্ব কিছু মূল্য আছে– স্বর্ণ ও রূপার। আর কাগজের মুদ্রার কোনো অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। ১০০ বছর আগে কেউ যদি আমাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চাইত, তাকে সরাসরি আমাদের কাছে আসতে হতো; কিন্তু এখন তা পকেটে হাত না দিয়ে, কেবল কাগজের টাকা নিয়ন্ত্রণ করে সম্ভব হচ্ছে। কারণ; কাগজের টাকার কোনো প্রকৃত মূল্য নেই।

যেমন ধরুন, একজন বাবা তার পরিশ্রমের মাধ্যমে ৫০ লাখ টাকা জমিয়ে সিন্দুকে রেখে গেলেন এবং বললেন, ১০ বছর পর ছেলে সেটা ব্যবহার করবে। কিন্তু ১০ বছর পর যখন ছেলে টাকা তুলল, ৫০ লাখ টাকার বাস্তব ক্রয়ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। অর্থাৎ ১০ বছর আগে যা ৫০ লাখ টাকায় কেনা যেত, এখন সেটা কিনতে ৫০ লাখ টাকা দিয়েও যথেষ্ট নয়। এর কারণ মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)– মুদ্রার মূল্যমানের পতন।

বিশ্বে সকলের সম্পদ সমান হওয়া সম্ভব নয়, তবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকে যে তার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশ্রম, সময় এবং মূলধন দিয়ে সম্পদ অর্জনের সমান সুযোগ পাবে, সেটাই উচিত। কিন্তু আজকের বাস্তবতা হলো, সেই সুযোগ অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিছু মানুষের হাতে এই সুযোগ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে ধনী-গরিবের মধ্যকার বৈষম্য বেড়ে গেছে, ধনী দেশ ও গরিব দেশের বিভাজন আরও গভীর হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে জন্মালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরিবত্বেই জীবন কাটাতে হয়, যেখানে আমেরিকায় জন্মালে ধনী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অনেকে এই সমস্যার জন্য সুদ (রিবা) ব্যবস্থাকেই দায়ী করেন, কিন্তু প্রকৃত কারণ হলো আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা। বিশেষত আইএমএফ (IMF) এবং কাগজের মুদ্রার প্রাধান্য। যেমন গ্রীসের অর্থনৈতিক সংকটের পেছনে আইএমএফ-এর ভূমিকা রয়েছে।

ইসলামে অনুমোদিত বা সুন্নাহ মুদ্রা বলতে আমরা এমন মুদ্রাকেই বুঝি যার মূল্য নিজেই মুদ্রার ভিতরে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। অর্থাৎ, সেই মুদ্রার যোগান ও চাহিদা মানুষের হাতে নয়, বরং আল্লাহ বা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে থাকে। এটা নিশ্চিত করে যে মুদ্রার মূল্যমান হঠাৎ করে কমবে না।

উদাহরণস্বরূপ, স্বর্ণ বা দীনার হলো ইসলামী সুন্নাহ মুদ্রার আদর্শ, কারণ এর মূল্য নির্ধারণ করে প্রকৃতি এবং এর উৎপাদন সীমিত। অন্যদিকে, কাগজের মুদ্রার যোগান অপ্রতিবন্ধিত, যা বাজারে প্রচুর সরবরাহ করা যায় এবং যার ফলে মূল্যমান হ্রাস পায়।

দীনার বা স্বর্ণের সরবরাহ সরকার স্বাচ্ছন্দ্যে বৃদ্ধি করতে পারে না, কারণ এর উৎপাদন সীমিত। তবে, কাগজের টাকা সরকার যখন বেশি ছাপায়, তখন মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশনের কারণে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। যেহেতু ডলার বিশ্বের প্রধান মুদ্রা এবং এর মাধ্যমে তেল কেনা হয়, তাই ডলারের মুল্যমানের পরিবর্তন বিশ্বের অন্যান্য মুদ্রাকেও প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১৩ সালে এক ডলারে যা কেনা যেত, এখন প্রায় ৯৫% কম ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর যুগে এক দীনার (৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ) দিয়ে একটি ছাগল কেনা যেত এবং আজও একই মূল্য দিয়ে ছাগল কেনা যায়। কারণ; দীনারের মূল্যমান প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

কাগজের মুদ্রা বা 'পেপার মানি' প্রথম কোথায় ও কখন ব্যবহৃত হয়েছে তা সঠিক জানা না গেলেও, ১৮০০-এর দশকে ব্যাংক নোটের ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৭০ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত 'ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' অনুসরণ করা হতো, যেখানে সেন্ট্রাল ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রেখে ততটুকু কাগজের টাকা বাজারে ছাড়ত (১০০% রিজার্ভ অনুপাত)। অর্থাৎ, কাগজের টাকা ছিল একধরনের চেক যার বিনিময়ে স্বর্ণ দাবী করা যেত।

আজকের অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ হলো, কাগজের মুদ্রার অমূল্য এবং এর অপব্যবহার, যা আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ইসলামীক সুন্নাহ মুদ্রা যেমন: দীনার ও দীরহাম, তা প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায়ের প্রতীক। বিশ্ব-অর্থনীতির সাম্য প্রতিষ্ঠায় এটাই হতে পারে পথপ্রদর্শক।

প্রাচীনকালে, যখন অর্থনীতি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের অধীনে পরিচালিত হতো, তখন সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সীমাবদ্ধ পরিমাণ কাগজের মুদ্রা ছাপতে পারত। কারণ; প্রতিটি ছাপানো টাকা ছিল কোনো না কোনো স্বর্ণ (গোল্ড) বা রূপার (সিলভার) সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, মুদ্রার বিনিময়ে ব্যাংকে গিয়ে স্বর্ণ দাবী করা যেত। তাই সরকারের খেয়াল-খুশিতে সীমাহীন পরিমাণে কাগজের টাকা ছাপানোর সুযোগ ছিল না। কারণ; বেশি টাকা ছাপালে তারা প্রয়োজন মতো গোল্ড ফেরত দিতে পারত না।

কিন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিস্থিতি পালটে গেল। যুদ্ধের কারণে সাধারণ মানুষ আর ব্যাংকে গিয়ে গোল্ড বদলাতে পারছিল না, ফলে কাগজের টাকার সঙ্গে স্বর্ণ বিনিময়ের প্রথা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করল। সবাই কাগজের টাকাই ব্যবহার করতে শুরু করল। এ সুযোগে বিভিন্ন সরকার সীমাহীনভাবে কাগজের মুদ্রা ছাপাতে লাগল। এতে ইউরোপের অনেক দেশ মুদ্রাস্ফীতির (ইনফ্লেশন) সম্মুখীন হলো। বিশেষ করে জার্মানিতে অবস্থা ছিল ভয়াবহ! সেখানে এমন একটি হাইপারইনফ্লেশন দেখা দিল, যাতে জার্মান মার্কের মূল্য এত কমে গেল যে, ১৯২২ সালের এক পত্রিকার দাম ছিল ১ মার্ক, আর মাত্র এক বছর পরে তা দাঁড়াল ৭ কোটি মার্ক! এমন একপর্যায়ে কেউ কয়লার দাম বেশি হওয়ায় পুড়িয়ে খাবার রান্না করত।

এই পরিস্থিতির কারণে ১৯১৬ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে পুরনো ১০০% রিজার্ভ সিস্টেম বাতিল হয়ে গেল। পরিবর্তে নতুন 'গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড' চালু হলো, যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করত কতটুকু কাগজের মুদ্রার বিনিময়ে ব্যাংক থেকে গোল্ড দাবী করা যাবে।

যুদ্ধের সময়ে, যেসব দেশ যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল বা যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তাদের প্রচুর অস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রয়োজন ছিল। আর আমেরিকা ছিল উভয় বিশ্বযুদ্ধে শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী এবং যুদ্ধকালীন সময় বিশ্বব্যাপী সামগ্রীর প্রধান যোগানদাতা। ফলে, আমেরিকার অর্থনীতি দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করল। ১৯৩৩ সালে আমেরিকার জাতীয় আয় ছিল ৪৬ বিলিয়ন ডলার, যা ১৯৩৯ সালে বেড়ে ৭১ বিলিয়নে, এবং ১৯৪৩ সালে পৌঁছে গেল ১৪২ বিলিয়ন ডলারে। মাত্র ১০ বছরে তিনগুণ বৃদ্ধি! আমেরিকার নীতি ছিল: "যুদ্ধ অর্থনীতির জন্য ভালো, যদি তুমি যুদ্ধের বাইরে থেকে অস্ত্র ও পন্য সরবরাহ করো।" তাই আমেরিকা যুদ্ধে উস্কানি দিত, কিন্তু নিজে সরাসরি অংশগ্রহণ করত না। তবে, প্রয়োজন পড়লে জয় শিকার করত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও আমেরিকার এই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পরবর্তীতে, ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের সীমিত স্বর্ণ রিজার্ভের কারণে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে পারল না এবং তারা আর প্রচুর পরিমাণে কাগজের টাকা ছাপাতে সক্ষম হলো না। এ সুযোগে আমেরিকা ব্যাপক পরিমাণে ডলার ইউরোপের বাজারে ছড়িয়ে দিল।

১৯৪৪ সালে, আন্তর্জাতিক মানিটারি-ব্যবস্থার নতুন অধ্যায় শুরু হলো, যখন ব্রেটন উডস (Bretton Woods) সম্মেলনে সব দেশের সম্মতিতে ডলারের ওপর ভিত্তি করে একটি বিশ্বব্যাপী মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করা হলো। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে যেখানে প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নিজস্ব মুদ্রার বিপরীতে গোল্ড রিজার্ভ রাখত, সেখানে ব্রেটন উডস সিস্টেমে ডলারকে প্রধান মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো এবং অন্যান্য মুদ্রাগুলো ডলারের সাথে যুক্ত হলো।

তবে, ১৯৭১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন ঘোষণা করলেন, ডলারের বিনিময়ে গোল্ড ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাতিল করা হলো। এর মাধ্যমে ব্রেটন উডস সিস্টেমও শেষ হলো এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা নতুন মোড় নিল। এই নতুন ব্যবস্থায় ডলার সম্পূর্ণ ভাসমান (floating) মুদ্রায় পরিণত হলো, যার মান নির্ধারণের কোনো নির্দিষ্ট গোল্ডের সংযোগ আর নেই। অর্থাৎ, স্বর্ণের দাম বাজারের চাহিদা-যোগানের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হবে এবং সরকারদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ডলার আজ থেকে স্বর্ণের বন্ধন থেকে মুক্ত।

এভাবেই আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা এক ধাপ এগিয়ে, কাগজের মুদ্রাকে সম্পূর্ণ কাগজের মূল্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যমানের অবনতি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হচ্ছে।

ইংরেজ কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার উইলিয়াম সমারসেট মমের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেছিলেন, "অর্থ হচ্ছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এটা ছাড়া আপনি বাকি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না।" বিশ্বব্যাপী এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের নাম হলো ডলার।

প্রতিটি দেশের নিজস্ব মুদ্রা রয়েছে। আমাদের যেমন টাকা, যুক্তরাষ্ট্রের তেমনি ডলার। কিন্তু, টাকা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় না, এরজন্য প্রয়োজন ডলারের। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ডলারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে। অর্থাৎ, কোনো পণ্য আমদানি করলে তার বিল মেটায় ডলারে, আবার কোনো পণ্য রপ্তানি করলে তার জন্য অর্থ পায় ডলারে। বিশ্বজুড়ে ডলারকে তাই বলা হয় 'রিজার্ভ মুদ্রা'। বিশ্বে যত লেনদেন হয়, তার ৮৫ ভাগ হয়ে থাকে ডলারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের

(আইএমএফ) তথ্য অনুসারে, বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর রিজার্ভের প্রায় ৬২ শতাংশই মজুত আছে ডলারে। বাকি অংশের মধ্যে ২০ শতাংশ আছে ইউরোতে। জাপানের ইয়েন ও ব্রিটিশ পাউন্ডে সংরক্ষিত আছে প্রায় ৫ শতাংশ করে রিজার্ভ।

ডলারের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে একটা উদাহরণ প্রায়ই দেওয়া হয়। তা হলো, সমুদ্রে কোনো জলদস্যু গোষ্ঠী যদি কাউকে অপহরণ করে, তাহলে মুক্তিপণ দাবী করে ডলারে, অন্য কোনো মুদ্রায় নয়। আবার ডলারের মূল্য বাড়া-কমার সঙ্গে ঢাকার রাস্তায় একটি বিস্কুট ও চায়ের দামও ওঠা-নামা করে। ডলারের এতই গুরুত্ব।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কাগুজে মুদ্রা বাজারে আসে সে দেশের স্বাধীনতার আগে, ১৬৯০ সালে। তখন মূলত সেনাবাহিনীর ব্যয় মেটানোর জন্য ওই মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। স্বাধীনতার ৯ বছর পর ১৭৭৬ সালে প্রথম গ্রহণ করা হয় ডলার চিহ্ন ($)।

ব্যাংক নোট হিসেবে প্রথম ডলার ছাপা হয়েছিল ১৯১৪ সালে। এর একবছর আগে হয় ফেডারেল রিজার্ভ আইন, যার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক।

যতই অশুভ মনে করা হোক, ডলারে রয়েছে '১৩' সংখ্যার ছড়াছড়ি। যার পিরামিড '১৩' ধাপের, ইগলের নখরের সংখ্যা '১৩', গ্রেট সিলের '১৩'টি রেখা ও '১৩'টি নক্ষত্র। ডলার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তুলা আর লিলেন। কাগজের টাকা হলেও, কাগজের কোনো কিছু এতে নেই। ডলারে লেখা আছে একটি নীতিবাক্য– "ইন গড উই ট্রাস্ট", যা ১৯৬৩ সালে সংযোজিত হয়।

ডলারের আগে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য ছিল ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ডের। ১৯২০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছে এই মুদ্রা। মূলত ডলার আসার আগে ৫০০ বছর ধরে যেসব মুদ্রা রাজত্ব করেছে, তার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস ও স্পেনের মুদ্রা। বিশ্বের নানা প্রান্তে এসব দেশের কলোনি থাকায় তাদের মুদ্রাও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

নিক্সন শক (১৯৭১)

ব্রেটন উডস সিস্টেমে দেশের নিজস্ব মুদ্রা যেমন: বাংলাদেশের টাকা, জাপানের ইয়েন– এসব ছিল ডলার এবং ডলারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত গোল্ডের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, দেশের মুদ্রার মান নির্ধারিত হতো ডলারের মাধ্যমে এবং ডলার নির্ভরশীল ছিল স্বর্ণের ওপর।

কিন্তু, ১৯৭১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ঘোষণায় এই গোল্ড-ডলার সম্পর্ক বাতিল হয়ে গেল। এর মাধ্যমে ব্রেটন উডস চুক্তির এই মূল ভিত্তি ভেঙে পড়ল এবং ডলার একদমই ভাসমান মুদ্রায় পরিণত হলো। এর ফলে দেশের নিজস্ব মুদ্রাগুলো এখন শুধু ডলারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেল।

একই সময়ে আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশ হওয়ায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হলো শুধু ইউএস ডলারে। নিক্সন সৌদি আরবের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন, যার মাধ্যমে তেল ক্রয়-বিক্রয় শুধু ডলারে হবে, অন্য কোনো মুদ্রায় নয়। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার পর, ধীরে ধীরে ওপেক (OPEC)-এর প্রায় দেশই এতে সম্মত হয়। এর ফলে 'পেট্রো-ডলার' নামক নতুন অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

আমেরিকা-সৌদি জোট

এই চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা ইচ্ছামতো ডলার ছাপিয়ে বিশ্বব্যাপী বিক্রি করতে পারে এবং তার কোনো প্রতিক্রিয়া বা জবাবদিহিতার সুযোগ থাকে না। তারা বিশ্বের মূল্যবান সম্পদগুলো অল্প কিছু কাগজের টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের তেল-গ্যাস সম্পদ ফ্রিতে হাতের মুঠোয় চলে আসে।

যখন আমেরিকা অতিরিক্ত ডলার ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে, তখন বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ চুরি হয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতি বা 'ইনফ্লেশন'-কে আমরা বড় পরিসরে সুদ (Interest) হিসেবেও বুঝতে পারি, যা সময়ের সঙ্গে মানুষের টাকার মূল্য কমিয়ে দেয়।

কোরআনে এ নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, "তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"[১]

পেট্রোল ও ডলার = পেট্রো-ডলার

বর্তমান বিশ্বে যখন কেউ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া বা অন্যান্য দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে কথা বলে, তখন এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এসব দেশের বর্তমান দুর্দশা শুধু তাদের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। এটার সাথে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও দায়ী। একটা অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র বলা যেতে পারে।

যখন কোনো দেশ আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তখন তারা সুদের বোঝা আর ঋণ পরিশোধের চাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না। এর ফলে তারা ঋণের ফাঁদে পড়ে যায় এবং ঋণদাতাদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়। এই ঋণদাতারা মূলত তাদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের জন্য এসব ঋণ দিয়ে থাকে।

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৮

যখন কোনো দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়, তখন তাদের শ্রম, পণ্য ও সম্পদের মূল্য ক্রমেই কমে যায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পৃথিবীর একাংশ বিলাসিতার জীবনযাপন করতে পারে, অন্যাংশের মানুষ প্রতিনিয়ত তাদের টাকার মূল্য কমে যাওয়ার কষ্ট সইতে বাধ্য হয়। এভাবেই বহু শ্রমজীবী মানুষের ঘাম ঝরানো হয় তাদের 'দাসত্ব' নিশ্চিত করার জন্য, যারা স্থায়ীভাবে ধনী এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক জাহাজের 'প্রথম শ্রেণির টিকেট' অধিকারী।

রক্তচোষা মুদ্রাব্যবস্থা

মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো দেশগুলোকে আইএমএফ দিয়ে বাধ্য করা হয় ব্যাপক হারে বেসরকারিকরণে যেতে, যেন তারা তাদের তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন কোম্পানি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ অত্যন্ত কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ভেনিজুয়েলা এই ফাঁদ বুঝতে পেরে আইএমএফ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেছিল, কিন্তু মুসলিম বিশ্বের অনেক পণ্ডিত আজও এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেননি।

ইসলামের সুন্নাহ মুদ্রা ও বর্তমান অবস্থা

কোরআনে বহু জায়গায় সোনা ও রূপার উল্লেখ রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা বিশেষ মূল্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই মুদ্রাগুলোর মূল্যমান প্রকৃত অর্থে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং পৃথিবীতে যেমন এদের মূল্য আছে, পরবর্তী জগতেও থাকবে।

সুন্নাহভিত্তিক মুদ্রার তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য:

১. মূল্যবান ধাতু বা প্রকৃত কোনো দ্রব্য থেকে তৈরি হবে। ২. নিজের স্বকীয় মূল্য থাকবে। ৩. আল্লাহর সৃষ্ট জিনিস হবে, যার মূল্যমান নির্ধারণ করবেন আল্লাহ যিনি সমস্ত সম্পদের মালিক।

বর্তমানে এই ধরনের স্বকীয় মূল্যমানসম্পন্ন মুদ্রা বিশ্ব-অর্থনীতিতে বিলুপ্ত। মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিতরা এই পবিত্র মুদ্রাব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে কাগজের অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার জন্য তাদের দায়ী হতে হবে।

প্রকৃত সম্পদ ও মুদ্রার সম্পর্ক

প্রকৃতপক্ষে, কোনো দেশের প্রকৃত সম্পদ হলো তারা যে পণ্য, ফসল, ফলাদি ও শিল্পসামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। মুদ্রা হলো সেই সম্পদের সমতুল্য কাগজ বা চেক

যা বাজারে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে মুদ্রা প্রিন্ট করা হয়। তবে, যদি এর থেকে বেশি টাকা বাজারে ছাড়া হয়, তাহলে পণ্যের দাম বাড়ে, অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) সৃষ্টি হয়। কারণ; মোট সম্পদ বা পণ্যের পরিমাণ বাড়ে না, কেবল টাকার পরিমাণ বেড়ে যায়।

অন্যদিকে, যদি উৎপাদিত সম্পদ মুদ্রার পরিমাণের থেকে বেশি হয়, তাহলে দাম কমতে পারে, যা ডিফ্লেশন (Deflation) নামে পরিচিত। এতে বাজারে পণ্যের দাম কমে যায়।

মুদ্রা হিসেবে ডলারের অসুবিধা

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুদ্রার প্রধান ভিত্তি হলো আমেরিকার ডলার, যা আসলে কাগজের টুকরো ছাড়া কিছুই নয়। বিশেষ করে যারা আমেরিকা নয়, অর্থাৎ অ-আমেরিকান দেশগুলো এই ব্যবস্থার ভুক্তভোগী।

আগে বিভিন্ন দেশের ফরেইন রিজার্ভ (বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়) স্বর্ণের আকারে হতো, কিন্তু এখন প্রায় সবাই ডলার রাখে। এই স্বর্ণ থাকে আমেরিকার হাতে, আর আমাদের দেশের ভল্টে থাকে শুধু ডলার।

ডলারের মান হ্রাস ও তার প্রভাব

ধরা যাক, বাংলাদেশের ফরেইন রিজার্ভ ২৫ বিলিয়ন ডলার, যার প্রকৃত মূল্য যদি ২৫ টন স্বর্ণ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু আমেরিকা যখন অতিরিক্ত ডলার ছাপায় এবং তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়, তখন ডলারের মান কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র দশ মাসের মধ্যে ২৫ বিলিয়ন ডলারের মূল্য ১২ টন স্বর্ণের সমান হয়ে যেতে পারে। এর মানে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থাই মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রাস্ফীতি—আন্তর্জাতিক চুরি

রথচাইল্ড ও তাদের কর্পোরেট গোষ্ঠী ডলার নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে, আর এর খরচ পুরো বিশ্ব বহন করছে। আপনার চাকরি বা ব্যবসায় অর্জিত সম্পদের মূল্য আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভে বসে কিছু লোক ডলার প্রিন্ট করে ক্রমাগত কমিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের সাধারণ মানুষ শুধু চেয়ে থাকছে, আর কিছু করার নেই।

এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চুরি! প্রতিদিনের পরিশ্রম ও আয় দিয়ে কেউ পেট চালাতে পারছে না কারণ; ওই গোষ্ঠী তাদের পকেট থেকে টাকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটাই একধরনের রিবা বা সুদ, যা প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া এবং দরিদ্রদের দারিদ্র্যকোঠায় আটকে রাখার ষড়যন্ত্র।

যুদ্ধ আর অর্থনীতি—কাগুজে মুদ্রার ভূমিকা

শুধু ডলার ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকায় আমেরিকা টিকে আছে। ইসরায়েলের যুদ্ধের খরচ আমরা সবাই জেনেশুনে বা অজান্তে আমেরিকার কাছে দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সেই টাকায় ক্রয়কৃত অস্ত্রের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের অবুঝ শিশু, গর্ভবতী মা প্রতিনিয়ত শহীদ হচ্ছে, এই আমাদের টাকার মাধ্যমে। এজন্য কি আমরা কোনোভাবে দায়ী নই? কী কারণ, তা প্রশ্ন আসতেই পারে?

কারণ; আমরা ডলার ব্যবহার করছি। যতদিন পর্যন্ত স্বর্ণ-ভিত্তিক মুদ্রা (দীনার ও দীরহাম) ফিরে না আসে, ততদিন এই অবস্থা চলতেই থাকবে।

আধুনিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক শোষণ

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের গণতন্ত্র মূলত একটি বিষাক্ত সিস্টেমের মতো, যা সুদভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন ও শোষণ টেকসই করে রাখে। এই অর্থনৈতিক নিপীড়নের সঙ্গে প্রায় সবসময় বর্ণবাদী ও জাতিগত নিপীড়ন জড়িয়ে থাকে।

দরিদ্র মানুষ কখনোই উচ্চশ্রেণির ধনীদের কাছ থেকে সত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতা নিতে পারে না। কারণ; নির্বাচন এবং প্রচারণায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, যা শুধু ধনীদেরই রয়েছে। ফলে যারা নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তি বজায় রাখে, তারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়ে যায়।

ইয়াজুজ-মাজুজের গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা ও পরিচিতি

ইয়াজুজ-মাজুজ এক মহা-ফেতনা ও মহা-আতঙ্কের প্রতীক। প্রায় সব আব্রাহামিক ধর্মেই তাদের প্রতি সতর্কবার্তা রয়েছে। আজকের বিশ্বে যে ভয়াবহ সমরসজ্জা চলছে, তার পেছনে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের অশুভ পরিকল্পনার ইঙ্গিত। আব্রাহামিক ধর্মগুলোতে ইয়াজুজ-মাজুজকে কালের শেষাংশের ভয়াবহ বিধ্বংসী শক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিষ্টান ও ইহুদী বিশ্বাস অনুসারে, এরা ‘গগ ও

ম্যাগগ' নামে পরিচিত, যারা শেষকালে দুই-তৃতীয়াংশ খ্রিষ্টান বা ইহুদী হত্যা করবে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হবে 'আর্মাগেডন' বা ইসলামী দর্শনে 'মালহামা' নামে পরিচিত মহাযুদ্ধ।

ইতিহাসে ইয়াজুজ-মাজুজের পরিবর্তিত ধারণা

বিশ্বে এমন জাতি খুব কম পাওয়া যায় যারা ইয়াজুজ-মাজুজের ভয় থেকে মুক্ত। এর দুটি কারণ– ধর্মীয় সতর্কতা এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভীতিকর শত্রুকে দমন করার কৌশল। ইতিহাসে যখনই কোনো শক্তি অন্য শক্তির বিরুদ্ধে বৃহৎ যুদ্ধ করেছে, তখনই প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাতে ইয়াজুজ-মাজুজ বা গগ-ম্যাগগের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো কখনো ওই নামগুলো প্রকৃত নয় বলে পরবর্তীতে স্বীকারও করা হয়েছে।

প্রথম শতকে ইহুদীরা বিশ্বাস করতেন, বর্তমান উত্তর-কাস্পিয়ান ও ইউক্রেন এলাকার সিথিয়ানরা (সিহতি) গগ-ম্যাগগ। পরে খ্রিষ্টানরা রোমান সাম্রাজ্যকে গগ-ম্যাগগরূপে ভেবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রোমানরা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে ধারণাটি বদলে উত্তর দিকে গথিক জাতির দিকে যায়, যাদের সাথে রোমানরা দীর্ঘ যুদ্ধ করত।

ষষ্ঠ শতকে বাইজেন্টাইন খ্রিষ্টানরা হুনদের (আদি চৈনিক) ইয়াজুজ-মাজুজ মনে করতেন। পরবর্তী সময়ে আরব মুসলমানদের বিরোধ শুরু হলে অনেক খ্রিষ্টান আলেম সারাসিন (আরব মুসলমানদের প্রাচীন নাম।) জাতিকেই ইয়াজুজ-মাজুজ বলার প্রবণতা দেখান।

এরপর তুর্কি, খাযারি ও মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সময়ের বংশধররাও ইয়াজুজ-মাজুজের মর্মে পরিচিতি পায়। চতুর্দশ শতকে চেঙ্গিস খানের আমলে মোঙ্গলরা মুসলমান হওয়ার পর ইয়াজুজ-মাজুজের বদনাম কিছুটা মিটে যায়। আধুনিক সময়ে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাককে ইয়াজুজ-মাজুজের আঁধার হিসেবে ঘোষণা করলেও তা এক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। সেটা কেমন? তার উত্তর বইয়ের পূর্বের অধ্যায়ে জেনেছেন। ধাপে ধাপে বিভিন্ন নামে বিচ্ছিন্নভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ জাতির আগমন, শেষ সময়ে পূর্নাঙ্গরূপে আগমন।

যদিও ধূর্ত ওই গোত্র 'GOG-MAGOG নাম দিয়ে তাদের কার্যকলাপ চালায় না, তারা পরিচিত Illuminati, Freemason, Skull and Bones, The Knights Templar, The Bilderberg Group, The Priory of Sion ইত্যাদি নামে। নাম ভিন্ন হলেও সবার উদ্দেশ্য একই।

ইয়াজুজ-মাজুজের মূল লক্ষ্যসমূহ

১. একক বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠা: তাদের নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী একক সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে একটি মাত্র উপাসনালয় ও একটি মাত্র মুদ্রা-ব্যবস্থাই থাকবে। এই গ্লোবাল সরকারকে 'New World Order' বা সংক্ষেপে NWO বলা হয়।

২. জাতীয়তাবাদ ধ্বংস: প্রত্যেক দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা ধ্বংস করে সবাইকে একত্রিত করে একটি সুপার বিশ্ব-সরকার গ্রহণে বাধ্য করা।

৩. ধর্মীয় বিকৃতি ও ধ্বংস: সব ধর্মকে বিকৃত করে ধ্বংসের পথে নেওয়া, যাতে সবাই শুধু তাদের নির্দেশ মেনে চলে।

৪. মানুষের চিন্তাচেতনা নিয়ন্ত্রণ: মানুষকে রোবটের মতো করে তাদের চিন্তাভাবনা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, যেন তারা ঠিক কী করবে আর কী করবে না তা নির্ধারণ করা যায়।

৫. মাদক ও পর্নোর বৈধকরণ: মাদক গ্রহণকে বৈধ করা এবং পর্নোগ্রাফিকে 'আর্ট' হিসেবে প্রচার করে ধীরে ধীরে মানুষের মনের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করা।

৬. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ধ্বংস: যেসব আবিষ্কার জায়োনিস্টদের স্বার্থে ক্ষতিকর, সেগুলোকে ধ্বংস করা।

৭. বিশ্বব্যাপী গণহত্যা ও দুর্ভিক্ষ: ২০৬০ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বে অন্তত ৩০০ কোটি মানুষ হত্যা বা অনুন্নত দেশের মানুষের দুর্ভিক্ষ ও মানব-সৃষ্ট ভাইরাসজনিত রোগের মাধ্যমে মৃত্যুর আয়োজন।

৮. সততা ও কর্মক্ষমতা ধ্বংস: জনগণের সততা বিনষ্ট করে বড় পরিমাণে বেকারত্ব সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তি ও অশ্লীল সঙ্গীতের মাধ্যমে কিশোর-যুবকদের পারিবারিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

৯. জনগণকে ভাগ্য নির্ধারণ থেকে বিরত রাখা নিরন্তর সমস্যা তৈরি করে মানুষকে সরকারের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা এবং ধর্মশিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য আল্লাহকে দায়ী করতে বাধ্য হয়।

১০. ধর্মের ভাঙচুর ও বিবাদ সৃষ্টি: ধর্ম থেকে বিভাজন তৈরি করে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে শিয়া-সুন্নী বিবাদ বাধিয়ে Greater Israel নির্মাণের সময়কে ত্বরান্বিত করা।

১১. অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা ধ্বংস: বর্তমান ডলারের আধিপত্য শেষ করে ইসরায়েলকে সুপার-পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

১২. সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ: গোপন মিশনের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় সব দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করা।

১৩. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ প্রতিষ্ঠা: বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে জনমানুষকে ভয়ভীতি ও অনাস্থার মধ্যে রাখা।

১৪. শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ: শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলা, যাতে মানুষ সহজেই 'New World Order' গ্রহণ করতে পারে।

১৫. মাসীয়াহ্ আগমনের প্রস্তুতি: সবশেষে মাসীয়াহ্ আগমনের জন্য পর্যাপ্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করা।

মাসীয়াহ্ আগমনের প্রেক্ষাপট

মাসীয়াহ্ আগমনের এই এজেন্ডা সফল করতে উপরের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন জরুরি। ইহুদীরা মাসীয়াহ্ আগমনের জন্য সারাবিশ্বে 'স্টেজ' সাজাচ্ছে।

বাইবেলে মাসীয়াহ্ সম্পর্কে উল্লেখ আছে– তিনি দাঊদ (আ.)-এর বংশে জন্ম নেবেন, শাসন করবেন সুবিচার-সহ এবং সারাবিশ্ব শাসন করবেন। তার শাসনামলে শান্তি ও সুবিচার চিরস্থায়ী হবে।[১]

এভাবেই ইয়াজুজ-মাজুজের গোপন এজেন্ডা বিশ্বজুড়ে ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার শেষ পরিণতি অনেক ভয়াবহ। সতর্ক থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মসীহ ও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী: বাইবেল ও কোরআনের দৃষ্টিকোণ

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ইসাইয়া নবী মসীহ্ সম্পর্কে বলেন– "দেখো, আমার দাস, যার মাঝে আমার আত্মা (রুহ্) পূর্ণ; আমি তাকে নিয়োগ দিয়েছি অ-ইহুদীদের বিচার করার জন্য। তিনি কখনো কাঁদবেন না, চিৎকার করবেন না, রাস্তায় তার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না। তিনি ভঙ্গুর গাছের ডগা ভাঙবেন না এবং জ্বলন্ত শণ নিভিয়ে দেবেন না। তিনি সত্যের ওপর ভিত্তি করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং

১. ইসাইয়া ৯:৬-৭ এবং ইয়ারমিয়া ২৩ :৫

কখনো বিফল হবেন না; যতক্ষণ না পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, এমনকি দ্বীপপুঞ্জ তার ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় থাকবে।"[১]

তাওরাতের প্রথম পুস্তক জেনেসিসে [৪৯:১০] ভবিষ্যৎ শাসকের পরিচয় দেওয়া হয়, যাকে 'শীলো' বলা হয়েছে– "রাজদন্ড যেন জুডার (এক গোত্রের) পুত্রদের থেকে না হারায় যতক্ষণ না শীলো আসে এবং জাতিগোষ্ঠীসমূহ তার প্রতি আনুগত্য করবে।"

এখান থেকে বোঝা যায়, মসীহ্ জুডা গোত্র থেকে আগমন করবেন এবং তার শাসন হবে ধারাবাহিক।

ঈসা (আ.) মসীহের আগমন ও ভূমিকা

প্রায় ২০০০ বছর আগে আল্লাহ্ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)-কে মসীহ্ হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় বনী ইসরায়েল নানাবিধ পাপ ও অমার্জনীয় কুশীলবীতে ডুবে ছিল। তারা ধর্মের বাহ্যিক রূপে আটকে থেকে অন্তর্নিহিত নীতিগুলোকে অবজ্ঞা করছিল। ইবাদতখানার ভেতর সুদের ব্যবসাও চলছিল। একইভাবে আজকের কিছু ইসলামী ব্যাংক সুদের ব্যবসা চালায় এবং নামাযও পড়ে। সুদের ধোঁকাবাজি শব্দ মুনাফা নাম দিয়ে রথচাইল্ড সুদি-ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে তারা ব্যাংকের বোর্ডে যুক্ত করেছে ইসলামী। তবে, আমার ভাষায় এটা শয়তানী। তথা, 'রথচাইল্ডীয় শয়তানী মুনাফাখোর ব্যাংক' (ইসলামী ব্যাংক, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, ইত্যাদি ইসলামী ব্যাংক)।

কোরআন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, ইহুদীরা তাদের পাপের কারণে অনেক শুভ বস্তু হারাম হয়েছিল এবং তারা সুদগ্রহণ করত, যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।[২]

ঈসা (আ.) এই বিকৃত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধর্মের প্রকৃত সারবস্তু প্রচার শুরু করলেন। তিনি অন্ধকার দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বর্জন দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত ন্যায় ও মানবতা তুলে ধরলেন। এতে ইহুদী ধর্মগুরুরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে মসীহ্ হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং উলটো তাঁকে ধর্মবিরোধী ও ব্লাসফেমার অপবাদ দিলেন।

---

১. ইসাইয়া ৪৯:৬
২. সূরা আন নিসা,আয়াত ১৬০-১৬১

ক্রুশবিদ্ধকরণ ও তার প্রকৃত সত্য

ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কারণে রোমান শাসকদের সহযোগিতায় ঈসা (আ.)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তবে কোরআন স্পষ্ট করে বলে যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি বা শূলেতে চড়ায়নি। বরং আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ঈসা (আ.)-কে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।[১]

ঈসা (আ.) ফেরত আসা ও শেষদিনে সাক্ষ্য দান

কোরআন বলেছে, আহলে কিতাবদের মধ্যে সবাই ঈসার উপর ঈমান আনবে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এবং কেয়ামতের দিনে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।[২]

কেন ঈসা (আ.)-কে মসীহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি?

ইহুদীরা ঈসাকে মসীহ্ হিসেবে গ্রহণ করেনি কারণ– তিনি পবিত্র ভূমি জেরুজালেমকে রোমান দখল থেকে মুক্ত করতে পারেননি। দাঊদ (আ.)-এর সিংহাসন থেকে পুরো বিশ্ব শাসন করেননি। তাই তাদের মতে তিনি প্রকৃত মসীহ্ হতে পারেন না।

এই রূপে বাইবেল ও কোরআনের বর্ণনা মিলিত হয়ে মসীহের আগমন, তাঁর ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত করে।

মসীহের ক্রুশবিদ্ধকরণ ও বনী ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া:

মসীহ্ (ঈসা, আ.)-কে হত্যাচেষ্টার গর্হিত অপরাধের জন্য বনী ইসরায়েলের উপর আল্লাহ্র গজব নেমে আসে। রোমান সাম্রাজ্য জেরুজালেম আক্রমণ করে মসজিদ আল-আকসাকে ধ্বংস করে, বহু ইহুদীকে হত্যা করে এবং বাকিদের বিভিন্ন দেশে বিতাড়িত করে। এই ঘটনাবলী পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বনী ইসরায়েলকে তাওবার আরেক সুযোগ দেন নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে আরব অঞ্চলে প্রেরণের মাধ্যমে। মদিনার ইহুদী পুরোহিতরা নবী (সা.)-কে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন, তিনি আসলেই মসীহ্ কি না! তাদের পক্ষ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়–

---

১. সূরা আন নিসা,আয়াত ১৫৭-১৫৮

২. সূরা আন নিসা,আয়াত ১৫৯

১. রূহ (আত্মা) সম্পর্কে প্রশ্ন: "তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। বলো, 'রূহ আমার পালনকর্তার নির্দেশে; তোমাদের এই বিষয়ে খুব সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।'"[১]

তাফসীরে মুফতি তাকি উসমানী:

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, কতিপয় ইহুদী রাসূল (সা.)-কে পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে প্রশ্নে করেছিল, রূহ কী জিনিস? তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। উত্তরে কেবল ততটুকু কথাই বলা হয়েছে, যতটুকু মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব। অর্থাৎ, কেবল এতটুকু কথা যে, 'রূহ সরাসরি আল্লাহ তায়ালার আদেশ দ্বারা সৃষ্ট। মানুষের দেহ ও অন্যান্য মাখলুকের ক্ষেত্রে তো লক্ষ করা যায়, তাদের সৃষ্টিতে বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের কিছু ভূমিকা আছে। যেমন: নর-নারীর মিলনে বাচ্চা জন্ম নেয়। কিন্তু রূহের বিষয়টা এ রকম নয়। তার সৃষ্টিতে এ রকম কোনোকিছুর ভূমিকা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এটা সরাসরি আল্লাহ তায়ালার হুকুমে অস্তিত্ব লাভ করে। রূহ সম্পর্কে এর বেশি বোঝা মানব-বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে, তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেক কিছুই তোমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। অনেক জিনিসই তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত।

২. আসহাবে কাহাফের সেই সাতজন যুবকদের নিয়ে প্রশ্ন। ৩. যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন। এই দুটি প্রশ্নের অবতারণ এখানে আনলাম না। ইতোমধ্যে এই বিষয়ে আগের অধ্যায়ে জেনেছেন।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর একজন নবীই দিতে পারেন। নবী মুহাম্মদ (সা.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও বনী ইসরায়েল তাঁকে মসীহ্ হিসেবে স্বীকার করেনি, কারণ তিনি আরব বংশোদ্ভূত– ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। আর তাদের দাবী, আসল মসীহ্ হবে ইসহাক (আ.)-এর বংশ থেকে, অর্থাৎ বনী ইসরায়েলের মধ্য থেকে। নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করার ফলে বনী ইসরায়েলের তওবার সুযোগ শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ সর্বশেষ মসীহ্ হিসেবে মুহাম্মদ (সা.)-কে ঘোষণা করেন। এরপর আর কোনো নবী আসবেন না।

তবুও বনী ইসরায়েল সেই কুসংস্কারে বিশ্বাস করে আসছে যে, ভবিষ্যতে মসীহ আসবেন এবং সুলাইমান (আ.)-এর স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনবেন।

---

১. সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮৫

কেয়ামতের আলামত ও মসীহের আগমন

কোরআন সূরা নিসা (৪:১৫৯) আয়াতে জানা যায়, ঈসা (আ.) শেষ জামানায় ফিরে আসবেন এবং পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করবেন। সেই সময় সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে বা ঈমান আনবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার সাহাবীদেরকে বলেন, "তোমরা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ?" তারা বললেন, "আমরা শেষ সময় নিয়ে আলোচনা করছি।" তখন তিনি বললেন, "দশটি আলামত দেখা যাবে, সেগুলো না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত আসবে না।"[১]

সেই দশটি আলামত হলো–

১. মসীহ্ আদ-দাজ্জাল (ভণ্ড মসীহ)-এর আগমন।
২. ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি।
৩. প্রকৃত মসীহ ঈসা (আ.)-এর প্রত্যাবর্তন।
৪. দুখান (বিষাক্ত ধোঁয়া) দৃশ্যমান হওয়া।
৫. ভূমির জানোয়ারের উদ্ভব (পবিত্র ভূমি থেকে এক অদ্ভুত প্রাণীর আবির্ভাব)।
৬. পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় হওয়া।
৭. পূর্বে এক ভূমিধ্বস।
৮. পশ্চিমে আরেক ভূমিধ্বস।
৯. আরব ভূখণ্ডে তৃতীয় ভূমিধ্বস।
১০. ইয়েমেন থেকে এক আগুনের উৎপত্তি, যার আগুনের দিকে মানুষ পালিয়ে এসে একত্রিত হবে।

(দ্রষ্টব্য: এই আলামতগুলোর সঠিক ক্রম বা কোনটি আগে হবে তা নির্দিষ্ট নয়।)

বনী ইসরায়েল মসীহকে হত্যাচেষ্টা করায় তারা আল্লাহর কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে মসীহ্ স্বীকার না করার ফলে তাদের তওবার শেষ সুযোগ বন্ধ হয়েছে। কেয়ামতের কাছাকাছি সময় এগুলো ঘটবে– দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, ঈসার ফেরত আসা এবং অন্যান্য মহা-আলামত। ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন এবং সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠা করবেন।

---

১. সহীহ মুসলিম

ঈসা (আ:)-এর প্রত্যাবর্তন—কেয়ামতের সেরা আলামত:

কোরআন সূরা আয-যুখরুফ (৪৩:৬১) আয়াতে ঈসা (আ.)-কে কেয়ামতের সেরা আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে– "নিশ্চয়ই ঈসা কেয়ামতের ব্যাপারে এক বিশাল নিদর্শন। তাই কেয়ামত নিয়ে তোমরা সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মানো। এটা এক সরল পথ।"[১]

অর্থাৎ. ঈসার আগমন কেয়ামতের পূর্বশর্ত এবং এর মাধ্যমে সময়ের ঘণ্টা বাজার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কোরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়, ঈসার আগমনের আগে ভণ্ড মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। বর্তমানে ইসরায়েলের ইহুদীরা দাজ্জালের আগমনের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে।

দাজ্জাল ও ঈসা (আ.) আগমনের পূর্বশর্তসমূহ

ঈসা (আ.) নিজে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কিছু লক্ষণ ও আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো হলো–

১. মসীহ্ বলে দাবী করা ভণ্ডদের আবির্ভাব,

২. সারাবিশ্বে যুদ্ধ ও সংঘাতের বিস্তার,

৩. ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ,৪. মহামারীর ছড়াছড়ি,

৫. অরাজকতা ও মানবতা লোপ পাওয়া,

৬. ভূমিকম্পের তীব্রতা ও সংখ্যার বৃদ্ধি।

ভণ্ড মসীহ্ দাজ্জালের চিত্রণ

দাজ্জালের অর্থ 'ভণ্ড' বা 'মহা প্রতারক'। সে এক চোখে অন্ধ থাকবে, অর্থাৎ অন্তরদৃষ্টি বা সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান থাকবে না। তিনি বাহিরের চোখ দিয়ে যা দেখবেন তাই সত্য বলে মনে করবেন। এ ধরনের অন্ধত্ব আজকের নাস্তিকদের দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানের পেছনে বিশ্বাস স্থাপন করে।

খ্রিষ্টান ধর্মেও শেষ সময়ে একজন 'Anti-Christ' বা ভণ্ড মসীহের আগমন ঘটবে বলে বিশ্বাস রয়েছে। যদিও তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম উভয়ের শত্রু, তবু ইহুদীদের কাছে তিনি মহানায়ক বা প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবেই পরিচিত হবেন।

---

১. সূরা আয-যুখরুফ,আয়াত ৬১

ইহুদীদের মেসীয়ানিক স্বপ্ন ও বাস্তবতা

২০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইহুদীরা 'পবিত্র ভূমি' জেরুজালেমে ফিরে এসে রাজা ও নবী দাঊদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.)-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সলোমন মন্দির পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন দেখে আসছে। এ ধরনের স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে তাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দিক নির্দেশ করে।

তবে, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান 'ইসরায়েল রাষ্ট্র' এবং সেখানে চলমান নিপীড়ন, জঙ্গিবিদ্বেষী হামলা ও নিরীহ মানুষের ওপর বর্বর আচরণ এই স্বপ্নের সঙ্গে একদমই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা স্রষ্টাবিরোধী অপরাধ এবং এ নিপীড়নের জন্য কঠোর ঐশ্বরিক শাস্তি আসবেই।

বর্তমান ইসরায়েল: ইয়াজুজ-মাজুজের বাহন?

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখি ইসরায়েলী সেনারা ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বরতা চালাচ্ছে। মা-শিশু, বৃদ্ধ-নারী নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন করছে। এসব দেখে স্পষ্ট যে, বর্তমান ইসরায়েলী জনগোষ্ঠী আসল বনী ইসরায়েল হতে পারে না। তারা দাঊদ ও সুলাইমান (আ.)-এর বংশধর নয় এবং তাদের ওপর তাওরাত নাজিল হয়নি।

এরা আসলে ইয়াজুজ-মাজুজের বংশধর, দাজ্জালের ভণ্ড মসীহের নিবেদিত বাহিনী। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ মিথ্যা মেসীয়াহের অধীন এই 'ইসরায়েল রাষ্ট্র' গঠন করে পৃথিবীর ইহুদীদের জেরুজালেমে ফিরিয়ে এনেছে এবং বিশ্বকে তাদের ফটোকপিতে রূপান্তরিত করেছে। তারমানে এই নয় যে, বনী ইসরায়েল নেই। তারাও আছে, কিন্তু বর্বর ইসরায়েলী জায়োনিস্টরা মনে হয় না প্রকৃত বনী ইসরায়েল হতে পারে! আর হলেও হতে পারে। এসব গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়, তাই নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলা অনুচিত হবে। এ বিষয়ে 'রাব্বে কারীম' অবগত আছেন।

ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন:

আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বপ্নের চূড়ান্ত অংশ হলো একজন মেসীয়াহ বা রাজাকে নিয়োগ করা এবং মসজিদ আল-আকসার ধ্বংস করে সলোমনের মন্দির পুনর্নির্মাণ করা। এরপর ইসরায়েলকে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র ও জেরুজালেম থেকে বিশ্ব শাসনকারী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ঈসা (আ)-এর প্রত্যাবর্তন কেয়ামতের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। দাজ্জালের আগমন ঈসার আগমনের পূর্বশর্ত। বর্তমান ইসরায়েলী রাষ্ট্র ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের প্রক্সি। ইসরায়েলের বর্তমান অবস্থা ও নিপীড়ন ধর্মবিরোধী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শেষপর্বে মসজিদ আল-আকসার ধ্বংস ও সুলাইমানের মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য মেসীয়াহ বা শাসকের আগমন অবশ্যম্ভাবী।

দাজ্জালের একচোখকে ধার্মিকরা অন্তরের অন্ধত্বের প্রতীক হিসেবে দেখে, অর্থাৎ যিনি দেখেও দেখেন না, যার অন্তরের চোখ 'কানা' বা 'অন্ধ'। আর শয়তানের উপাসকরা তাকে আলোর প্রতীক বলে মানে, যেমন ফারাও মনে করত।

আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্র দাজ্জালের এই ভণ্ডধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যদিও নিজেদের 'ইহুদী' বলে দাবী করে, প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের উপাসক এবং বাইবেলেও তাদের এই ভন্ডধর্মের কথা উল্লেখ আছে– "আমি তাদের করব যারা শয়তানের সভায় থাকে, যারা নিজেদের ইহুদী বলে দাবী করে অথচ তারা সত্য নয়, তারা মিথ্যাবাদী।"[১]

ইসরায়েলের পতাকায় যে 'তারা' বা ষড়ভুজাকৃতির নকশা রয়েছে, তা হলো একটি স্যাটানিক হেক্সাগ্রাম, যা শয়তানবাদীদের অন্যতম চিহ্ন।

ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্রের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করার জন্য গড়ে উঠেছে অনেক গোপন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, যেগুলো বিশ্ব-রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাবশালী। এরমধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো–

- বিল্ডারবার্গ গ্রুপ (The Bilderberg Group),
- কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস (Council on Foreign Relations),
- দ্য ট্রাইলেটারাল কমিশন (The Trilateral Commission),
- বোহেমিয়ান গ্রোভ (The Bohemian Grove),
- ফেডারেল রিজার্ভ (The Federal Reserve),
- ফ্রিম্যাসনরি (Freemasonry),
- স্কাল অ্যান্ড বোন্স (Skull and Bones),
- সামরিক বাহিনী (The Military),

১. প্রকাশিতবাণী ৩:৯

- ভ্যাটিকান (The Vatican),
- নাইটস অফ মাল্টা (Knights of Malta),
- রেডিকাল ইসলাম (Radical Islam),
- কমিউনিজম (Communism),
- বিশ্ব চার্চ কাউন্সিল (World Council of Churches),
- ভোট জালিয়াতি (Election Fraud),
- ব্রিটিশ মনার্ক (The British Monarch),
- রয়্যাল অর্ডার অফ দ্য গার্টার (Royal Order of the Garter),
- MI-৫ ও MI-৬ (MI-৫ and MI-৬),
- কাউন্সিল অফ চাথাম হাউস (Council of Chatham House),
- থ্রি এডস (The Triads),
- CIA, NSA, FBI, DEA,
- বিগ ফার্মা (Big Pharma),
- মিডিয়া (Media),
- প্রায়োরি অফ সিয়ন (The Priory of Sion),
- জাতিসংঘ (United Nations),
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund),
- বিশ্বব্যাংক (The World Bank),
- FEMA,
- মোসাদ (Mossad),
- UNESCO.

এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাত নিয়ন্ত্রণে রেখে, ইয়াজুজ-মাজুজ ও তাদের ভণ্ড মেসীয়াহ্ দাজ্জালের বিশ্ব-শাসনের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।

আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি যে, বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতি ও অর্থনীতির পেছনে একটি সুগঠিত ষড়যন্ত্র কাজ করছে, যা মানব-সমাজকে বিভ্রান্ত করে, জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে এবং এক বিশ্বভিত্তিক দানবীয় শাসনব্যবস্থার জন্য পথ প্রশস্ত করছে। এ ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো সত্যকে চিনে নেওয়া এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য বজায় রাখা। কারও কারও কাছে অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত মনে হতেই পারে উপর্যুক্ত নামগুলো দেখে। সে আপনি মনে করুন। তবে, প্রতিটি সংস্থার পেছনে কিছু নিয়ন্ত্রক আছে, তা মানবেন বৈকি।

মিস্টেরিয়াস নীলচক্ষু

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, তখন অপরাধীদেরকে একত্রিত করা হবে নীলচক্ষু অবস্থায়।

"যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীলচক্ষু অবস্থায়[১]।" "The Day the Horn will be blown. And We will gather the criminals, that Day, blue-eyed.

'যুরকান' (زُرْقًا) শব্দটি 'আজরাক' (أزرق) শব্দের বহুবচন এবং এর অর্থ 'নীলবর্ণ বিশিষ্ট' বা 'অন্ধ' হতে পারে। এখানে 'নীলচক্ষু' শব্দটি "زُرْقًا" (যুরকান) -এর অনুবাদ, যার অর্থ 'নীলবর্ণ বিশিষ্ট' বা 'অন্ধ'। এই আয়াতে অপরাধীদের সেদিন 'নীলচক্ষু' বা অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করা হবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এখানে তাদের কদর্য দেখানোর জন্য চোখ নীল করে দেওয়া হবে, আবার কারও কারও মতে, তাদের অন্ধ অবস্থায় হাশরের মাঠে হাজির করা হবে। তবে পরে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তারা জাহান্নামের শাস্তি দেখতে পারে।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, কেয়ামতের দিন অপরাধীদের চোখ নীল রঙ ধারণ করবে। এর অর্থ হতে পারে তারা ভয়ভীতিতে মুষড়ে পড়বে, বা আল্লাহ তাদের চিহ্নিত করবেন শাস্তি ও লাঞ্ছনা প্রদানের জন্য।

নীলচক্ষুর রহস্য ও ঐতিহাসিক উৎস

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেনসিক জেনেটিক্স ইনস্টিটিউটের গবেষণা থেকে জানা যায়, নীলচক্ষু ব্যক্তিরা সবাই একই একক পূর্বপুরুষ থেকে এসেছেন, যিনি

---

১. সূরা ত্ব-হা আয়াত ১০২

প্রায় ৬০০০ থেকে ১০,০০০ বছর পূর্বে কৃষ্ণসাগরের আশেপাশে বসবাস করতেন। এই জনগোষ্ঠীকে প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য জাতি বলা হয়। তারা কৃষ্ণসাগরের ককেশাস অঞ্চল থেকে ছড়িয়ে পশ্চিম ইউরোপে, পরে ইরান ও ভারত অঞ্চলে আগ্রাসন চালায়।

ভারতের শিক্ষাক্রমেও আর্যদের এই আগ্রাসনের ইতিহাস উঠে এসেছে। ঐ সময়ে তারা মূলত মূর্তিপূজারীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং তাদের ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুধর্মের প্যাগান বৈশিষ্ট্যগুলো এই আর্য আগ্রাসনের প্রভাবেরই অবশিষ্টাংশ। ঐ সময়ের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা-শক্তি ছিল গরু, যাকে মা সমান সম্মান দেওয়া হতো।

তবে, এখানে গবেষকের এই তত্ত্বের বিষয়ে দ্বিমত আছে। অনুসন্ধানে পেয়েছি, প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় মূলত একটি ভাষাগত গোষ্ঠী, কোনো একক জাতি নয়। প্রত্নতত্ত্ব, জিনতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এই গোষ্ঠীর ভাষাভাষীরা সম্ভবত কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী স্টেপ অঞ্চলে (বর্তমান ইউক্রেন ও দক্ষিণ রাশিয়া) বাস করত।

'আর্য' শব্দটি সাধারণত ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষীদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়দের একটি শাখা। এই গোষ্ঠীর কিছু অংশ ইরান ও ভারতীয় উপমহাদেশে অভিবাসন করেছিল, যা বৈদিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়। তবে, এই অভিবাসনকে সবসময় আগ্রাসন বলা যায় না; এটা মূলত একটি দীর্ঘস্থায়ী অভিবাসন প্রক্রিয়া ছিল।

প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়রা ঠিক কী রকম দেখতে ছিল, তার কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তবে, এটা সত্য যে নীল চোখ একটি ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বেশি পরিচিত, যা প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু, এর মানে এই নয় যে শুধু আর্য জাতিরাই নীল চোখের অধিকারী ছিল, বা সব নীল চোখের মানুষ আর্য।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী, নীল চোখের অধিকারীরা সবাই একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছেন এবং এই মিউটেশন প্রায় ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর আগে হয়েছিল। এই তথ্যটি সঠিক।

নীল চোখের উৎপত্তির সঙ্গে প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য জাতির সরাসরি সম্পর্ক এবং তাদের আগ্রাসনের ধারণাটি সরলীকরণ করা হয়েছে। প্রোটো-ইন্দো-

ইউরোপীয়রা একটি ভাষাগত গোষ্ঠী, যারা কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের স্টেপ থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা শুধু আগ্রাসন নয়, বলা যায় একটি জটিল অভিবাসন প্রক্রিয়া ছিল। এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতে গেলে বিরাট আলোচনার দরকার আছে। তবে, তা এখানে সম্ভব না। আর বিষয়টা এখানে অতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নীলচক্ষুর গুণাবলী ও ফিতনা

নীলচক্ষু ব্যক্তিরা অন্যান্য মানুষের তুলনায় আলাদা গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের ব্লাডলাইন এক এবং তারা অন্যায়, অত্যাচার ও ফেতনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও প্রভাবশালী। বর্তমান বিশ্বে যে অন্যায় ও জুলুম চলছে, তার পেছনে ইউরোপ-আমেরিকা তথা নীলচক্ষু নেতাদের সক্রিয়তা লক্ষ্যণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার মাস্টারপ্ল্যান বের হয় এই নীলচক্ষুদের বিকৃত মস্তিষ্ক থেকে।

কেয়ামতের ময়দানেই যেন তাদের এক প্রকার ডেমো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে– একসঙ্গে নীলচক্ষু অবস্থায় সমবেত হয়ে দুনিয়ার দুষ্টুমি ও শাসন চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে আল্লাহর দুশমনরা।

প্রাচীন প্যাগানদের বিশ্বাস ও আধুনিক হলিউড

প্রাচীন সুমেরীয় প্যাগানরা নীলচক্ষুকে ঈশ্বরের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করত। তারা নীলচক্ষুদেরকে সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা দিত। তবে, প্যাগান ঈশ্বর মানেই ছিল শয়তান বা জিন।

হলিউডের প্রায় ৮০% প্রধান চরিত্র নীলচক্ষুদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয়। নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রায় ৯৫%। অথচ আমেরিকায় নীলচক্ষু মানুষের সংখ্যা মাত্র ১৬%, আর বিশ্বের মোট মানুষের মধ্যে মাত্র ৮%। হলিউড তারকারা প্রায় অনেকেই গুপ্ত সংগঠন ফ্রিম্যাসন, বা অন্য স্যাটানিক উপাসক। এরা প্রভুত্ব বিস্তার এবং মানুষের মনোজগতে প্রভাব বিস্তারে নিয়োজিত।

হলিউড: প্যাগান 'পবিত্র বন' ও তার প্রভাব

'হলিউড' শব্দের অর্থ হলো 'পবিত্র কাঠ' বা 'পবিত্র বন'। এটা প্রাচীন প্যাগান জাদুকরদের কাছে পবিত্র স্থান ছিল, যাদের কাছে এই বন এক ধরনের জাদুমন্ত্র বা লাঠি (Magic Wand) দিয়ে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জায়গা।

প্রাচীন কালেও জাদুকররা তাদের জাদুকাঠি দিয়ে মানুষের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করত। আজকের হলিউড চলচ্চিত্রও একই মিশন নিয়ে কাজ করে; মানুষের মনোজগতকে প্রভাবিত করে বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত করে 'ফ্যান্টাসি' বা কাল্পনিক জগতে আটকে রাখে।

এই নামটির উৎপত্তি নিয়ে আরও দুটি প্রধান তত্ত্ব আছে:

১. হোয়াইটলি (Whitley) দম্পতির দেওয়া নাম: প্রচলিত এবং সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মতটি হলো, প্রপার্টি ডেভেলপার হার্ভে এইচ. হোয়াইটলি এবং তার স্ত্রী ডেইডা উইলকক্স হোয়াইটলি এই নামটি রেখেছিলেন। ১৮৮৬ সালে, ডেইডা তাদের নতুন কেনা জমির নাম 'হলিউড' রাখেন। এর কারণ ছিল তার বন্ধু হোয়েনডা হেন্ডারসনের কথা, যিনি শিকাগোতে নিজের গ্রীষ্মকালীন বাড়ির নাম 'হলি গাছ' (Holly Tree) দিয়ে রেখেছিলেন।

২. হলি ট্রি (Holly Tree) থেকে আসা নাম: আরেকটা মত অনুযায়ী, লস অ্যাঞ্জেলসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাওয়া আমেরিকান হলি বা ক্যালিফোর্নিয়া হলি গাছ থেকে এই নাম এসেছে।

এই তত্ত্ব মতে, হলিউড নামের সঙ্গে পবিত্রতা, জাদু বা প্রাচীন প্যাগানদের কোনো যোগসূত্র নেই। এটা একটি আধুনিক নামকরণ, যার উৎপত্তি সম্ভবত একটি গাছের নাম থেকে।

তবে, এই দুই তত্ত্বে বাদে প্রথম তত্ত্বই বেশি শক্তিশালী। প্রাচীন কেল্টিক ড্রুইড পুরোহিতেরা বিশ্বাস করত, holly গাছ হলো শক্তি, অমরত্ব ও সুরক্ষার প্রতীক। তারা এই গাছের কাঠ দিয়ে বানাত জাদুকাঠি (magic wand), যা দিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হতো।

অতএব; 'Hollywood' নামের ভেতর প্রতীকীভাবে নিহিত আছে সেই ধারণা একটি স্থান, যেখানে জাদুকাঠির মতো প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মনের জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যেভাবে প্রাচীন জাদুকররা wand ব্যবহার করে মানুষের চেতনা নিয়ন্ত্রণ করত, আজকের হলিউডও অনেকটা সেই একই কাজ করছে।

ক্যামেরা ও পর্দা হলো আধুনিক যুগের নতুন জাদুকাঠি। সিনেমার গল্প ও ভিজ্যুয়াল মানুষের অবচেতন মনে প্রবেশ করে তাদের আবেগ, ধারণা ও জীবনদর্শনে গভীর

প্রভাব ফেলছে। অনেকে এটাকে mass hypnosis বা সমষ্টিগত সম্মোহন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এক চোখের প্রতীক (Eye of Horus), Pentagram ও Hexagram, ডেভিলের শিং বা ৬৬৬ হ্যান্ড-সাইন, বাইবেলীয় বা ইসলামী শেষযুগের কাহিনি উলটো ব্যবহার ইত্যাদি।

এসব প্রতীক অনেকটা ড্রুইডদের রিচ্যুয়াল নাটকের মতো, যেখানে মঞ্চায়নের মাধ্যমে দর্শকের অবচেতন মনে নির্দিষ্ট বার্তা প্রবেশ করানো হতো।

ড্রুইডরা যেভাবে মন্ত্রোচ্চারণ ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে মোহাবিষ্ট করে তুলত, হলিউডও দর্শককে কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্য জগতে বন্দী করে ফেলে। বাস্তব জীবনের সমস্যা ও সংগ্রাম ভুলিয়ে তারা মানুষকে ফ্যান্টাসির জগতে ডুবিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে অনেকে এক ধরনের মানসিক নিয়ন্ত্রণ কৌশল হিসেবে দেখেন। এডওয়ার্ড বার্নেজ (*Propaganda*) দেখিয়েছেন, মিডিয়া হলো অবচেতন মন নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। নীল পোস্টম্যান (*Amusing Ourselves to Death*) বলেছেন, টেলিভিশন ও সিনেমা মানুষকে আনন্দের আড়ালে বাস্তবতা ভুলিয়ে দেয়। ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব গবেষকরা বলেন, হলিউড আসলে গুপ্ত সংঘ বা গভীর রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্র, যেখানে বিনোদনের নামে নির্দিষ্ট মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হয়।

Holly tree যেমন প্যাগানদের কাছে জাদুকাঠির উৎস ছিল, তেমনি আধুনিক হলিউডকেও অনেকে এক প্রকার মানসিক জাদুবিদ্যার বন বলে মনে করেন।

কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক:

(ক). Eyes Wide Shut (১৯৯৯, পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিক): এই চলচ্চিত্রে গোপন সমাজ, মুখোশধারী আচার-অনুষ্ঠান এবং যৌন-রিচ্যুয়াল স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। অনেকে মনে করেন এটা সরাসরি গুপ্ত সংঘ ও তাদের অকাল্ট আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিফলন।

(খ). The Matrix (১৯৯৯): বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম জগৎ– যা অনেকটা mass hypnosis বা সম্মোহনের প্রতীক। ‘লাল পিল বনাম নীল পিল’ ধারণা আসলে মানুষের মুক্তচেতনা বনাম কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণের প্রতীকী উপস্থাপন।

(গ). Doctor Strange (Marvel, ২০১৬): পুরো সিনেমাজুড়ে জাদুকাঠি, মন্ত্র, ম্যান্ডালা, তিব্বতি রিচ্যুয়াল-এর প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। হোলোগ্রাফিক প্রতীকগুলো অনেকটা প্যাগান বা ড্রুইডিক চিহ্নের আধুনিক ভিজ্যুয়াল সংস্করণ।

(ঘ). Harry Potter Series (২০০১-২০১১): এখানে সরাসরি magic wand, spell এবং sorcery– যা ড্রুইডিক ঐতিহ্যেরই আধুনিক রূপ। গল্পে জাদুকাঠির শক্তিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণের মূল মাধ্যম হিসেবে দেখানো হয়।

(ঙ). The Da Vinci Code (২০০৬): এখানে গোপন সমাজ, ফ্রিম্যাসনিক প্রতীক ও চার্চ–বিরোধী গুপ্ত-কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। চলচ্চিত্রটি অনেক গবেষকের মতে, প্রতীকীভাবে 'Occult Truth' প্রচারের প্রচেষ্টা।

(চ). Avengers: Infinity War ও Endgame (২০১৮-২০১৯): থ্যানস চরিত্রের Infinity Gauntlet অনেকটা জাদুকাঠির মতোই প্রতীক, যার মাধ্যমে মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সিনেমাটিকে অনেকে 'God vs Anti-God' আখ্যানের আধুনিক রূপ বলেন।

অনেকের কাছেই মনে হতে পারে ফ্যান্টাসি গল্পের সিনেমাকে নিছক বিনোদন না মনে করে অতিরঞ্জিত কথক দিয়ে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বানিয়ে ফেলেছি। তা বলতে পারেন। অনেকের রাগও হতে পারে, আর হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ; এসব সিনেমা অনেকের আবেগ ও অনুভূতি। এজন্য আমার কোনো আপত্তি নেই।

প্রথমেই বলেছি– বিশ্বাসের বাইরে যেয়ে পড়তে। আপনার বিদ্যমান বিশ্বাসে আপনি স্থীর থাকুন। এই তত্ত্ব গ্রহণ করার দরকার নেই। নিছক গল্প হিসেবেই চিহ্নিত করুন। তবে, এইসব তথ্য যুক্ত করার আগে অসংখ্য.তথ্য পাঠ করেছি। এরপর আমি এটা যুক্ত করেছি। তাদের ছিল পরিপূরক যুক্তি, ছিল সম্পূরক তথ্য। পাতার সংকুলানে এখানে সব তথ্য যুক্ত করা যাচ্ছে না। তাই, শুধু ধারণা নিয়েছি।

কেন ব্যবহার করা হয় এসব প্রতীক? দর্শকের অবচেতন মনে নির্দিষ্ট বার্তা ঢোকানোর জন্য। Occult চিহ্ন ও মিথকে বিনোদনের আড়ালে স্বাভাবিক করে তোলা। গোপন সমাজের শক্তি ও প্রভাবকে প্রতীকীভাবে প্রদর্শন।

প্রাচীন ড্রুইডিক জাদুবিদ্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি মিশে তৈরি হয়েছে মানসিক-নিয়ন্ত্রণের শক্তিশালী যন্ত্র। চলচ্চিত্রের ভেতরে লুকানো প্রতীকগুলো দর্শককে শুধু আনন্দ দেয় না, তাদের অবচেতন মনকে গড়ে তোলে। ফলে হলিউড হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগের এক জাদুবিদ্যার ল্যাবরেটরি, যেখানে বাস্তবতা থেকে বিচ্যুতি ও মতাদর্শিক প্রভাব বিস্তার দুটোই একসঙ্গে ঘটে চলছে। এটাতে অভ্যস্ত করে ফেলা, যাতে প্রভাব সম্মুখে না পড়ে।

যেমন নব্বই দশকে যারা বিটিভির দর্শক ছিল। তারা ওইসময় সবার সাথে বসে সিনেমা দেখার সময় যদি কোনো দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক দৃশ্য আসত,

তাহলে একটা অস্বস্তি ও লজ্জা কাজ করত। অনুরূপ এখনও যারা এরকম আছে, তাদের এমনই লাগবে। কিন্তু, বর্তমান প্রজন্মের যারা পর্নো আসক্ত। তাদের কাছে এসব দৃশ্য শুধু নয়, কেউ উলঙ্গ হয়ে সামনে আসলেও তাদের স্বাভাবিক লাগবে। কারণ; তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

তেমনই এসব প্রতীক– গল্পে, সিনেমায়, নাটকে, গানে ইত্যাদিতে দেখে যখন মানিয়ে যাবে, তখন সামনে তা দৃশ্যমান হলে স্বাভাবিক লাগবে এবং সহজভাবে গ্রহণ করে নেবে। বলা হবে এটা তো অমুক সিনেমা, সেটা উক্ত সেলিব্রিটির সেলিব্রেশন। ফেতনাকে সহজ করে যখনই গ্রহণ করা হবে, তখনই তারা সফল।

ফেরাউন ও মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা

প্রাচীন মিশরে ফেরাউনের সময়েও প্রচার মাধ্যমে মানুষের মনে মিথ্যা তথ্য ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হতো। ফেরাউনের জয় জয়কার, অলৌকিক ক্ষমতা, এমনকি যুদ্ধের মিথ্যা জয়গান প্রচার করা হতো, যদিও বাস্তবে তিনি পরাজিত হন। আজকের আধুনিক মিডিয়া ও হলিউডও একই পদ্ধতিতে মানুষের মস্তিষ্ক ধোলাই করছে।

নীলচক্ষুদের নেতৃত্বে বিশ্বে জুলুম ও ষড়যন্ত্র

নীলচক্ষু ব্যক্তিদের অধিকাংশই ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্রীয়। তারা বিশ্বের বিভিন্ন সংকট ও সংঘর্ষের নেপথ্যে কাজ করে। যদিও সব নীলচক্ষু ব্যক্তি খারাপ নয়, তাদের মধ্যে সৎ ও সৎকর্মীও আছেন। তবে সংখ্যায় তারা খুবই সীমিত।

নীলচক্ষুদের গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো এলিট পরিবারগুলে, যাদেরকে খাঁটি ইয়াজুজ-মাজুজের অনুসারী হিসেবে ধরা হয়। বর্তমানে তারা ইসরায়েলের বেশি শতাংশ ভূমির মালিক। তাদের হাতে বিশ্ব-অর্থনীতি, রাজনীতি ও গোয়েন্দা তন্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

নীলচক্ষুর রহস্য শুধু একটি শারীরিক বৈশিষ্ট্য নয়, বলা যায় একটি প্রাচীন, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ষড়যন্ত্রের প্রতীক। আমাদের সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় এই বর্ণের কিছু মানুষই বিশ্বের নানা অশান্তি ও দুঃখের মূল কারিগর।

ইয়াজুজ-মাজুজের রক্তবাহক খাযার ইহুদীর বাস্তবতা

বিশ্বজুড়ে যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ এখনও মুক্ত হয়নি, তাদের অবহেলা বা অনাসক্তি কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ভুল বুঝে নেওয়ার

কারণ হতে পারে। মহান আল্লাহ্ তায়ালা যুলকারনাইনের প্রাচীর আজও অক্ষত রেখেছেন বলেই তারা দাবী করছেন। তবে, যারা এ দাবী করেন, তাদের উচিত যে তারা ঐ প্রাচীরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রমাণ দিক যে, এটা সত্যিই এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আগের পাতায় বিভিন্ন গবেষনাপত্র, বই, ব্লগ, আর্টিকেল ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং অনুসন্ধান করে সেই প্রাচীরের অবস্থান দেখানোর চেষ্টা করেছি। রূপক অর্থ দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্রকে উপস্থাপনের চেষ্টাও করেছি। সম্মুখে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে অবগত করব ইনশাআল্লাহ।

কোরআন অনুসারে এ ধরনের অনুসন্ধানে প্রচেষ্টা না করলে এই বিশ্বাস কীভাবে বৈধ হবে, তা ব্যাখ্যা করা তাদের দায়িত্ব। অতীতে কেউ কখনও এই প্রাচীর প্রত্যক্ষ করেছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরও তাদের দিতে হবে। বিশেষ করে আজকের আধুনিক যুগে, যেখানে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ও গুগল আর্থের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চির চিত্র দেখা সম্ভব, সেখানে কেন ঐ প্রাচীর ও ইয়াজুজ-মাজুজের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হয় না– এমন প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া প্রয়োজন। শুধু গায়েবি বলে, অযুক্তি দিলে তো হবে না, সেটাও প্রমাণ করতে হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজের আধুনিক বাহক ও বিশ্ব শাসন

মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমন একটি গোষ্ঠী বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি রাজনীতি, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, বিনোদন ও এমনকি খাদ্য-ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, যা দিন দিন আরও শক্তিশালী হচ্ছে। তাদের সামনের কোনো শক্তি এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নেই যে, তারা তাদের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

তারা শুধু বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ করেনি, পৃথিবীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মুছে দিয়ে একরকম একটি ঈশ্বরহীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিশ্বায়িত সমাজ গড়ে তুলেছে। পশ্চিমা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা এবং ইউরোপীয় বিশ্বব্যবস্থার মাধ্যমে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে সচেষ্ট।

সমাজে পলিথিয়িজম থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও নৈতিক অবক্ষয়

তারা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, শিল্পোৎপাদন, তথ্য প্রযুক্তি ও যৌনবিপ্লবের মাধ্যমে সমাজকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে। আজকের দিনেও নতুন পণ্য, ফ্যাশন এবং জীবনধারাকে সর্বোত্তম হিসেবে মানুষের মাঝে প্রচার করা হয়।

এর ফলে মানুষের নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নারীদের চরিত্রহীন করা হয়েছে, পোশাক এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যা তাদের নান্দনিকতা নয়, তা নগ্নতার ন্যায়। পুরুষদের মধ্যে নগ্নতার প্রতি আগ্রহ এতটাই বেড়ে গেছে যে, বিবাহের মর্যাদা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এবং অবৈধ সম্পর্ক ও অবাধ যৌনাচার সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিবাহবহির্ভূত অনৈতিক, অবৈধ সম্পর্ক বর্তমান আধুনিকতার প্রধান শর্ত হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে।

এছাড়া সমকামিতা (হোমোসেক্সুয়ালিটি ও লেসবিয়ানিজম) সমাজের এক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাময়িক তৃপ্তির জন্য মানুষের জীবনধারা ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসাত্মক হচ্ছে। বৈধ বিবাহকে এখন প্রজন্ম ঝামেলা মনে করে। এজন্য শুধু অবৈধ প্রেম নয়, তারা লিভ-টুগেদার পর্যন্ত আধুনিক বানিয়ে ফেলেছে। একই ঘরে থাকবে, যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হবে। তথা সংসারের মতোই, তবে তা অবৈধ বসবাস।

একটা সময় মানুষ পতিতালয় বা সেক্সহাউজে গিয়ে তার শারীরিক চাহিদা মেটাত। কিন্তু এখন এই বিষয়গুলোকে আরও আধুনিক ও সহজ করে লিভ-টুগেদার পন্থা বলা হয়। যা এরচেয়ে নিকৃষ্ট। এখানে আত্মার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থাকে, শুধু থাকে যৌনতা।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, বর্তমান গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবে নানা ধরনের মুভি সিনেমা ডকুমেন্টারি আমাদের সমাজমানসে পাশ্চাত্য জীবনের নানা দিক প্রভাব ফেলছে, অনেকে সেটা গ্রহণ করছে। তার সঙ্গে আমাদের সমাজে ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের চিন্তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। সে কারণে লিভ-টুগেদারের সংখ্যা বাড়ছে। আগে পর্নোগ্রাফি সিডিতে দেখত, এখন হাতের মুঠোয়। এর থেকে আক্রান্ত হয়ে এসব করতে থাকে।

সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এরা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে থাকছে, লিভ-টুগেদার করছে। এতে তাদের জৈবিক চাহিদাও মিটছে আবার সামাজিক নিরাপত্তাও থাকছে। তবে, সমাজে লিভ-টুগেদার ভয়ংকর অপরাধ ডেকে আনছে। করে যাচ্ছে মহাপাপ, যা জাহান্নামের দরোজায় তাদের নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান বেশিরভাগ বৈবাহিক সম্পর্কে দেখা যায় না আত্মার নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম ভালোবাসা। কেন জানি বর্তমান বিবাহগুলো সমাজের দায় মেটানো, পরিবারের অনুষঙ্গ হিসেবে করা হয়, যাতে ভালোবাসার চেয়ে যৌনতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা যায়। কী নষ্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রজন্ম ও সমাজ। এপর্যায়ে একটা ঘটনার অবতারণা করছি।

অর্ধাঙ্গিনী না কি বউ?

দেশের বেশিরভাগ বিবাহিত পুরুষের বউ আছে, তবে অর্ধাঙ্গিনী খুব কমই আছে। অনেকেই বিবাহ করে বউ নিয়ে আসে। তবে, অর্ধাঙ্গিনী কজন আনতে পারে? বলতে পারেন দুটো তো একই! এসব কেমন কথা হলো? কিন্তু আমি মনে করি না। শরীরের একটা অঙ্গ যেমন আপনার আমার জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ন। শরীরের একটা অঙ্গ ছাড়া যেমন নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ লাগে না। তেমনই অর্ধাঙ্গিনী। তথা বিবাহিত পুরুষের শরীরের অর্ধেক অংশকে অর্ধাঙ্গিনী বলে, বউ বলে না। যেমন প্রেয়সী ও গার্লফ্রেন্ড এক নয়, তেমনই এটা।

অর্ধাঙ্গিনীর মাহাত্ম্য বিশাল। এটা শুধু রাতের বিছানায় ভোগের অনুষঙ্গ নয়! সংসারের যাবতীয় কাজ করানোর জন্য নয়! গোসল করে লুঙ্গিটা রেখে দেওয়া, খাবার খেয়ে প্লেটটা ওভাবেই রাখা। অতঃপর নিজেকে জমিদার পুরুষ মনে করে তাকে দিয়ে সব করানো, ছোট একটা ভুলে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটানো। কদাপি অনুভব ও অনুভূতি ছাড়া রাতে বিকৃত যৌনাচার করা। এসব যারা করে, তাদের ওটা বউ হতে পারে, তবে অর্ধাঙ্গিনী নয়। আধুনিকতা বোধহয় এটাই। বিবাহ এখন হয়ে গেছে একটা দায় মেটানোর বিকৃত রীতি।

পরকীয়া শুধু পুরুষের শারীরিক অক্ষমতার ফলে হয় না। সময়, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের অভাবেই বেশি হয়। সময় কোনো অমূলক বিষয় নয়। বিবাহিত পুরুষটা যে-কোনো কাজেই থাকুক। কর্মসংস্থানে ৮-১০ ঘণ্টা কর্মরত থাকা অবস্থায় এমন নয় যে, সে প্রতিটি সেকেন্ড ব্যস্ত থাকে। ইচ্ছে থাকলে কাজের ফাঁকে ১-২ মিনিট অর্ধাঙ্গিনীর খবর নেওয়ায় যায়। সে কী করছে, তা একটু শোনাও যায়। দুপুরের মধ্যাহ্নভোজের সময় তাকে মুঠোফোনে নিয়ে ওপাশ থেকে বলাই যায়, চলো এক সাথে খাই। বাড়ি ফিরে এসে খাবার তৈরির জন্য তাকে সাহায্য করাই যায়। রান্নাঘরে খুনসুটি করে দুজন মিলে একসাথে রান্নাঘরে খাবারটা গরম করাটা মনে হয় না খুব কঠিন। কাজের অযুহাত হলো, সবচেয়ে বড়ো ধাপ্পাবাজি।

তিনি সারাদিন আপনার অপেক্ষায় বিরাজমান। একসাথে খাবে বসে আছে। তো তার সাথে বসে এক থালায় খাওয়াটা ন্যাকামি নয়। দুজন মিলে কাপড়-জামা ও এঁটে বাসন ধোয়াটা মনে হয় না কঠিনতম। বন্ধুমহলে কম সময় দিয়ে তাকে একটু বেশি সময় দেওয়া, সন্ধ্যা পর বাইরে যেয়ে খোলা পরিবেশে দুজন একসাথে চা খাওয়াটা মনে হয় না বিরক্তিকর! সারাদিনের ক্লান্তির এটাই তো একটা প্রশান্তি। এটাই তো ভালোবাসা। জোছনা রাতে তার সাথে বাইরে বসে দশ-বারো মিনিট মিষ্টি

কথা বলাটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না। তার কাছে আহ্লাদ করে দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা শুনতে চাওয়াটা বিরক্তিকর নয়। হাত দুটো ধরে কিছু সময় গভীর আবেগে ভেসে যাওয়াটা ঢং নয়। এসব মানে এটা নয় যে উক্ত লোকটি তার সহধর্মিণীর গোলাম। এটা কিন্তু সুন্নত, সহধর্মিণীর সাথে মিষ্টি করে কথা বলাটাও আমাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সুন্নাত বলা হয়েছে।

এসবকে ন্যাকামু বা গোলামি বলে না। সময় তো কম, আমরা সকলেই মুসাফির। এত অল্প সময়ে কেন জীবনটা রোবটের মতো বানিয়ে নিতে হবে? জীবন তো ফড়িংয়ের। অর্থের পিছনে ছুটতে ছুটতে আমরা আমাদের জীবনের মহামূল্যবান শান্তির সময়টা হেলায় হারাই। তবে ভালোবাসা ও শান্তি না থাকলে, কী দরকার এত প্রাচুর্যের? সে-তো এসব একদিন বারোভূতে খাবে। আমি সেদিন শুয়ে থাকব সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে। দেহ থেকে রুহ প্রস্থান করলে আর এসব কই? তখন কিন্তু ঠিকই আমাদের দাঁড়াতে হবে মহান 'রাব্বে কারীম'-এর কাছে। কৈফিয়ত দিতে হবে আমার প্রতিটি কাজের। বিবাহ মানে যদি হতো শুধু যৌন-চাহিদা মেটানো ও বংশবিস্তার করা অথবা ঘরের একটা কাজের লোকের শোপিস পূর্ণ করা।

তাহলে বিবাহকে কখনোই আমার ধর্ম এত গুরুত্ব দিত না। শারীরিক ভালোবাসা তো কিছু সময়ের সুখ মাত্র। আর আত্মার ভালোবাসা চিরস্থায়ী। এটা ভাবা যাবে না যে, যাই করি সে সামাজিক মতে আমার বউ, তো যাই করি থেকেই যাবে। এসব তাল মেলানো তথাকথিত সামাজিক-ব্যবস্থাকে বিবাহ বলা যেতে পারে, তবে দাম্পত্য জীবন বলা যায় না।

ভালোবাসা নিরন্তর হলে নাকি কেউ ছেড়ে যেতেই পারে না। আর তাতে-ও যদি কেউ যায়, তার মতো কপালপোড়া আর কেউ হয় না। আবেগের বসে প্রস্থান করবে আপনার জীবন থেকে। তবে, একটা সময় পর ঠিকই প্রতিটি মুহূর্তে আপনাকেই মনে করবে। ফিরতে চাইবে, কিন্তু সেদিন আসার দরোজা পাবে না। আর এটাই হবে তার জীবনে সবচেয়ে বড় শাস্তি। তাই ভালো ওভাবেই বাসতে হবে, যেভাবে বাসলে আপনার অভাব তাকে একদিন কাঁদাবে। স্বামী শাসন করতেই পারে, কিন্তু শোষণ করা যাবে না। শাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে, শোষণের অধিকার দেওয়া হয়নি।

আর বর্তমান বিবাহ তো আমার পছন্দই হয় না। যৌতুক নামক মহামারী তো আছেই। সাথে দেনমোহর কী জিনিস? তাই বোঝে না অনেকে। কাবিন আর দেনমোহর গুলিয়ে ফেলে। এরা দেনমোহর মানে মনে করে খাতায় তোলা একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম। অনেক নির্লজ্জ তো বাসরঘরে বলে, 'দেনমোহর কী

নিবা? বউ তখন বলে, 'আপনিই আমার দেনমোহর।' ব্যস যুক্তি দিবে যে বউ মাফ করে দিলে আর দেনমোহর আদায় করতে হবে না। হাতের ভিতরে পাঁচশ টাকা দিয়ে জানোয়ারের মতো যৌনাচার করে যাবে মৃত্যু অব্দি আর বাচ্চা পয়দা করবে।

কোন বউ আছে এমন যে বাসরঘরে বলবে– আমার এত টাকা দেনমোহর লাগবেই? এমন যদি কেউ করে থাকে, তথা দেনমোহর আদায় ছাড়া শারীরিক সম্পর্ক। তবে, বিবাহ থেকে শুরু এখন পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক জিনা হিসেবে গণ্য হবে। বিবাহ করার পরেও জিনা! কতটা মারাত্মক? দেনমোহর মাফ করার জিনিস না। ফাজলামোর বিষয় না এটা।

কথা হলো, নৈতিকতা নিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হবে। এতে কখনোই বিচ্ছেদ হবে না। ঝগড়া তো হবেই। কিন্তু সেই ঝগড়া কখনো দ্বিপাক্ষিক করা যাবে না। একজন রেগে গেলে আরেকজনের চুপ থেকে সমর্থন দেওয়াটাই হলো, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। দুইজন একসাথে হাইপার লুপে থাকলে, সেই সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়িত্ব হবে না। সম্পর্কে ফাঁকফোকড় সৃষ্টি হলেই, সেই সম্পর্ক আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। বাঁধে ছোট ফাটল থাকলে যেমন একটা সময় সেই বাঁধ পুরো ভেঙে এলাকা পানি দিয়ে তলিয়ে দেয়, বন্যা বয়ে দেয়।

তেমনই সম্পর্কে ছোট ফাঁক সৃষ্টি করলেও একটা সময় সেই সম্পর্ক ভেঙেচুরে তলিয়ে দেয়। তখন থাকে সামাজিক সম্পর্ক, তবে ভালোবাসা থাকে না। কেউ কেউ বলে, "ঝগড়া না হলে নাকি, ভালোবাসা কমে যায়। তাই মাঝেমধ্যে ঝগড়া করতে হয়।" এই ধারণাটা ভ্রান্ত, মনগড়া, যুক্তিবোধহীন। রাগ হবেই, রাগ ভাঙালে ভালোবাসা বাড়ে, কিন্তু ঝগড়া করলে কখনোই নয়।

রাগ-অভিমান শেষে, আগ বাড়িয়ে দুঃখিত বলিয়া, তাহাকে আবেশে আলিঙ্গন করাটা মনে হয় না ছোট হওয়া। ইগো দিয়ে ভালোবাসা হয় না। ইগোকে পদদলিত করে, আগ বাড়িয়ে কথা বলে তাকে মুহূর্তে হাস্যজ্জল করে সুন্দর সময় পার করাটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। তো কেন এত অহংকার ও রাগ রাখতে হবে?

জীবন তো ক্ষণিকের। কেন ঝগড়া করে কথা না বলে দশ মিনিট হলে-ও নষ্ট করবেন? প্রতিটি সেকেন্ডই খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময়ে এসে এই সময়ের অভাব বুঝবেন। সেদিন আর লাভ হবে না। ভালোবেসে ভালো হয়ে থাকুন। সহধর্মিণীকে– বউ ও অপ্রয়োজনীয় আসবাব নয়, ভোগের অনুষঙ্গ নয়, অর্ধাঙ্গিনী ভাবতে হবে। শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা– এসব সমপরিমাণ দিতে হবে। তবেই

সম্পর্কগুলো জন্মান্তর অবলীঢ় থাকবে। জান্নাতেও আপনার পৃথিবীর সহধর্মিণীকে পাবেন। 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন' আপনার পৃথিবীর ওই মানুষটাকে জান্নাতেও দিয়ে দিবেন। যৌন ভোগের জন্য নয়, আত্মার অস্তিত্বে অক্ষুণ্ন রেখে তাকে ভালোবাসুন। এই আধুনিকতা নামক রাক্ষসের কবল থেকে বের হয়ে আসা উচিত।

কবির ভাষায় বললে— "এই জন্মের দূরত্বটা পরের জন্মে চুকিয়ে, এই জন্মের মাতাল চাওয়া পরের জন্মে থাকে যেন। মনে থাকবে?"

পৃথিবীর গগণচুম্বি নগরী ও বৈশ্বিক আধিপত্য

তারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গগণচুম্বি ভবন নির্মাণ করেছে, যেমন ম্যানহাটনের অত্যাধুনিক আকাশচুম্বী ভবনসমূহ, যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জন্য মাত্রাকৃতির উদাহরণ।

বিশ্বের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে তারা বিলুপ্ত করে একক, ধর্মনিরপেক্ষ ও ঈশ্বরহীন সমাজ তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। মুসলিম সমাজের জন্য নবী (সা.)-এর ভয়াবহ সতর্কবাণী যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক যে, তারা তাদের দুনিয়াদারি অনুসরণ করবে এমনকি গিরগিটির গর্তেও প্রবেশ করলেও।

ইউরোপীয় ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মিথ্যা মিত্রতা ও বৈশ্বিক নিপীড়ন

ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা প্রাচীন বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব ভুলে আজ এক অদ্ভুত মিত্রতায় পরিণত হয়েছে। তারা বিশ্বের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বৈষম্যমূলক বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করেছে যা অ-ইউরোপীয়, বিশেষ করে আরব বা মুসলমানদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন বয়ে আনে।

এই বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বব্যাপী নানা দেশের অধিবাসীরা নিপীড়িত, সম্পদ লুটপাট ও শোষণের শিকার। তাদের উদ্দেশ্য ধর্মীয় জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষ করে ইসলামের জীবনব্যবস্থা উচ্ছেদ করা।

অত্যাচার, দুর্নীতি ও শোষণের গ্লোবাল মেশিন

তারা তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে দুনিয়ায় দুর্নীতি, অত্যাচার ও ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দেয়। যদিও তারা অতীতে ক্ষমা চাইছে, তাদের প্রকৃত দুষ্ট কার্যাবলী চলছে অব্যাহত। যারা সৎ ও অন্যায়ের বিরোধী, তারাও এই শাসন থেকে রেহাই পায় না।

উদাহরণস্বরূপ, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকেও তারা 'বুড়ো গর্দভ' বলে উপহাস করেছে। আর্থার কোয়েস্টলার, যিনি খাযার ইহুদী গোত্রের অন্ধকার মুখোশ উন্মোচন করার চেষ্টা করেছিলেন, তাকে ও তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয় এবং পরে প্রচার করা হয় তারা আত্মহত্যা করেছে।

ইয়াজুজ-মাজুজের রক্তবাহকরা বর্তমান বিশ্বে অন্যতম প্রধান ষড়যন্ত্রকারী। তারা বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা দখল করে মানবজাতির ওপর দীর্ঘমেয়াদী শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রকৃত পরিচয় ও উদ্দেশ্য সচেতন মানুষের জন্য জেনে রাখা ও বিপদ থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আধুনিক বিশ্বে নিপীড়নের মুখচ্ছবি: ক্রুসেডের উত্তরাধিকার এবং অর্থনৈতিক গোলামি

পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিত সভ্যতা আজ এমন এক নির্মম ও বৈষম্যমূলক রূপ ধারণ করেছে, যা অতীতের ইতিহাসকেও ম্লান করে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের যুগে কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিষ্টানদের উপর যে বর্বরতা চালানো হয়েছিল, তা-ও ম্লান হয়ে গেছে আজকের ইউরোপীয় খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর সামরিক আগ্রাসনের তুলনায়। ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া কিংবা গাজার নিরস্ত্র মানুষদের উপর ইসরায়েলীদের অবিরাম নিধনযজ্ঞ– এই সবকিছু মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে।

এই আগ্রাসনের মূল প্রেরণা নিছক রাজনৈতিক নয়, এক বৈশ্বিক ব্যবস্থা, যেখানে অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিও একই সূত্রে গাঁথা। আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা, যা একসময় সোনার দীরহাম ও দীনারের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ তা বদলে গেছে একধরনের কাগুজি মুদ্রায়, যার কোনো বাস্তব মূল্য নেই এবং যার মূল্যায়ন কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত হয়। এই 'নন-রিডিমেবল' কাগুজি অর্থনীতির মাধ্যমে তারা এমন এক জটিল ঋণব্যবস্থা তৈরি করেছে, যেখানে সুদ-সহ ঋণ পরিশোধ করা

প্রায় অসম্ভব। ফলে, বিশ্বব্যাপী অনগ্রসর দেশগুলো অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এই 'ব্যবস্থা' শুধু চুরি নয়, আইনসিদ্ধ চুরির এক পরিশীলিত রূপ। তথাকথিত বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা– সবই ব্যবহৃত হচ্ছে গরিব দেশগুলোর সম্পদ চুষে নিতে। তাদের অর্থনীতি যেমন ধ্বংস করা হচ্ছে, তেমনি তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোও ভেঙে ফেলা হচ্ছে এক ভয়ংকর ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব গঠনের অভিপ্রায়ে।

ক্রুসেডের ছদ্মরূপ- সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ

এই সমস্ত যুদ্ধ ও আগ্রাসনের মূলে রয়েছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যা 'ক্রুসেড' নামেই পরিচিত। ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পবিত্রভূমি পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে 'ক্রুসেড' চালিয়েছে। ১৯১৭ সালে, ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল অ্যালেনবী যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা দেন– "আজ ক্রুসেড শেষ হলো"। তিনি প্রকৃতপক্ষে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রকল্পের পূর্ণতা ঘোষণা করেছিলেন।

তবে বাস্তবতা হলো, এই ক্রুসেড থেমে যায়নি। এর নাম বদলেছে– 'War on Terror' বা 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'। এই যুদ্ধ কখনোই সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য নয়, এর উদ্দেশ্য হলো– ইসলামী ভূখণ্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।

ইউরোপীয় খাযার ইহুদীদের ভূমিকা

এই ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ইউরোপীয় খাযার ইহুদীরা। সেমেটিক জাতি না হয়েও তারা এক ভয়ংকর জায়োনিস্ট জাতিগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। এই ইহুদীরাই শুরু করে 'Zionist Movement', যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পবিত্রভূমিতে ইসরায়েল রাষ্ট্র পুনর্গঠন করা।

ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সহযোগিতায় খাযার ইহুদীরা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে হামলা চালায়, রাষ্ট্র দখল করে এবং 'সেমেটিক ইহুদীদের' নামে নিজেদের স্থান করে নেয়। এই ব্যবস্থার বিরোধিতা যে-ই করেছে, তাকেই 'Anti-Semitic' তকমা দিয়ে হেনস্থা করা হয়েছে।

ইসরায়েল রাষ্ট্র—এক নববিস্তারের প্রকল্প

ইসরায়েল এখন আর শুধুই একটি রাষ্ট্র নয়; এটা এক পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে পুরো ইউরোপীয় ইহুদী-খ্রিষ্টান-ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, গণমাধ্যম, ব্যাংকিং-ব্যবস্থা– সবকিছুই আজ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর পিছনে রয়েছে এক বিস্তৃত পরিকল্পনা, যা ইসলামী সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, পাপমগ্ন, ঈশ্বরহীন বিশ্ব গড়তে চায়।

ইসলামী সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন করতেই তারা বিশ্বায়নের নামে নারীদেরকে উলঙ্গ করেছে, যৌন বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজকে বিপর্যস্ত করেছে, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে। এই সমাজে সন্তান জন্ম নেয় বিয়ের বাইরে, গৃহস্থালি হারিয়েছে তার শৃঙ্খলা। আর এইসব অসঙ্গতিকে তারা 'মুক্তচিন্তা' নামে প্রশ্রয় দেয়।

এবার একটু ভিন্ন আঙ্গিকে এ বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। তথা আমরা এবার প্রবেশ করব প্রযুক্তির জগতে। এই তত্ত্ব অতিরঞ্জিত লাগতে পারে। তবে মস্তিষ্ক থেকে কিছু সময়ের জন্য আপনার লালিত চিন্তাধারাকে দূরে রাখুন, এরপর এই অধ্যায়ে প্রবেশ করুন। সব ব্যাখ্যা একজায়গায় আনার ব্যর্থ চেষ্টা হলেও, দেখুন তো মিলে কি না?

ইয়াজুজ-মাজুজ, দাজ্জাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI): শেষযুগের প্রযুক্তিভিত্তিক দাসত্ব ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে মানুষের শরীরে চিপ বসানো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে চিন্তা নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল পরিচয়ের মাধ্যমে পুরো মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তুতি সম্পন্ন হচ্ছে। এই প্রযুক্তি আধিপত্য শুধু ভবিষ্যতের জ্ঞান-বিপ্লব নয়, এ বহু পূর্বেই পূর্বাভাস দেওয়া এক ভয়ংকর বাস্তবতা– যা ইসলামী ইস্কাতোলজিতে দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ও কেয়ামতের আলামতসমূহের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

১. ইয়াজুজ-মাজুজ ও প্রযুক্তি বিস্ফোরণ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ"

"যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দৌড়ে আসবে।"[১]

এই আয়াতের মূল শব্দ "يَنسِلُونَ" অর্থাৎ দ্রুত ছুটে আসা, যেন স্রোতের মতো। এখানে ব্যাখ্যা করা যায়, এটা শুধু মানব সংখ্যা বা জাতির বেগ নয়, এটা তাদের প্রযুক্তির গতি, যোগাযোগ মাধ্যম, তথ্য প্রবাহ ও সামরিক আগ্রাসন নির্দেশ করে।

বিশ্ব আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে, তথ্য প্রবাহ ৫জি-৬জি গতিতে চলছে। মানব-মস্তিষ্কে চিপ বসানোর গবেষণা চলছে (Neuralink, Brain-Machine Interface)। ড্রোন, রোবট, সেনা ও এআই সেন্সর বিশ্বজুড়ে বিস্তার লাভ করছে। এ যেন এক প্রযুক্তি-নিয়ন্ত্রিত ইয়াজুজ-মাজুজদের যুগের প্রস্তুতি!

আজকের ভিআর (Virtual Reality), এআর (Augmented Reality), ডিপফেইক (Deepfake) ও মেটাভার্স যেন এই ভবিষ্যদ্বাণীর ডিজিটাল রূপ! এক

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৯৬

তরফে বাস্তবতা বিকৃত করার প্রযুক্তি, আরেক দিকে মানুষের বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য।

দাজ্জালের এক চোখ শুধু দৃষ্টিশক্তির প্রতীক নয়, একে একচোখা মিডিয়া, সেন্সরশিপ ও মনোযোগ-নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীর রূপক বলেও ব্যাখ্যা করা যায়। এদের বলা যেতে পারে আসন্ন মানব দাজ্জালের অনুসারী বা বার্তাবাহক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমাদের দেশের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূস বা আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী (যে-কেউ হতে পারে) যদি চট্টগ্রাম বা সিলেট অথবা অন্য কোনো এলাকায় যায়, তখন নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, প্রস্তুত করে অর্থাৎ সব ঠিকঠাক করার পরেই রাষ্ট্রপ্রধানকে সেখানে আসতে দেওয়া হয় বা সে আসে। তেমনই এসব প্রযুক্তি ইত্যাদি হচ্ছে দাজ্জালের সেই বাহিনী, যারা আগে থেকেই সবকিছু প্রস্তুত করে নিচ্ছে।

৩. নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: গ্লোবাল কন্ট্রোলের স্বপ্ন

'New World Order'– একটি টার্ম, যা এক শ্রেণির বিশ্বনেতা, ব্যাংক পরিবার (যেমন: রথচাইল্ড, রকফেলার) এবং গোপন সংঘ (ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসন) দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে।

এর মূল লক্ষ্য: জাতিরাষ্ট্র বিলুপ্তি, একক বৈশ্বিক সরকার প্রতিষ্ঠা, একক মুদ্রা (ডিজিটাল), একক ধর্ম বা মূল্যবোধ (Secular-Humanist) এবং একক সেনাবাহিনী ও নজরদারি-ব্যবস্থা।

এতে মূল ভূমিকা পালন করছে AI, Big Data, Surveillance System, Social Credit Score, Biometric ID ও Geoengineering।

৪. দাজ্জালীয় নিয়ন্ত্রণ ও চিপ প্রযুক্তি: সহীহ হাদীসের পরিপূরক ভবিষ্যদ্বাণী?

দাজ্জালের আগমন যখন ঘটবে, তখন তিনি মানবজাতিকে জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণে আনবেন। কেউ তার প্রতি ইমান না আনলে, খাদ্য, পানি, সম্পদ– কিছুই পাবে না।

বর্তমানে এমন ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে যেখানে, ক্যাশলেস সোসাইটি: শুধু ডিজিটাল ওয়ালেট দ্বারা লেনদেন। চিপ যুক্ত পাসপোর্ট, পেশেন্ট আইডি, ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। CBDC (Central Bank Digital Currency) দ্বারা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থনীতির সূচনা।

দাজ্জাল যদি এই চিপ বা ডিজিটাল পদ্ধতির উপর মানুষের খাদ্য ও জীবননির্ভরতা নির্ভরশীল করে, তাহলে ইসলামের বর্ণিত সেই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের যুগ অনেকটা বাস্তবতার দ্বারপ্রান্তে। এরা কীভাবে যেন সেই মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছে। দাজ্জালের আগমনের পথ সুগম। ইহুদী বংশে দাজ্জাল মানব শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হবে অর্থাৎ ইহুদী-ঘরে জন্ম নেবে। দাজ্জাল কোনো সামুদ্রিক দ্বীপে বন্দী নেই বা দাজ্জালের গায়ে পশম, আলিফ-লায়লার দানবের মতো আকৃতি, রূপকথা বা ঠাকুমার ঝুলির রাক্ষসের মতো দেখতে– এসব মনগড়া গল্প। এ বিষয়ে একটা সহীহ সনদের হাদীস আছে, তাও ব্যাপক সমস্যাযুক্ত। বর্ণনাকারীও একজন, আবার এই হাদীসের সাথে দাজ্জাল বিষয়ক অন্য হাদীসগুলো অনেক বেশিই সাংঘর্ষিক। অর্থাৎ, মান সহীহ হলেও, হাদীসটি খুব সমস্যাযুক্ত হাদীস। জাল বলা হয়নি, তবে সমস্যা দিয়ে ভরা। এপর্যায়ে সেই হাদীসটা দেখা নেওয়া যাক।

তামিম আদ-দারি (রা.) ও দাজ্জাল: একটি হাদীসের পর্যালোচনা

সূত্র ও বর্ণনা:

নবম হিজরিতে তিনি তাঁর গোত্রের ৯ জন সদস্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হন এবং খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসেন। তবে, তাঁকে মুসলিম উম্মাহর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত করে তুলেছে দাজ্জালের সাথে তাঁর অবিশ্বাস্য সাক্ষাতের ঘটনা। আবু দাউদ ও মুসলিম শরীফের একাধিক বর্ণনার আলোকে সেই কাহিনি নিচে তুলে ধরা হলো।

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এশার নামাজে আসতে বিলম্ব করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি এসে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন, "তামিম আদ-দারি থেকে দ্বীপস্থ এক ব্যক্তি অর্থাৎ দাজ্জালের কথা শুনতে গিয়ে একটু বিলম্ব হয়ে গেল।"

নামাজ শেষে রাসূল (সা.) হাসিমুখে মিম্বরে বসলেন এবং উপস্থিত সকল সাহাবীকে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি জানো, আমি কিজন্য তোমাদের বসতে বলেছি?" সাহাবায়ে কেরাম বিনীতভাবে বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন।" তিনি ইরশাদ করলেন, "কোনো ওয়াজ-নসিহতের জন্য নয়; শুধু তামিম আদ-দারি থেকে শ্রুত একটি ঘটনা শোনানোর জন্যই তোমাদের একত্র হতে বলেছি। তা হলো"–

তামিম আদ-দারি (রা.) সমুদ্রযাত্রা ও রহস্যময় প্রাণীর সন্ধান:

তামিম আদ-দারি (রা.) ছিলেন একজন খ্রিষ্টান। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর এক পুরনো ভ্রমণের কথা শোনালেন। তিনি বললেন, তিনি একবার লাখাম ও জুজাম গোত্রের ৩০ জন লোকের সঙ্গে জাহাজযোগে সমুদ্র ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। একমাস ধরে তাদের জাহাজ উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে ভাসতে ভাসতে অবশেষে এক জনমানবহীন দ্বীপে এসে পৌঁছায়।

তারা জাহাজের নোঙর ফেলে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে দ্বীপে প্রবেশ করতেই এক অদ্ভুত প্রাণীর দেখা পেলেন। তার সারা শরীর ছিল ঘন লোমে আবৃত, এতটাই ঘন যে তার নারী না পুরুষ তা বোঝার উপায় ছিল না। অন্য বর্ণনায় একে দীর্ঘকেশী এক রমণী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তারা প্রাণীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ধ্বংস হও, কে তুমি?" সে উত্তর দিল, "আমি জাসসাসাহ (গোয়েন্দা)।" তারা আবার জিজ্ঞেস করল, "জাসসাসাহ আবার কী?" সে একটি প্রাসাদের দিকে ইশারা করে বলল, "ওই যে একটি প্রাসাদ দেখা যায়, সেখানে যাও। সেখানে এক ব্যক্তি তোমাদের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।" তার এই কথায় তামিম ও তার সঙ্গীরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, এই প্রাণীটি আবার কোনো শয়তান (জ্বিন-ভূত) নয় তো!

কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তারা দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন এবং ওই প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ভেতরে প্রবেশ করে তারা এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখলেন: এক বিশাল আকৃতির মানুষ মজবুত লোহার শিকলে বাঁধা। তার দুই হাঁটুর মধ্য দিয়ে উভয় হাত ঘাড়ের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা ছিল যে, সে নিজের মাথার চুল ধরে টেনে ছিঁড়ছিল। এমন বৃহদাকৃতির মানুষ এবং এত মজবুত শিকলের বন্ধন এর আগে তামিম কখনো দেখেননি।

তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ধ্বংস হও, কে তুমি?" সে বলল, "তোমরা আমার কিছু না কিছু পরিচয় তো পেয়ে গেছ।" অন্য এক বর্ণনায় সে পরিষ্কার করেই বলল, "আমি দাজ্জাল।"

এরপর দাজ্জাল তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করল। প্রথমে তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা নিজেদের পরিচয় ও সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য খুলে বলল। এরপর দাজ্জাল জিজ্ঞেস করল:

বাইসানের খেজুর বাগান: "তোমরা আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের কথা বলো; তাতে খেজুর ফলে কি?" তারা বলল, "হ্যাঁ!" দাজ্জাল বলল, "সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এগুলোতে ফল ধরবে না।"

তাবারিয়্যা সাগর: "আচ্ছা! তাবারিয়্যা সাগরের ব্যাপারে আমাকে অবগত করো; তাতে পানি আছে কী?" তারা বলল, "সেখানে প্রচুর পানি আছে।" দাজ্জাল বলল, "সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন ওই সাগরে পানি থাকবে না।"

জুগারের ঝরনা: "জুগারের ঝরনার ব্যাপারে আমাকে অবহিত করো; তাতে পানি আছে কি না এবং সে এলাকার মানুষ তার পানি দ্বারা চাষাবাদ করে কি না?" তারা বলল, "এতে যথেষ্ট পানি আছে এবং সে এলাকার মানুষ সেই পানি দিয়ে চাষাবাদও করে।"

উম্মিদের নবী: সবশেষে দাজ্জাল বলল, "তোমরা আমাকে উম্মিদের নবীর ব্যাপারে বলো। তিনি এখন কী করছেন?" তারা বললেন, "তিনি হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনায় চলে এসেছেন।" দাজ্জাল জিজ্ঞেস করল, "আরবের মানুষ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে কি?" তারা বললেন, "হ্যাঁ! করেছে।" সে জানতে চাইল, "তিনি তাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন?" তারা উত্তর দিলেন, "তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।" দাজ্জাল বলল, "বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়াই জনগণের জন্য কল্যাণকর ছিল।"

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে দাজ্জাল বলল: "এখন আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদের বলছি। আমি মাসীয়াহ্ দাজ্জাল। শীঘ্রিই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে গিয়ে আমি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করব। ৪০ দিনের ভেতর এমন কোনো জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে, মক্কা ও তাইবাহ (মদিনা) এ দুটি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ দুটির কোনো একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে সম্মুখে এসে আমাকে বাধা দেবে। এ দুটি স্থানের সকল প্রবেশ পথে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে।"

বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) বলেন, তখন রাসূল (সা.) তাঁর ছড়ি দ্বারা মিম্বরে আঘাত করে বললেন, "এ হচ্ছে তাইবাহ, এ হচ্ছে তাইবাহ, এ হচ্ছে তাইবাহ।" অর্থাৎ তাইবাহ অর্থ এ মদিনাই। এরপর তিনি সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাবধান! আমি কি এ কথাগুলো এর আগে তোমাদের বলিনি?" সাহাবায়ে কেরাম সমস্বরে বললেন, "হ্যাঁ! বলেছেন।"

রাসূল (সা.) আরও ইরশাদ করলেন, "তামিম আদ-দারির কথাগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে। যেহেতু তা আমার ওই বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আমি তোমাদের দাজ্জাল, মদিনা ও মক্কা সম্পর্কে এর আগে বলেছি।"

সেই দ্বীপটি কোথায়?

এরপর রাসূল (সা.) প্রশ্ন করলেন, "সে দ্বীপটি কোথায়?" অতঃপর তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, "জেনে রেখো! এই দ্বীপ সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়েমেন সাগরের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত, যা পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত।" এই সময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন।[১]

১. হাদীসটির প্রামাণিকতা ও একক সূত্রের প্রশ্ন

হাদীসটি সহীহ হিসেবে স্থান পেয়েছে, মুসলিম: ২/৪০৪-৪০৫; আবু দাউদ: ২/৫৯৪-৫৯৫ এমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হওয়ায় একে সাধারণভাবে সহীহ হাদীস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে, এতে শুধু একজন বর্ণনাকারী– ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর সূত্রে ঘটনাটি এসেছে।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে এমন গম্ভীর একটি ঘটনা বহু মানুষের কাছে পৌঁছার কথা। অথচ এর অন্যান্য সহীহ সনদ বা বর্ণনা পাওয়া যায় না। মজলিসে এত এত সাহাবী শুনেছেন বলা হয়েছে, তবে কেন আর কোনো সাহাবী (রা.) এই হাদীস বর্ণনা করলেন না? এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এর বর্ণনাকারী তো অসংখ্য থাকার কথা ছিল, তবে নেই। কেন নেই? আর কোনো সাহাবী কেন বর্ণনা করলেন না?

ইমাম নওবী, ইবনে হাজার আল আসকালানী এবং ইবনে খালদুন এ হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মানলেও, তাফসির ও ফিকহের ক্ষেত্রে একে একমাত্র প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার না করার সতর্কতা দিয়েছেন।

২. অন্যান্য সহীহ হাদীসের সঙ্গে বিরোধ

ক. দাজ্জালের আবির্ভাব ও বংশপরিচয়

সহীহ মুসলিম ও বুখারীতে স্পষ্টভাবে এসেছে– দাজ্জাল হবেন ইহুদী বংশোদ্ভূত, জন্ম নেবেন মানুষের মধ্য থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দাজ্জাল একজন তরুণ,

---

১. মুসলিম: ২/৪০৪-৪০৫; আবু দাউদ: ২/৫৯৪-৫৯৫; কিতাবুল ফিতান

কুৎসিত, একচোখা, তার কপালে 'ك ف ر' (কাফির) লেখা থাকবে, যা প্রতিটি মুমিন পড়তে পারবে।"[১]

→ অথচ তামিম আদ-দারির হাদীসে দেখা যায়, দাজ্জাল এক দ্বীপে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বহু বছর ধরে বেঁচে আছেন। প্রশ্ন আসে, পৃথিবীতে একজন মানুষ কীভাবে সহস্র বছর ধরে জীবিত থাকতে পারেন? আর এটা যদি বাতেনিই হতো, তাহলে কোরআনে ও সহীহ হাদীসে ইঙ্গিত পাওয়া যেত। বলা হতো, দাজ্জালকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। তথা, অমুক দ্বীপে বন্দী রাখা হয়েছে। কিন্তু তা কোথাও নেই! ধরে নিলাম একমুহূর্তে যে, এটা গায়েবের বিষয়! গায়েবের বিষয় হলে তামীম আদ-দারি (রা.) ও তাঁর সাথীরা কীভাবে দাজ্জালকে দেখলেন? গায়েবী হলে তো তাঁদের কাছেও অদৃশ্য থাকত! আর হাজার বছর পরেও আজও কেন এই দ্বীপের হদিস পাওয়া গেল না?

খ. দাজ্জালের কর্মকাণ্ড

অধিকাংশ সহীহ হাদীসে দাজ্জাল হবেন এক জীবন্ত, সচল, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি মানুষদের পরীক্ষা করবেন এবং নিজেকে ঈশ্বর দাবী করবেন। তবে, তামিম আদ-দারির বর্ণনায় দাজ্জাল একজন স্থীর, শিকলবদ্ধ বন্দী, যার নড়াচড়া নেই, সে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছেন। তার গায়ে কালো পশম দিয়ে ভরা, দেখতে দানব আকৃতির বিশালদেহী দানবের মতো।

গ. জাসসাসাহ: কী ছিল তার প্রকৃতি?

অন্যান্য হাদীসে 'জাসসাসাহ'-এর কোনো উল্লেখ নেই। এ হাদীসে এটা এক রহস্যময় প্রাণী, কারও মতে লোমশ নারীসদৃশ, আবার কারও মতে এটা এক প্রহরী দানব, যার কাজ দাজ্জালের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি।

→ হাদীস ব্যাখ্যাকারীরা বলেন, জাসসাসাহ ছিল হয়তো ইবলিস প্রেরিত একটি শয়তানী জীব বা দাজ্জালের প্রতীকী ভাষার অংশ। কিন্তু এর বাস্তবিকতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৪৫৮

৩. বর্ণনার উৎস্য ও পটভূমি

তামিম আদ-দারি (রা.) ছিলেন পূর্বে একজন খ্রিষ্টান নাসারী। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর দেখা বা শোনা একটি অভিজ্ঞতা শোনান। অনেকে মনে করেন, এটা একটি খ্রিষ্টান কল্প-কাহিনির পুস্তক বা গল্পকার অথবা ইহুদী-নাসারা গল্প থেকে উদ্ভূত, যার মধ্যে রয়েছে দ্বীপ, শিকলবদ্ধ শয়তান, শেষকালের প্রলয় ইত্যাদির মিশ্রণ।

মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান সাহিত্যে এমন গল্প বহু রয়েছে, যেখানে শয়তানকে এক দ্বীপে শিকলবদ্ধ রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে সে বিশ্বে ধ্বংস ডেকে আনবে। রূপকথার গল্পতে এমন অসংখ্য গল্প আমরা ছোট থাকতে পড়েছি ও শুনেছি। এইসব গল্পগুলো খ্রিষ্টান ও ইহুদী রূপকথা থেকে আগত।

→ ইবনে তায়মিয়্যা (রহ.) বলেন, "ইসলামের পরিপন্থী সংস্কৃতি ও উপকথা থেকেও কিছু বর্ণনা হাদীসের আবরণে ঢুকে পড়ে। যার সবগুলো যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয়নি। তাই প্রতিটি হাদীসকে কোরআন ও সুন্নাহর সমন্বিত আলোকে বিচার করতে হয়।" তথা অনেক বিশারদ স্বীকার করেছেন যে, সব হাদীস যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয়নি, এজন্য কিছু বর্ণনায় ঘাটতি আছে।

৪. আলিমদের মতামত—অতিরঞ্জন, রূপক না কি বাস্তবতা?

ইবনে কাসীর বলেন, এই হাদীসটি যদি সহীহও হয়, তবু এর ব্যাখ্যা রূপকভাবে নেওয়া উত্তম। কারণ; শিকলবদ্ধ দাজ্জাল মানে হতে পারে তার সময় এখনও আসেনি।

ইমাম নওবী বলেন, এটা এক সতর্কতামূলক বর্ণনা, কিন্তু বিশ্বাসের মৌলিক কাঠামো এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

ইবনে খালদুন বলেন, এই হাদীসটি হয়তো শ্রুতিগাথা বা পূর্ব-ইসলামী লোক-কাহিনির অবশিষ্টাংশ, যা পরবর্তীতে বর্ণনায় স্থান পেয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের শারীরিক বর্ণনা দিয়েছেন:

“তিনি বলেছেন, “সে হবে একজন যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। আমি তাকে আবদুল উজ্জা ইবনু কাতান-এর সাথে তুলনা করতে পারি।”[১]

এতে স্পষ্ট, রাসূল (সা.) তাকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কোনো অতিপ্রাকৃত প্রাণী বা জ্বিন নয়।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩১

৫. দাজ্জাল ইহুদী বংশোদ্ভূত হবে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"দাজ্জাল খোরাসানের ইহুদীদের মধ্য থেকে বের হবে এবং তার সঙ্গে হবে ৭০ হাজার ইহুদী সৈন্য, যাদের মুখে থাকবে মুকুট বা টুলির মতো (বিশেষ ইহুদী পোশাক)।"[১]
খোরাসান বর্তমান আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ার একটি অঞ্চল।

৬. তার অনুসারীরা হবে ইহুদী ও নারী-গরিষ্ঠ:

"সে এমন এক সময় আসবে, যখন অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদী, নারী ও বেদুঈন।"[২]

প্রশ্ন: তাহলে 'তামিম আদ-দারি (রা.)-এর হাদীসে' দাজ্জালকে দ্বীপে বন্দী বলা হলো কেন?

উত্তর: সে হাদীসটি একমাত্র তামিম আদ দারি (রা.)-এর কথায় বলা হয়েছে। আর বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) আর কেউ বলেনি। রাসূল (সা.) সাহাবাদের সামনে তা বর্ণনা করেন তামিম (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর।

কিন্তু এটা তাওয়াতুর (বহুবচনে বর্ণিত) নয়। অন্য সব সহীহ্ হাদীসে দাজ্জালের মানুষ রূপে জন্ম, বেড়ে ওঠা, শারীরিক গঠন, ও একচোখা হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। কিন্তু কোথাও তাকে দ্বীপে শিকলবদ্ধ বন্দী বলা হয়নি।

এজন্য অনেক হাদীস বিশারদ যেমন: ইমাম নববী, ইবনু হাজার আসকালানী এবং শাওকানী রহ. বলেন:

"এই হাদীসটি মুতাশাবিহ বা رمزى (রহস্যপূর্ণ)– এর ব্যাখ্যা প্রতীকধর্মী হতে পারে। তাই মূল সহীহ হাদীসগুলোর বিরুদ্ধে এ হাদীসকে নেওয়া যাবে না।"

দাজ্জাল দ্বীপে বন্দী, এটা হয়তো প্রতীক বা প্রাক-আভাস, কিন্তু মূল আকীদা হলো: দাজ্জাল একজন মানুষ, ইহুদী বংশোদ্ভূত, পৃথিবীতে চলবে, মানুষকে ফেতনায় ফেলবে এবং শেষে ঈসা (আ.) তাকে হত্যা করবেন। দাজ্জাল কোনো সভ্যতা বা প্রতীকও নয়। 'নব বিশ্ব সভ্যতা' ও 'প্রযুক্তি' হলো, দাজ্জালের বার্তাবাহক।

---

১. মুসলিম, হাদীস ৫২২৭; ইবনে মাজাহ ৪০৭৭
২. মুসনাদ আহমাদ ও মুসনাদ আবু ইয়ালা, সহীহ সনদে

৭. যুক্তিগত প্রশ্ন ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি

দাজ্জাল একজন মানবসন্তান, এটা প্রায় সর্বসম্মত। তবে, তামিম আদ-দারির হাদীসে তাকে দেখা যাচ্ছে অস্বাভাবিক আয়ু সম্পন্ন এক শৃঙ্খলিত সত্তা হিসেবে। যদি এতবড় ঘটনা তামিম আদ-দারি (রা.) একাই দেখে থাকেন, তাহলে তাঁর সাথীদের বয়ান এবং অন্য সাহাবারা কেন এটাকে সমর্থন করেননি অথবা সংরক্ষণ করেননি?

কেন রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে পূর্বে দাজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার পরও এই হাদীসটিকে পরে আবার বর্ণনা করলেন এবং তা নির্ভরযোগ্য মনে করলেন?

→ এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে অধিকাংশ আলেম বলেন, "শুধু সহীহ সূত্র নয়, বরং কনটেক্সটও বিচার্য।"

সতর্কতার সাথে গ্রহণযোগ্যতা ও অপব্যাখ্যা থেকে দূরত্ব

তামিম আদ-দারির (রা.) হাদীসটি সহীহ সনদযুক্ত হলেও এটা অন্যান্য হাদীসসমূহের সঙ্গে রচনাগতভাবে ভিন্ন এবং কিছু অংশ রূপক অথবা সীমিত তথ্যভিত্তিক হতে পারে।

তাই, আমরা এটাকে সম্পূর্ণ বাতিল করতে পারি না, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে এটা বর্ণনা করেছেন। একইসঙ্গে, এটা প্রতিটি দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসের মতো স্থির বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে না, কারণ এতে বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী তথ্য রয়েছে। অতিরঞ্জিত গল্পক তো আছেই, তারচেয়ে বড় কথা এই একটা হাদীস দাজ্জাল বিষয়ক সকল সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক! এই হাদীসকে গ্রহণ করলে অন্য সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য হিসাবে আবির্ভূত হবে। অর্থাৎ দাজ্জাল বিষয়ক সব হাদীস বাতিল হয়ে যাবে, এই হাদীস গ্রহণ করলে।

কারণ এই হাদীস অন্য সকল দাজ্জাল সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। এই হাদীস বাদে আর কোনো হাদীসে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

দাজ্জাল আসবে, মানুষদের পরীক্ষা করবে, মিথ্যা ঈশ্বরত্ব দাবী করবে, তার ফেতনা হবে ভয়ংকর। আমাদের প্রস্তুতি হবে– ঈমান, ইলম ও সৎ আমল। এখন রেখে আসা মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। তথা, পূর্বে রেখে আসা প্রযুক্তি জগতে আবারও প্রবেশ করা যাক।

ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, দাজ্জালের ফেতনা এবং বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত দাসত্ব– সবই কেয়ামতের পূর্বপ্রস্তুতির অংশ। ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এখন ইতিহাস নয়, ঘটমান বাস্তবতা। আজকের এআই, ডিজিটাল কারেন্সি ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার– সবকিছু যেন এক অদৃশ্য চিপযুক্ত পৃথিবীর দিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে স্বাধীন চিন্তা থাকবে না, থাকবে শুধু প্রোগ্রামড আনুগত্য। আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ও প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে হেফাজত করুন। "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দাজ্জাল।" (আমীন।)

মেটাভার্স, হিউম্যান ডিজাইনিং ও আত্মার বিলুপ্তির সংকট

ইতিহাসের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর যুগের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মানবতা। বাহ্যিক প্রযুক্তির দিক থেকে আমরা যতই উন্নত হচ্ছি, ততই অন্তর্গত আত্মিক পরিচয় হারিয়ে ফেলছি। এই প্রেক্ষাপটে, কোরআনের 'روح (রূহ্)' ধারণা, আধুনিক মেটাভার্স, ট্রান্সহিউম্যানিজম এবং হিউম্যান ডিজাইনিং প্রযুক্তি একটি অদ্ভুত দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা তৈরি করছে। যার শেষ পরিণতি হতে পারে আত্মাহীন দেহ, নিয়ন্ত্রিত মানবতা এবং আসন্ন মানব দাজ্জালের সাম্রাজ্য।

১. আত্মা (রূহ্) কী? কোরআনিক ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ বলেন:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"তারা আপনাকে আত্মা (রূহ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে? আপনি বলুন, আত্ম আমার প্রতিপালকের এক আদেশ মাত্র। আর এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।"[১]

আত্মা মানব অস্তিত্বের অদৃশ্য, অলৌকিক ও ঈশ্বরীয় উপাদান। কিন্তু আজকের প্রযুক্তিবিশ্ব আত্মাকে অস্বীকার করে, শুধু বায়োলজিক্যাল বডি ও নিউরাল এক্টিভিটি কেই 'মানবতা' ভাবতে শেখায়। এটাই আত্মাহীন হিউম্যান ডিজাইনিং-এর মূল দর্শন।

২. হিউম্যান ডিজাইনিং: মানুষকে নতুন করে বানানোর অভিযান

বর্তমানে যে প্রযুক্তি আমাদের শরীর ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তার নাম: CRISPR Gene Editing– জিন পরিবর্তন করে 'নতুন মানুষ' তৈরি। Neuralink– মস্তিষ্কে চিপ বসিয়ে চিন্তা পাঠ ও নিয়ন্ত্রণ। Human-AI Hybrid Model– মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণ।

---

১. সূরা ইসরা, আয়াত ৮৫

এইসব প্রযুক্তির লক্ষ্য: রোগ প্রতিরোধ নয়, এটা মানুষকে 'ইমার্টাল' (অমর) বানানো (এআই মানব)। মানুষকে বায়ো-প্রোডাক্ট বা ডেটা ইউনিট হিসেবে রূপান্তর করা। আত্মা নয়, ডিজিটাল আইডেন্টিটি ও কনসাসনেস ট্রান্সফার-এর মাধ্যমে বেঁচে থাকা।

এই মনোভাব কেবল আল্লাহর সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, বলা যায় আদম (আ.)-এর সামনে সিজদা না করার ইবলিসি অহংকারের আধুনিক রূপ।

৩. মেটাভার্স: বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক মিথ্যা জান্নাত

Metaverse হলো এমন এক ভার্চুয়াল পৃথিবী, যেখানে বাস্তব জীবন নয়, ডিজিটাল জীবনই 'মূল জীবন'। একজন মানুষ তার 'ডিজিটাল অবতার' হয়ে বাঁচে। একক রাষ্ট্র, একক মুদ্রা, একক বিশ্বাস-ব্যবস্থা– সবই নিয়ন্ত্রিত হয় এক সফটওয়্যার কোডের মাধ্যমে।

রাসূল ﷺ এর সেই বাণী: "দাজ্জালের জান্নাত হবে আসলে আগুন, আর আগুন হবে আসলে জান্নাত।"[১]

Metaverse বা ডিজিটাল জগতে দাজ্জালের 'জান্নাত', যেখানে মানুষ পাবে আরাম, আকর্ষণ, বিনোদন। কিন্তু হারাবে আত্মা, চেতনা এবং ইবাদতের বাস্তবতা। দাজ্জালের আগমনের আগেই দাজ্জালের দাসেরা এসবের অনেককিছু ইতোমধ্যে ঘটিয়ে ফেলেছে ও ঘটাচ্ছে এবং ঘটাবে। আচ্ছা একটু দেখুন তো– প্রযুক্তির বাইরে আমরা কে আছি? আমাদের সকল তথ্য তাদের হাতে। আমাদের সকল তথ্য ওরা জানে, কারণ আমরা জানিয়েছি। কী খেতে পছন্দ করি, কী পোশাক পরতে, কী বই পড়তে, কী করতে ইত্যাদি সকল পছন্দ-অপছন্দের সবকিছু তারা জানে।
আমাদের সকল পছন্দ-অপছন্দের তথ্য তাদের কাছে সংগৃহীত। আমাদের মতবাদ, আদর্শ, চেতনা, পরিকল্পনা ইত্যাদি সকল কিছুর তথ্য তাদের কাছে। তারা সেই মতে সবকিছু আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। আমরা মনে করি– আমরাই এসব নিয়ন্ত্রণ করি, আসলে তা কখনোই নয়! বরঞ্চ তারাই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই আমাদের পরিচালিত করে। তাদের মতের বিরুদ্ধে কিছু বললেই, তাদের সেখান থেকে সেই মতবাদ মুছে দেওয়া হয়। আবার নিষিদ্ধও করা হয়। এই হলো তথাকথিত স্বাধীনতা।

---

১. সহীহ বুখারী

দাজ্জাল সেই তথ্য নিয়ন্ত্রক হবে, তার অনুসারীও হবে প্রচুর। সেই ব্যবস্থা হয়ে এসেছে, আরও করা হচ্ছে। কীভাবে? চলুন এবার তা জানা যাক।

৪. আত্মার বিলুপ্তি ও মানুষ-দেহের উপর সর্বগ্রাসী দখল:

এই যুগে মানুষকে শেখানো হচ্ছে: তুমি কেবল স্নায়ু, জিন এবং নিউরন। তুমি যে অনুভব করো, তা শুধু ডোপামিন ও নিউরো-সিগনাল। আল্লাহ, আখিরাত, আত্মা– সব অলীক ধারণা।

এভাবে মানুষ থেকে ধীরে ধীরে 'রূহানিয়াত' মুছে ফেলা হচ্ছে। মানুষ কেবল একটি প্রোগ্রামড, ডেটা-ড্রিভেন রোবট হয়ে উঠছে। এই দেহকেন্দ্রিক সভ্যতা দাজ্জালের সম্রাজ্যের বীজ।

৫. আত্মার বিপরীতে দাঁড়ানো প্রযুক্তিবিশ্ব- কোরআনের আলোকে প্রতিরোধের পথ

কোরআন শিক্ষা দেয়

১. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে...।"[১]

২. সূরা হুজুরাত-এর ১৩ নম্বর আয়াতের মূল কথা হলো মানুষের মর্যাদা– তার চিন্তা, আত্মা, ঈমান ও তাওয়াক্কুলে।

৩. সূরা আ'রাফ-এর ১৭৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "....তারা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তারা তার চেয়েও অধম।" অর্থাৎ আত্মার উৎকর্ষই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে। এটা বিরাট আয়াত, সবগুলো তুলে না ধরে শুধু মূল কথাটা উদ্বৃতি করলাম।

আমরা যদি আত্মার স্বরূপ ও প্রযুক্তির বিপরীতমুখী সত্য বুঝতে না পারি, তবে আমরা হব সেই ইয়াজুজ-মাজুজ বা দাজ্জালীয় সভ্যতার অংশ, যাদের হৃদয় থাকবে না, থাকবে শুধু প্রোগ্রাম্ড বুদ্ধি।

---

১. সূরা ত্বীন,আয়াত ৪

ইলুমিনাতি, কাব্বালা ও আত্মাহীন সমাজের পূর্বাভাস: ইসরায়েলী নিয়ন্ত্রিত বিশ্বপ্রকল্প

১. কাব্বালাহ: ইহুদী জাদুবিদ্যা ও আত্মাহীন বস্তুনিষ্ঠতা

কাব্বালাহ্ হলো ইহুদী ধর্মের গোপন তন্ত্রশাস্ত্র, যার মূলমন্ত্রই হলো "দেহের মাধ্যমে ঈশ্বরত্বে পৌঁছানো"। এই দর্শন বিশ্বাস করে–

মানুষ নিজেই ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি নয়, মানুষ নিজেই 'ঈশ্বরত্ব' অর্জন করতে পারে। আত্মা নয়, সৃষ্টি ও শক্তির রহস্য ফোঁক দিয়ে আয়ত্ত করা যায় (Magic, Numerology, Sefirot Tree)।

এই কাব্বালিস্টিক চিন্তাধারাই পরবর্তীতে প্রভাবিত করেছে: ইলুমিনাতি ও ফ্রিম্যাসনদের গোপন দর্শন, দেহকেন্দ্রিক Luciferian Humanism, এবং আধুনিক Mind-Control Technology (Project MK Ultra, DARPA brain projects).

২. ইলুমিনাতি ও আত্মা নির্মূলের বৈশ্বিক কৌশল

১৮ শতকে Adam Weishaupt গঠন করেন The Bavarian Illuminati নামক এক গুপ্ত সংগঠন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল: ধর্ম ও নৈতিকতা বিলুপ্ত করে বিশ্বব্যাপী একটি সেক্যুলার চেতনা কায়েম করা। আত্মা, পরকাল, ঈশ্বর– এই ধারণাগুলোকে 'গল্প' হিসেবে তুলে ধরা। মানুষকে এমনভাবে ডিজাইন করা, যাতে সে বিনোদন, ভোগ, কৃত্রিম জীবনেই বিভোর থাকে।

এদের কিছু কর্মপদ্ধতি ছিল: মিডিয়া, চলচ্চিত্র, সংগীত, ফ্যাশন, খেলাধুলা– সবকিছুর মাধ্যমে 'Occult Symbols' প্রচার করা। আত্মিকতা নয়, ইন্দ্রিয়-তাড়নার উপর সমাজ গঠন করা। পরিবারব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন, একাকী ও প্রোগ্রামযোগ্য করে তোলা।

এটাই আধুনিক 'আত্মাহীন সমাজের ভিত্তি'– যেখানে কেউ ভাবে না কেন সে বাঁচছে, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে?

৩. ইসরায়েল: আত্মাবিহীন বিশ্বব্যবস্থার স্থপতি

আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে সংগঠিত, প্রযুক্তিনির্ভর, অথচ ধর্ম ও আত্মার মুখোশধারী শাসন কাঠামোর নেতৃত্বে রয়েছে ইসরায়েল।

এর লক্ষণীয় দিকগুলো হলো: Jerusalem Centered Technocratic Empire– পুরো পৃথিবীর ডেটা, ডিভাইস, AI ও Surveillance যেন এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়: ইসরায়েল।

Project Pegasus, NSO Group, Unit ৮২০০– এগুলো হচ্ছে আত্মার ওপর নজরদারির প্রযুক্তিগত মাধ্যম (আমার ও আপনার চিন্তাও তাদের জানা)।

Temple Mount Project– যেখানে তৃতীয় মন্দির গঠনের মাধ্যমে এক বিশ্ব-সরকার, বিশ্বধর্ম ও বিশ্ব-মানদণ্ড কায়েম করা হবে, যার নেতৃত্ব দেবে দাজ্জাল।

এখানেই প্রশ্ন জাগ্রত হয়, ইসরায়েল আত্মাহীন সমাজের নেতৃত্বে কেন?

কারণ; ইসরায়েলের কাব্বালিস্ট নেতৃত্ব বিশ্বাস করে, মানুষের আত্মা নয়, "আলোর বস্তুভিত্তিক শক্তি"-কে নিয়ন্ত্রণ করলেই ঈশ্বরত্বে পৌঁছানো যায়। আর এই আধিপত্যের যন্ত্র হলো–

- এআই।
- জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং।
- ন্যানো টেকনোলজি।
- মাইন্ড কন্ট্রোল।
- এবং মেটাভার্সিক অচিন্ত্য জগৎ।

৪. ভবিষ্যতের আত্মাহীন সভ্যতা: কোরআনের সতর্কবাণী

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে করেছেন আত্মভোলা। এরা পাপাচারী লোক।"[১]

---

১. সূরা হাশর,আয়াত ১৯

আজকের ইহুদী নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা মানুষকে আত্মার কথা ভুলিয়ে দিচ্ছে। তার বদলে দিয়েছে–

- তাড়না।
- যৌনতা।
- প্রযুক্তির নেশা।
- নিজেকে 'ঈশ্বর: ভাবার অহংকার!

এই সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে Luciferian Logic-এর ওপর, যেখানে আত্মা অবাঞ্ছিত, আর দেহই ঈশ্বরের আঁধার।

৫. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: সিংহাসনে বসবে দাজ্জাল, আর হবে একমাত্র আইন

UN ও WHO– নীতিনির্ধারক সংস্থা হয়ে উঠছে গুপ্ত সংঘ প্রভাবিত সিদ্ধান্তের বাহক। One World Digital ID, CBDC (Central Bank Digital Currency), UN SDG Goals– এগুলো মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণের আধুনিক চাবিকাঠি। AI-Powered Judgment System– যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়ে উঠবে মানুষ ও সমাজের বিচারক।

তখন মানবতার আত্মা থাকবে না, থাকবে শুধু 'code of behavior'– যার উৎস হবে ইসরায়েল ও গুপ্ত সংঘের প্রযুক্তিভিত্তিক ধর্ম।

আত্মার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আত্মার সংগ্রাম

আত্মাকে বাঁচাতে হলে ফেরত যেতে হবে কোরআনের কাছে। আত্মিক জ্ঞান ও দার্শনিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। দাজ্জালের ফেতনা বুঝতে হবে এবং কাহাফের আশ্রয় নিতে হবে।

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শুরু ১০ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবে।"[১]

আত্মার বিপক্ষে দাঁড়ানো এই শক্তি কোনো চিপ বা অস্ত্র দিয়ে ঠেকানো যাবে না, কেবল ঈমান ও আত্মিক জ্ঞানের আলোয় সেটা সম্ভব।

১ সহীহ মুসলিম

দাজ্জালের ত্রিমাত্রিক বিশ্বভাষা: সেমিটিক কৌশল, প্রতীকি ভাষা ও কাব্বালার সাংকেতিক কোডিং:

১. কোরআনভিত্তিক সতর্কবার্তা—শব্দ নয়, উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুখ্য:

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, পূর্নাঙ্গ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর বিষয়ে বিবাদ (বিতর্ক) করে এবং কোনো পথপ্রদর্শক, কোনো স্পষ্ট গ্রন্থ ছাড়াই শয়তানের অনুসরণ করে"।[১]

আধুনিক বিশ্ববক্তৃতা শুধু তথ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ধারণা নির্মাণে পারদর্শী। সত্য ও মিথ্যার ব্যবধান মুছে দিতে যা ব্যবহার করা হয়, তা একধরনের সাংকেতিক ভাষা ও ভাবপরিসর– যার প্রতি বারংবার কোরআন আমাদের সচেতন করে।

২. কাব্বালার গাণিতিক ও প্রতীকি ভাষা— বাক্য নয়, সংখ্যা-চিহ্নই বার্তা

ইহুদী কাব্বালাহ একটি রহস্যঘেরা গাণিতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন। এদের বিশ্বাস: আলফাবেট ও সংখ্যার মধ্যে এক অলৌকিক সংযোগ আছে। প্রতিটি হিব্রু বর্ণ একইসঙ্গে ধ্বনি, সংখ্যা ও শক্তি নির্দেশ করে।

এখানেই আসে Gematria– হিব্রু বর্ণের সংখ্যা-মান বিশ্লেষণ করে বস্তুর গূঢ় পরিচয় উদ্‌ঘাটনের তত্ত্ব।

উদাহরণ:

- YHWH (ঈশ্বর) = ২৬
- Mashiakh (মসীহ) = ৩৫৮
- Nachash (সাপ) = ৩৫৮ (ইহুদী ব্যাখ্যায় মসীহ ও সাপ এক প্রতীক–বিরোধী ঈশ্বরত্বের সূচনা)

১. সূরা আল-হজ,আয়াত ৩

অর্থাৎ, YHWH (**יהוה**)-**এর সংখ্যা-মান হলো**– Y (১০) + H (৫) + W (৬) + H (৫) = ২৬.

Mashiakh (**משיח**)-**এর সংখ্যা-মান হলো**– M (৪০) + SH (৩০০) + Y (১০) + KH (৮) = ৩৫৮.

Nachash (**נחש**)-**এর সংখ্যা-মান হলো**– N (৫০) + KH (৮) + SH (৩০০) = ৩৫৮.

মসীহ ও সাপের প্রতীক: ইহুদী কাব্বালার কিছু ব্যাখ্যায় মসীহ এবং সাপের সংখ্যা-মান এক হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আছে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে, মসীহ (ত্রাণকর্তা) এবং সাপ (শয়তান/প্রলোভন) উভয়েরই মানবজাতির ভাগ্য পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, যদিও তাদের উদ্দেশ্য বিপরীত।

এই সাংকেতিক বিশ্লেষণই পরবর্তীতে রূপ নেয় ইলুমিনাতি-ফ্রিম্যাসনের প্রতীকি ভাষায়– যেখানে সংখ্যা, ত্রিভুজ, চোখ, জ্যামিতিক নির্মাণ সবই হয়ে ওঠে শক্তির সংকেত।

৩. আধুনিক প্রতীকি ভাষা—AI, লোগো, কোড ও মেটাভার্স

বর্তমান বিশ্বে এই প্রতীকি ভাষা নতুন রূপে আবির্ভূত। কোম্পানির লোগো– ত্রিভুজ, চোখ, জ্যামিতিক নকশা। ডিজিটাল কোড– ০ ও ১ এর মধ্যেই 'মেসেজ' লুকানো। AI ভাষা– অনুভূতিহীন, আত্মাহীন অথচ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী। মেটাভার্স ভাষা– বাস্তবকে ভুলিয়ে দেওয়া *জড়-বাহিত বাস্তবতা।*

ফেসবুকের 'মেটা' লোগো একটি ঝুঁকে পড়া ∞ ইনফিনিটি চিহ্ন, যা কাব্বালার Ein Sof ধারণার প্রতিরূপ— সীমাহীন ঈশ্বরত্বে মানুষকে প্রবেশ করানো।

তবে ফেসবুকের মতে, এই লোগোটি মেটাভার্সের ধারণা। অর্থাৎ সীমাহীন ও সংযুক্ত ভার্চুয়াল জগৎ ফুটিয়ে তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছে। তথা তাদের মতে, কাব্বালার 'আইন সফ' (Ein Sof) ধারণার সাথে এর কোনো সরাসরি বা প্রমাণিত সম্পর্ক নেই। 'আইন সফ' মানে 'অন্তহীন', যা মূলত ঈশ্বরের অসীমতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আপনি 'সীমাহীন' বলুন আর 'অন্তহীন' বলুন– অর্থ একই দাঁড়াল।

শুনতে বা পড়তে হাস্যকর লাগতেই পারে। আপনি হাসুন প্রানখুলে। মাদকাসক্ত কথাবার্তা হিসেবে ভাবতেই পারেন। সেই ভাবনার স্বাধীনতা আপনার আছে। সবকিছু বিশ্বাস করতেই হবে, এর কোনো মানে নেই। তবে, আপনি ফেসবুকে

ফিলিস্তিনের পক্ষে লিখুন, আফগানিস্তানের বিজয়গাথা লিখুন, ন্যাটো, আমেরিকা, ইসরায়েলের নিন্দা করুন। দেখুন তো– আপনার সেই লেখা পোস্ট থাকে কি না? আপনি তথাকথিত জঙ্গিবাদ তত্ত্ব তথা ইসলামের সপক্ষে লিখে এসবকে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র বলে লেখা লিখুন। নাইন-ইলেভেনকে আমেরিকা, সিআইএ ও তাদের গোত্রের ষড়যন্ত্র হিসেবে লিখুন, আইএস-কে তাদের ছায়া সংগঠন বলে লিখুন– আপনার পোস্ট থাকা তো বহুদূরের কথা, আপনার আইডিটাও বিলুপ্ত করে দেবে। এর সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী আমি নিজে। একযুগ ধরে যারা আমার লেখা ফেসবুকে পড়েন, তারা এ বিষয়ে অবগত আছেন। বৃহৎ ফলোয়ার্সের ফেসবুক আইডি এইতো ২০১৮ সালে বিলুপ্ত করে দিল। অপরাধ ছিল, 'সিআইএ' এবং তথাকথিত জঙ্গিবাদ নিয়ে লেখা। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে আমি ওইসময় বেশি লিখতাম, দেশীয় রাজনীতি নিয়ে খুবই কম। আইডি হারানো নিয়ে কোনো কষ্ট নেই, কষ্ট ছিল– অনুসন্ধানী কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা হারিয়ে ফেলার জন্য। এ বিষয়ে আর কিছু বলব না, এখন চিন্তা আপনার– আপনি এই তত্ত্ব কীভাবে গ্রহণ করবেন?

৪. সেমিটিক ভাষার ভিতর লুকানো আখ্যান- দাজ্জালের ভাষাগত কাঠামো

ইংরেজি ভাষার উপর হিব্রু ও গ্রিক ভাষার প্রাচীন প্রভাব আজকের 'মেসেজ কোডিং'-এর ভিতর সুস্পষ্ট:

- Alphabet ⟶ Alpha + Beta (গ্রিক)
- God ⟶ Gad ⟶ El (প্রাচীন জার্মানিক)
- Angel ⟶ El ⟶ Elohimic being
- Israel ⟶ Is-Ra-El (Isis + Ra + El)

অর্থাৎ, ইংরেজি বর্ণমালার নাম এসেছে গ্রিক বর্ণমালার প্রথম দুটি অক্ষর 'Alpha' (A) এবং 'Beta' (B) থেকে। এটা ভাষার একটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ব্যুৎপত্তি।

God ⟶ Gad ⟶ El (হিব্রু): 'God' শব্দটি মূলত জার্মানিক ভাষার প্রাচীন শব্দ 'gudana' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'যা আহ্বান করা হয়'। যদিও এর সঙ্গে হিব্রু ভাষার 'Gad' বা 'El' শব্দের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। তবে, কিছু তাত্ত্বিকরা বলেছেন, 'El' (এল) হিব্রু ভাষায় 'ঈশ্বর' বা 'শক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'Israel' বা 'Michael' শব্দে।

Angel ⟶ El ⟶ Elohimic being: 'Angel' শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষার 'angelos' থেকে, যার অর্থ 'বার্তাবাহক'। এর সঙ্গে হিব্রু 'El' বা 'Elohim'

(ঈশ্বর) শব্দের সরাসরি ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক নেই। তবে, ইসলাম, খ্রিষ্টান, ও ইহুদী ধর্মে ফেরেশতাদের (Angels) 'বার্তাবাহক' হিসেবে দেখা হয় এবং তাদের নামের শেষে 'El' প্রায়ই যুক্ত হয় (যেমন: Gabriel, Michael), যা ঐশ্বরিক সত্তার (Elohimic being) সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্দেশ করে। তাই এটা ব্যুৎপত্তিগতভাবে সঠিক না হলেও, ধর্মতাত্ত্বিকভাবে একটা সম্পর্ক আছে।

Israel ⟶ Is-Ra-El (Isis + Ra + El): 'Israel' শব্দের অর্থ হলো 'ঈশ্বরের বান্দা'। এটা বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নবী ইয়াকুব (আ.)-এর আরেকটি নাম ছিল।

এই নামগুলো শুধু উচ্চারণ নয়, মানসিক গঠন গড়ার উপকরণ। দাজ্জাল যে 'আধিভৌতিক চিন্তাধারার এক নতুন ভাষা' তৈরি করবে এ কথা বহু স্কলার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৫. একবিংশ শতাব্দীর ভাষাতাত্ত্বিক যুদ্ধ— কে ভাষা নিয়ন্ত্রণ করবে, সে-ই নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষকে?

"Language is not just a tool of communication, it's a tool of domination." -Noam Chomsky

আজকের বিশ্বযুদ্ধে:

- Narrative = যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র।
- Symbolism = ক্ষমতার মূল ব্যাকরণ।
- AI Language Models = 'ভবিষ্যতের ওহী' প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া।

যখন কোরআনের শব্দকে হেয় করে বলা হয়, "সেকেলে শব্দভাণ্ডার," তখন পর্দার অন্তরালে তৈরি হচ্ছে এক আধুনিক ও গোপন ভাষা, যা দাজ্জালের প্রবেশপথ তৈরির সহায়ক।

৬. কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক প্রতিরোধ- সোজাসাপ্টা ভাষা, সরল চিন্তা, সংবেদনশীল হৃদয়:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করিও না...।"[১]

---

১. সূরা ইসরা, আয়াত ৩৬

অর্থাৎ, ভাষা ও প্রতীকের মধ্যে সৃষ্ট বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলো বোঝা। সারল্যকে রক্ষা করা, কারণ দাজ্জালের ভাষা হবে ধাঁধাময় ও প্রতারণাপূর্ণ। আত্মার ভাষা– দোয়া, জিকির, কোরআন, সিজদাহ্। এইগুলো পুনর্জাগরণ।

যুদ্ধ শব্দের নয়, ভাবের— যুদ্ধ উচ্চারণের নয়, চেতনার:

এই নতুন দুনিয়ায় যে কথা বলবে, সে শাসন করবে, কিন্তু যে জানবে কী বলা উচিত, সে রক্ষা পাবে। দাজ্জাল আসবে ভাষার বিভ্রমে, প্রতীকের মায়ায়, সংখ্যার জাদুতে। প্রতিরোধ কেবল সম্ভব, যদি আমাদের কাছে থাকে– কোরআনের সত্তাভিত্তিক ভাষা, রাসূলের সংবেদনশীল মুখবন্ধ, এবং আত্মার শুদ্ধ দৃষ্টি।

জাদু কী আসলেই আছে? আসলে এসবের পেছনে কারা? তারা সবসময় সামনে থাকে না, কিন্তু প্রতিটি ঘটনায় তাদের ছায়া পড়ে। তারা কোনো একটি দেশ বা দলের প্রতিনিধিত্ব করে না, তারা ইতিহাসের ধারাকে আড়াল থেকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম এক শক্তি। এরা কারা?

প্রথম অংশে অসংখ্যবার রথচাইল্ড পরিবারের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের এককভাবে পৃথিবীর ৫০০ ট্রিলিয়ন ডলারের মালিকানা, যেটা দিয়ে বিশ্বের ৬০০ কোটির বেশি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তারা তা করেনি। কেন করেনি? কারণ তারা 'মানুষ' শব্দটি পড়ার আগে 'জনসংখ্যা' শব্দটি দেখে। তারা জনসংখ্যাকে বোঝে একটি পরিসংখ্যান হিসেবে, যেখানে ৩০০ কোটি মানুষ কমে গেলে নাকি পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

এ ধারণার পেছনে আছে এক পুরনো পরিকল্পনা– ডিপপুলেশন এজেন্ডা। এই পরিবার কোনো সময় 'রাজা' হয়নি, 'রাষ্ট্রপতি' হয়নি। কিন্তু তাদের ব্যাংক থেকেই যুদ্ধের অর্থ এসেছে, আর তাদের ঘোষণাপত্র থেকেই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধ, হিরোশিমা-নাগাসাকি, ভিয়েতনাম, আফ্রিকা, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়েমান, ফিলিস্তিন ইত্যাদি– সবখানে আপনি এক রহস্যময় প্রভাব খুঁজে পাবেন। তারা নিজের দেশের মানুষকেও ছাড় দেয়নি। নিজেদের ওপরও চালিয়েছে অর্থনৈতিক ও মানসিক পরীক্ষা। পারস্পরিক আত্মীয়বিয়ের মাধ্যমে এমন শিশুদের জন্ম দিয়েছে, যারা ছিল গবেষণার বিষয়। কারণ তারা কেবল অর্থলোভী নয়, তারা নিয়ন্ত্রণপ্রিয়। এবং তারা ভয়াবহভাবে নিষ্ঠুর।

তাদের হাতে গড়া মিডিয়া আমাদের চোখে সত্য মিশিয়ে মিথ্যা ঢুকিয়ে দেয়। যেটা গল্প মনে হয়, আসলে সেটাই বাস্তবের নীলনকশা।

আপনি ভাবছেন, এতটা গভীর পরিকল্পনা কীভাবে সম্ভব? সবাই হয়তো-বা এই কথাগুলো বিশ্বাস করবেন না! কিন্তু একটু গভীরভাবে, একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকালেই দেখা যায়– সকল অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ আর মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের পেছনে কাজ করছে একই কিছু নাম, একই কিছু প্রতিষ্ঠান, একই কিছু পারিবারিক নেটওয়ার্ক।

এরা কারা? এরা এমনই একটি কর্পোরেশন– 'দ্য ক্রাউন কর্পোরেশন'– যা রাষ্ট্রের উপর রাষ্ট্র, প্রেসিডেন্টের উপর প্রেসিডেন্ট। তারা আমেরিকার নির্বাচন নির্ধারণ করে এক দশক আগেই। মিডিয়া, সিনেমা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এমনকি মানবাধিকার কমিশনের অর্থও আসে তাদের তহবিল থেকে।

যদি ভাবে যে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান একে অপরের বিপরীত, তাহলে সে নাটক দেখছে, কিন্তু নাট্যকারকে চিনতে পারেনি। আমেরিকাতে প্রেসিডেন্টের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, কে তাকে বসালো?

এই সমস্ত আয়োজনের পেছনে এক ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। এক মহাযাত্রা, যা শুরু হয়েছিল আব্রাহাম নামক এক মানুষের সময় থেকে। ইজিপ্ট থেকে জেরুজালেম, জেরুজালেম থেকে রোম, রোম থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক। ইতিহাসের প্রতিটি মোড় ঘুরেছে কিছু বিশেষ নাম ও পরিবারের হাতে।

তাদের কিছু ইতিহাস ঢুকে পড়েছে সিনেমায়। ম্যাট্রিক্স, দ্য হবিট, লর্ড অফ দ্য রিংস ইত্যাদি এ সবকিছু গল্প মনে হয়, কারণ তারা আমাদের বাস্তবকে এমনভাবে বিকৃত করে দেখায় যেন সত্যটা হয়ে ওঠে অলীক। কিন্তু, আমরা যদি অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি পর্যবেক্ষণ করি ছড়িয়ে থাকা গোপন পাতায়, তাহলে আমরা এর আভিধানিক অর্থ বুঝব। তখন আর এসব নিছক ফিকশন মনে হবে না।

একজন ফ্রিমেসন, এক আংটির রহস্য দেখে যিনি চার বছর ধরে খুঁজে গেছেন সত্য। সেই তথ্যচিত্রে তিনি জানান কীভাবে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা, ধর্ম, যুদ্ধ, ইসলাম, সন্ত্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সবকিছুর মধ্যে আছে এক সুসংহত যোগাযোগ। কীভাবে এক শতাব্দী ধরে তৈরি হয়েছে একক শাসনের পথ। কীভাবে 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার' কেবল একটি ষড়যন্ত্র নয়– একটি দৃষ্টি, যা বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে।

তিন নগররাষ্ট্র এবং ব্যাবিলনের আত্মা

তিনটি নগররাষ্ট্র, তিনটি ভিন্ন রাষ্ট্রে, কিন্তু এক কর্পোরেশন।

'দ্য ক্রাউন কর্পোরেশন'– নামটি শুনলেই মনে হতে পারে রাজকীয় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা। কিন্তু বাস্তবে এটা বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময়, ছায়াময় এবং নিয়ন্ত্রণকারী একটি কর্পোরেশন, যা পরিচালনা করে তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র: ১. ভ্যাটিকান সিটি (ইতালি)– ধর্মের শাসন। ২. সিটি অফ লন্ডন (যুক্তরাজ্য)– ব্যাংকিং ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। ৩. ওয়াশিংটন ডিসি / সিটি অফ কলম্বিয়া (যুক্তরাষ্ট্র)– সামরিক ও রাজনৈতিক শাসনের কারখানা।

তিনটিই স্বাধীন, নিজ নিজ দেশের আইনের বাইরে। তিনটিই কর ছাড়াই বিশাল অর্থ জোগাড় করে। তিনটিই একে অপরের সাথে চুক্তিবদ্ধ। তিনটিই নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর যুদ্ধ, ঋণ, ধর্ম, আইন এবং জনগণের মস্তিষ্ক।

সিটি অফ ভ্যাটিকান

জনসংখ্যা হাতেগোনা হলেও পোপের হাতে আছে হাজার বছরের ধর্মীয় কর্তৃত্ব, মধ্যযুগের সম্পদ এবং গোপন দলিলাদির বিশাল আর্কাইভ। বাইবেল, ইনকুইজিশন, ক্রুসেড– সব ইতিহাস এখানেই গেথে আছে।

সিটি অফ লন্ডন

একটা ছোট্ট এলাকাতেই কনসেনট্রেটেড বিশ্বের ব্যাংকিং সিস্টেম। রথচাইল্ডদের ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের প্রধান কান্ডারীরা এখানেই বসে সুদ, ঋণ, যুদ্ধ, উন্নয়ন– সবকিছুর অর্থনৈতিক দিকনির্দেশ দেয়।

সিটি অফ কলম্বিয়া

এটাই সবচেয়ে গোপন। কিছু আমেরিকান সম্ভবত জানেই না যে, তাদের নগরের ভেতরেই আরেকটি 'রাষ্ট্র' আছে। এখানেই আছে ফেডারেল রিজার্ভ, যা কি না

আসলে আমেরিকান জনগণের প্রতিষ্ঠান নয়, একটি প্রাইভেট ব্যাংক, যারা ডলার নিয়ন্ত্রণ করে, জনগণের ট্যাক্স কালেক্ট করে এবং আবার সেই টাকাই সরকারকে ধার দেয় চড়া সুদে।

একটা দেশের টাকা, আরেক রাষ্ট্র ছাপে? একটা দেশের সেনা, আরেক রাষ্ট্র চালায়? অবিশ্বাস্য লাগলেও এটাই সত্য। অনেকেই এখন ভেবে নিয়েছেন, এসব পাগলের প্রলাপ কোথা থেকে আনলাম? ফেডারেল রিজার্ভ, ওয়াশিংটন ডিসি, ডলার ছাপানো। এসব বিষয় নিয়ে আমরা কেউ কেউ এর আগে যেভাবে জানতাম বা জানি, তা এই পর্যায়ে সংক্ষেপে তুলে ধরছি:

গতানুগতিক ইতিহাসের পাতায় ও তাদের ধ্বজাধারী তথ্যে তারা এভাবে বলে– যুক্তরাষ্ট্রের কাগজ মুদ্রা (Paper Currency) ছাপে: Bureau of Engraving and Printing (BEP) এটা U.S. Department of the Treasury-এর অধীন একটি বিভাগ।

অন্যদিকে মুদ্রা (Coins) তৈরি করে: United States Mint, এটাও Treasury-এর অধীন কিন্তু আলাদা সংস্থা। BEP ছাপে ডলার নোট, যেমন: $১, $৫, $১০, $২০, $৫০ এবং $১০০. U.S. Mint ছাপে কয়েন, যেমন: ১ cent, ৫ cent, ১০ cent, ২৫ cent, ৫০ cent এবং $১ কয়েন।

Federal Reserve Board প্রতিবছর হিসাব করে নির্ধারণ করে, ঠিক কত নতুন কাগজ নোট বাজারে ছাড়া হবে। এটা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের ওপর:

- বাজারে অর্থের চাহিদা।
- পুরাতন নোট বাতিল (destroyed/replaced)।
- লেনদেনের পরিমাণ ও গতি।
- জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

২০২৩ অর্থবছরে (Fiscal Year ২০২৩), যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন কাগজ নোট ছাপা হয়েছিল, যার মোট মূল্য ছিল $২৩২ বিলিয়ন ডলার-এর বেশি। সর্বাধিক ছাপা হয়েছিল $১, $২০ ও $১০০ মূল্যমানের নোট। প্রতি একটি $১ বিল ছাপাতে খরচ হয় গড়ে ৭ সেন্ট, আর $১০০ বিল ছাপাতে খরচ হয় প্রায় ১৭ সেন্ট।

কে অনুমতি দেয় ডলার ছাপাতে? এই প্রক্রিয়াটি একটি সমন্বিত কাঠামোর অধীনে কাজ করে:

ক. Federal Reserve System (Fed): প্রতি বছর তারা পর্যালোচনা করে কত মুদ্রা প্রয়োজন। চাহিদা অনুযায়ী তারা Treasury-কে নির্দেশ দেয় টাকা ছাপাতে।

খ. Department of the Treasury (BEP): Fed-এর চাহিদা অনুযায়ী Treasury-এর অধীন BEP মুদ্রা ছাপে। Treasury Secretary অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকেন।

খ. United States Mint:/Treasury-এর নির্দেশেই কয়েন তৈরি করে।

ডলার ছাপানো নিয়ন্ত্রিত, সীমিত এবং অর্থনীতির ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। অত্যধিক অর্থ ছাপানো হলে ঘটে hyperinflation.

Federal Reserve মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে রাখতে:

সুদের হার (interest rate) ঠিক করে। ব্যাংকের রিজার্ভ ও লোন নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজন অনুযায়ী 'Quantitative Easing' বা 'tightening' নীতি অনুসরণ করে।

তাহলে Federal Reserve কী করে?

Fed নিজে টাকা ছাপে না, তারা Treasury থেকে ছাপানো টাকা সংগ্রহ করে। তারপর সেই টাকা বিতরণ করে দেশের ১২টি Regional Federal Reserve Banks-এর মাধ্যমে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে Fed চালায় monetary policy– যেমন: বাজারে টাকা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাস্ফীতি কমানো, কর্মসংস্থান বাড়ানো ইত্যাদি

Fed একটি 'quasi-public' প্রতিষ্ঠান-এর Board of Governors সরকারি, কিন্তু তার কিছু অংশ (যেমন: regional reserve banks) আংশিকভাবে বেসরকারি ব্যাংক মালিকানাধীন। এ বিষয়ে আগের অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এজন্য আর দীর্ঘ করছি না, শুধু প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে এটা আনলাম। গতানুগতিক ইতিহাসে এসব নিয়ে এভাবেই বলা আছে, আপনি অন্তর্জালে অনুসন্ধান করলে, এসব বিষয়ে জানতে চাইলে, ওখানেও এই গতানুগতিক তথ্য আপনাকে দেবে। এবার এর বাইরে থেকে কিছু জানা দরকার।

সিটি অব কলম্বিয়া ও ডলার ছাপা:

বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব, তার রাজনৈতিক শক্তিমত্তা, অর্থনৈতিক আধিপত্য ও সামরিক উপস্থিতি সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি ছোট্ট অঞ্চল, যার নাম- 'The City of Columbia', বা আনুষ্ঠানিকভাবে 'District of Columbia' (D.C.). একটি স্বতন্ত্র ও রহস্যময় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর অংশ, যার ভিতরে লুকানো রয়েছে আধুনিক দুনিয়ার শক্তির কেন্দ্র।

'District of Columbia' (D.C.), অর্থাৎ 'সিটি অব কলম্বিয়া' হলো একটি বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা যা কোনো রাজ্যের অন্তর্গত নয়। এটা ১৮৭১ সালের 'Organic Act' অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে একটি আলাদা কর্পোরেট সত্তা হিসেবে 'The United States Corporation' তৈরি করা হয়। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মূল সংবিধানিক কাঠামো থেকে একপ্রকার বিচ্যুতি ঘটে।

এই অঞ্চলের তিনটি শক্তিশালী প্রতীকী এলাকা: The White House (রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক), The Capitol Building (আইন প্রণয়নের কেন্দ্র) এবং The Federal Reserve Building (অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ).

এই তিনটি কেন্দ্রই 'সিটি অব কলম্বিয়া'-র ভেতরে অবস্থিত এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ নীতিনির্ধারক প্রক্রিয়া এখানে কেন্দ্রীভূত। ফেডারেল রিজার্ভ- ডলার ছাপার ক্ষমতা এই সংস্থার হাতেই। এটা সরকারকে নয়, একটি গোপন মালিকানাধীন প্রাইভেট ব্যাংকিং কনসোর্টিয়ামের আওতায় পরিচালিত। এর বোর্ড সদস্যদের নিয়োগে প্রেসিডেন্ট যুক্ত থাকলেও তাদের কার্যকর ক্ষমতা সীমিত। যদিও আক্ষরিকভাবে ছাপানোর (physical printing) কাজটি করে Bureau of Engraving and Printing (BEP). তবে তা নামকাওয়াস্তে দৃশ্যমান।

প্রক্রিয়া: ফেডারেল রিজার্ভ ডলার ছাপে। তারপর সেই অর্থ সরকারের কাছে ঋণ হিসেবে দেয়। সরকার জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে এই ঋণ শোধ করে সুদ-সহ। নির্বাচিত গোষ্ঠীর হাতে টাকার ছাপার মেশিন থাকলে কী হতে পারে?

কারা নিয়ন্ত্রণ করে ফেডারেল রিজার্ভ?

এই প্রশ্নের উত্তর কখনোই পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। যতই বলা হোক– ফেডারেল রিজার্ভের নিয়ন্ত্রণ কোনো প্রাইভেট ব্যাংক বা গোপন গোষ্ঠীর হাতে নেই। এটা মার্কিন সরকার এবং কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, যা জনস্বার্থে কাজ করে। কিন্তু গবেষকদের মতে, ফেডারেল রিজার্ভ-এর অদৃশ্য মালিকানায় রয়েছে কিছু প্রভাবশালী প্রাইভেট ব্যাংক:

১. Rothschild & Co.

- আন্তর্জাতিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারি ফার্ম।
- প্রতিষ্ঠা: ১৮শ শতকের শেষভাগ, লন্ডন ও প্যারিসে শাখা।
- বর্তমান অবস্থা: সক্রিয়, ইউরোপের অন্যতম প্রভাবশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

২. Lazard (Lazard Frères & Co.)

- ফ্রান্সভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক।
- প্রতিষ্ঠা: ১৮৪৮, প্যারিসে।
- বর্তমান অবস্থা: সক্রিয়, সদর দফতর নিউইয়র্ক, প্যারিস ও লন্ডনে।

৩. Banca Commerciale Italiana (BCI) → Intesa Sanpaolo.

- তবে, এই ব্যাংকে অনেকে ডাকে, 'Israel Moses Seif Bank' নামে। বলা হয়, এটাও রথচাইল্ড ফ্যামিলির শাখা ব্যাংক।
- বর্তমান অবস্থা: এখন Intesa Sanpaolo-এর অংশ।

৪. Kuhn, Loeb & Co.

- নিউইয়র্কভিত্তিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক।
- প্রতিষ্ঠা: ১৮৬৭ সালে জার্মান-ইহুদী অভিবাসী Abraham Kuhn ও Solomon Loeb-কর্তৃক।
- বর্তমান অবস্থা: পরবর্তী সময়ে মিশে নাম বিলুপ্ত হয়েছে (১৯৭৭ সালে Lehman Brothers-এর সাথে মিশে যায়)।

৫. M. M. Warburg & Co.

- হামবুর্গ (জার্মানি)-ভিত্তিক প্রাইভেট ব্যাংক।
- প্রতিষ্ঠা: ১৭৯৮ সালে।
- বর্তমান অবস্থা: সক্রিয়, এখনো জার্মানির প্রাচীনতম প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর একটি।

৬. The Goldman Sachs Group, Inc.

- নিউইয়র্কভিত্তিক বহুজাতিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিস কোম্পানি।

- প্রতিষ্ঠা: ১৮৬৯ সালে Marcus Goldman-কর্তৃক।
- বর্তমান অবস্থা: সক্রিয়, বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রভাবশালী ব্যাংক।

৭. Lehman Brothers.

- নিউইয়র্কভিত্তিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক।
- প্রতিষ্ঠা: ১৮৫০ সালে তিন ভাই (Henry, Emanuel, Mayer Lehman) -কর্তৃক।
- বর্তমান অবস্থা: ২০০৮ সালে দেউলিয়া হয়ে যায়; বর্তমানে তেমন সক্রিয় নয়, তবে বিশ্ব ব্যাংক ব্যবস্থা কার্যক্রমে ব্যাপক সক্রিয়।

বলা হয়ে থাকে– এসব ব্যাংকের পেছনে রয়েছে, গুপ্ত সংঘ ও বিশ্বব্যাপী শক্তি কাঠামোর ছায়া, যারা বিশ্ব-অর্থনীতির ধারা নিয়ন্ত্রণ করে।

সিটি অব কলম্বিয়া: একটি রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র?

সিটি অব কলম্বিয়া-কে অনেক বিশ্লেষক "A State Within a State" বা "The Invisible Empire" বলে অভিহিত করেছেন। এটা আমেরিকান কোনো রাজ্যের অংশ নয়। নিজস্ব পতাকা, সিল ও শাসন কাঠামো রয়েছে। কনস্টিটিউশনাল ইউনাইটেড স্টেটস-এর বাইরের এক কর্পোরেট একক।

ইংল্যান্ডের 'City of London' এবং ভ্যাটিকানের 'Vatican City'-র মতো একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক শক্তি কেন্দ্র, যা বৃহৎ আন্তর্জাতিক চুক্তি, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক নীতিমালা ও মিডিয়া পরিচালনায় ভূমিকা রাখে।

সিটি অব কলম্বিয়া ও ফেডারেল রিজার্ভকে বুঝতে পারা মানে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে অনুধাবন করা। এটাই সেই পর্দার আড়ালের 'রাজনীতি', যেখানে একরকম আধিপত্য চলে তথ্য, ঋণ ও প্রচারের ওপর ভিত্তি করে। যে মুহূর্তে মানুষ এসব গোপন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা জানতে শুরু করে, সে মুহূর্ত থেকেই সত্যিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ঘটে।

City of London- বিশ্ব-অর্থনীতির এক অলক্ষ্য অধিপতি:

লন্ডনের ভেতরে মাত্র ১.১২ বর্গমাইলের একটি ছোট্ট এলাকা, যার নাম 'City of London.' এটা পুরো ব্রিটেন থেকে আলাদা একটি সত্তা, যার নিজস্ব লর্ড মেয়র

আছে, নিজস্ব আইন, নিজস্ব পুলিশ বাহিনী, এমনকি রাজপরিবার ও রানির প্রবেশও হতো বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে।

এখানেই আছে; বিশ্বের প্রায় সব প্রধান আন্তর্জাতিক ব্যাংকের সদর দপ্তর বা গুরুত্বপূর্ণ শাখা, রথচাইল্ডদের পুরনো ব্যাংকিং ঘাঁটি, লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড।

বিশ্বের স্বর্ণ বাণিজ্য, তেল, বন্ড মার্কেট ও যুদ্ধকালীন অর্থায়নের বড় অংশ নিয়ন্ত্রিত হয় এই শহর থেকে। এখানে করপোরেট গোপনতা এতটাই বেশি যে, বহু বহুজাতিক কোম্পানির মালিকানার প্রকৃত রূপ জনসাধারণের কাছে অজানা।

City of Columbia এবং City of London– উভয়েই রাষ্ট্রের ভিতরের রাষ্ট্র, যাদের কার্যক্রম স্বচ্ছ নয় এবং অনেকাংশে জনগণের প্রতিনিয়ন্ত্রণের বাইরে। এদের হাতে পৃথিবীর অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি যুদ্ধ ও শান্তির নীতি নির্ধারিত হয়।

একটি কর্পোরেশন, একটি আত্মা

আজ যে 'ক্রাউন কর্পোরেশন' তিনটি দেশে তিনটি শহরকে কেন্দ্র করে চলাচ্ছে, তাদের সাংবাদিকতা, সিনেমা, ব্যাংকিং, ধর্ম, প্রযুক্তি– সবকিছুর নেপথ্যে রয়েছে সেই ব্যাবিলনের কালো-শিক্ষা। হারুত-মারুতের 'পরীক্ষা' এখন গোটা মানবজাতির জন্য একটি রক্তাক্ত বাস্তবতা।

তাদের পেছনের আদর্শ– "Control the money, control the mind." তাদের প্রতীক– চোখ, ত্রিভুজ, পিরামিড, সাপ, সূর্য। তাদের ভাষা– সাইমবোল, সংকেত ও জাদু। যে ব্যাবিলন একসময় ধ্বংস হয়েছিল আগুনে, আজ কি সে ফিরে এসেছে ব্যাংকের অন্দরমহল, ধর্মগৃহের লুকায়িত দলিলে, আর যুদ্ধের ছায়া বাজেটে?

আমাদের সামনে প্রশ্ন মাত্র এই: আমরা কি বুঝতে পেরেছি, আসলে কারা আমাদের চালায়? না কি এখনও আমরা মঞ্চ দেখছি, অথচ বুঝতে পারিনি কারা পেছনে বসে নাটক লেখে?

ব্যাবিলন: একটি হারানো রাজ্য, একটি জীবন্ত আত্মা

আমরা ফিরে যাই আরও প্রাচীন এক ইতিহাসে– ব্যাবিলন।

সুমের-আক্কাদীয় উত্তরসূরি এক সভ্যতা, যার নামই এখন *জাদু*, *নির্মমতা* ও *জ্ঞান*– এই তিনের প্রতীকে পরিণত। ব্যাবিলন শুধু একটি শহর ছিল না, ছিল একটি প্রোগ্রাম। তথ্য, ক্ষমতা, ও নিয়ন্ত্রণের প্রথম প্রকৌশল শুরু হয়েছিল এখানেই।

এখানেই দেখা মেলে কোরআনের উল্লেখিত দুই রহস্যময় ফেরেশতা– হারুত ও মারুত। সূরা বাকারা, আয়াত ১০২-এ এসেছে:

"...তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা ও বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত... তারা বলত: 'আমরা কেবল পরীক্ষার জন্য; তুমি কাফের হয়ো না।'"

জাদুবিদ্যার উৎস এই ব্যাবিলনই। এখানেই মানুষ প্রথমবার জাদুর মাধ্যমে মানব-সম্পর্কের বিনাশ, আত্মা-বিক্রয় এবং অন্তর্জগত নিয়ন্ত্রণের কৌশল শেখে। এখানেই শুরু হয় 'আকৃতি নিয়ন্ত্রণ', 'সিম্বল ম্যানিপুলেশন', 'মানসিক দাসত্বের' কালো শিল্প।

সুলাইমান (আ.), জাদু, ও হারুত-মারুতের রহস্য:

"সুলাইমান কুফরি করেননি; শয়তানরাই কুফরি করেছিল।"[১]

এই একটি বাক্য যেন ইতিহাস, ধর্ম, জাদুবিদ্যা এবং এক বৈপ্লবিক অপবাদ মুছে ফেলার ঘোষণা। কিন্তু কী সেই অপবাদ? কেন আল্লাহকে জোর দিয়ে বলতে হলো যে, সুলাইমান (আ.) জাদুবিদ্যা বা শিরকের সাথে যুক্ত ছিলেন না?

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্যে, ইসলামী তাফসিরে এবং তার পেছনে লুকিয়ে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনিতে– হারুত ও মারুত নামক দুই ফেরেশতার কাহিনিতে, যা শুরু হয়েছিল ব্যাবিলনের ধ্বংসপ্রাপ্ত মাটিতে।

ইহুদী অপবাদ ও ইসলামের সংশোধন

ইহুদী কাবালিস্ট ও তালমুদের নির্দিষ্ট কিছু ব্যাখ্যায় দাবী করা হয়, সুলাইমান (আ.) বিশেষ এক 'জাদুবিদ্যা' চর্চার মাধ্যমে দৈত্য (জ্বিন) ও ফেরেশতাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি নাকি এমন এক আংটির মালিক ছিলেন, যার মাধ্যমে জ্বিনদের দিয়ে কাজ করাতেন, ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং এমনকি দানবদের বন্দী করে রাখতেন। এই আংটি ছিল এক ধরনের সিগিল বা প্রতীক-চিহ্ন সম্বলিত, যা আজকের দিনে 'Seal of Solomon' নামে পরিচিত– কাব্বালাহ, ফ্রিমেসন ও ইলুমিনাতির প্রতীকে পরিণত।

কিন্তু ইসলামী তাফসির, বিশেষ করে ইবনে কাসির এই অপবাদকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর তাফসিরে বলা হয়েছে–

সুলাইমান (আ.) কখনও জাদুবিদ্যার আশ্রয় নেননি। তাঁর মৃত্যুর পর শয়তানরা মানুষকে ভুল পথে চালনা করার জন্য জাদুবিদ্যার পুরনো বইগুলো রাজপ্রাসাদের নিচে পুঁতে রেখে দিত। আর মানুষ সেটা খুঁজে পেয়ে বলতে লাগল, 'এগুলোই তো সুলাইমানের গুপ্ত বিদ্যা!' এভাবেই অপবাদ তৈরি হয়। আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে সেই অপবাদ খণ্ডন করেন।

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১০২

সুলাইমান (আ.) ও 'Seal of Solomon'

ইহুদী উপকথা ও ফ্রিমেসনিক বিশ্বাসে সুলাইমান (আ.) ছিলেন জাদুবিদ্যার 'আদর্শ' ব্যক্তি। তিনি নাকি 'সিল অফ সোলোমন' নামে এক রহস্যময় আংটির অধিকারী ছিলেন, যা দিয়ে জ্বিন, ফেরেশতা, পশু-পাখি ও দানবদের নিয়ন্ত্রণ করতেন।

এই প্রতীকটি– একটি ছয় কোণ বিশিষ্ট তারকা (✡)– আজ ডেভিডের তারকা নামে ইসরায়েলের জাতীয় প্রতীকও হয়ে গেছে। এই Seal পরবর্তীতে জাদুবিদ্যার চিহ্ন, অকল্ট সিম্বল, এমনকি ইলুমিনাতির গোপন বাহ্যিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

ডেভিড কে? দাউদ (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবী ও রসূল, যিনি একাধারে রাজা এবং ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে আসমানী কিতাব যাবুর প্রদান করেছিলেন, যাতে প্রায় ১৫০ পঙ্‌ক্তি ছিল। কোনো বিধান ছিল না, শুধু সঙ্গীতের মতো শ্লোক। তিনি সুমধুর কণ্ঠে আল্লাহর প্রশংসা করতেন; পাহাড় ও পাখিরাও তাঁর তাসবিহে সাড়া দিত। তরুণ বয়সে তিনি জালুতকে (Goliath) হত্যা করে ইসরায়েলীদের নেতা হয়ে ওঠেন।

কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব, জ্ঞান এবং খলীফাতুল আরজের (পৃথিবীতে প্রতিনিধি) মর্যাদা দান করেছিলেন। জেরুজালেম শহরতলীতে তাঁর একটি মাজার রয়েছে, যেখানে নীল গিলাফে ঢাকা প্রায় ১৮ ফুট দীর্ঘ কবর বিদ্যমান। মাজারের গেটে লেখা আছে 'King Saint David'. বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের নিচে রয়েছে তাঁর পুত্র নবী সুলাইমান (আ.)-এর সমাধি। ইসলামে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, আল্লাহপ্রদত্ত কিতাবের বাহক এবং মানবজাতির জন্য আদর্শ নবী।

কোরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ দাউদকে বাদশাহী ও নবুয়্যত দান করলেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তা শিক্ষা দিলেন।"[১]

"হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। সুতরাং মানুষের মাঝে সত্যের ভিত্তিতে বিচার করুন।"[২]

"আমি দাউদ ও সুলাইমানকে রাজত্ব ও জ্ঞান দান করেছি।"[৩]

---

১. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫১

২. সূরা সাদ, আয়াত ২৬

৩. সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৭৯

দাউদ (আ.) তথা ডেভিড ইহুদীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই বিস্তৃত করেছিল তাদের রাজত্ব। 'ডেভিডের নক্ষত্র' বা Magen David মানে হলো দাউদের ঢাল। কিংবদন্তি মতে, নবী দাউদ (আ.) যুদ্ধের সময় তাঁর ঢালে এ প্রতীক খোদাই করেছিলেন, যাতে আল্লাহর সাহায্য তাঁকে রক্ষা করে। তবে এ দাবীর কোনো প্রমাণ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে (তাওরাত, ইঞ্জিল বা কোরআন) নেই।

এটা দুটি সমবাহু ত্রিভুজ একে অপরের উপর বসানো– একটি নিচের দিকে, একটি ওপরে। দেখতে ষড়ভুজ তারকা (Hexagram)। প্রাচীন ভারতে, মিশর ও আরবদের মাঝেও এ ধরনের ষড়ভুজ প্রতীক তাবিজ, জাদু বা আধ্যাত্মিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী থেকে ইহুদীরা এ প্রতীক ধীরে ধীরে ব্যবহার শুরু করে। প্রাথমিকভাবে এটা কাব্বালা (ইহুদী রহস্যবাদ) ও জাদুবিদ্যায় ব্যবহৃত হতো। মধ্যযুগে ইউরোপের ইহুদীরা এটা তাদের পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে।

১৪শ শতকে প্রাগ (বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্র) শহরের ইহুদীরা প্রথম এটাকে সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে। ধীরে ধীরে 'ডেভিডের নক্ষত্র' ইহুদী পরিচয়ের সর্বজনীন প্রতীক হয়ে ওঠে।

১৯শ শতকে জায়োনিস্ট আন্দোলন (Zionism) ইহুদীদের একটি জাতীয় প্রতীক খুঁজতে থাকে। তারা 'Star of David' গ্রহণ করে, কারণ এটা ছিল সহজে চেনার মতো প্রতীক। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, পতাকায় এটাই রাখা হয়।

পতাকার পটভূমি সাদা, যার মাঝে দুটি নীল রেখা। মাঝখানে নীল রঙের 'Star of David'. নীল রেখাগুলো প্রতীকীভাবে 'তালিত' (ইহুদীদের প্রার্থনার কাপড়)-এর প্রতীক। ইসলামে নবী দাউদ (আ.)-এর সাথে এ প্রতীকের কোনো সম্পর্ক নেই। কোরআন বা হাদিসে এর উল্লেখ নেই। এটা ইহুদীদের পরবর্তী যুগে তৈরি করা প্রতীক, যা কাব্বালিস্টিক রহস্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের সাথে জড়িত।

এজন্যই কিং ডেভিড বা নবী দাউদ (আ.) তাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। খুব সংক্ষেপে বললাম। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিশদ পর্যালোচনা দরকার। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমরা মূল বিষয়ে এগিয়ে যাই।

কোরআন কখনোই এইসব বিষয় সুলাইমান (আ.)-এর কাজে ব্যবহার হতো বলে স্বীকার করেনি। কোরআন তাঁর মেধা, দোয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া ক্ষমতাই তাঁর মূল শক্তি ছিল। যাকে বলা হয়– মোজেজা।

তবে কেন এখনও জাদুবিদ্যার বইয়ে 'সুলাইমানী জাদু' লেখা থাকে?

কারণ: শয়তানদের তৈরি করা সেই অপবাদের সিলসিলা আজও শেষ হয়নি। সুলাইমান (আ.) আজও ব্যবহৃত হচ্ছেন সেইসব 'কালো-শিল্প', 'তাবিজ-কবচ', 'তন্ত্র-মন্ত্র', 'ডার্ক-ম্যাজিক'-এর নাম বিক্রি করে আসা একটি তন্ত্র-মার্কেটিং এর প্রতীক হিসেবে।

হারুত ও মারুত: ফেরেশতা না কি শিক্ষা পরীক্ষার প্রতীক?

কোরআনের দ্বিতীয় সূরা বাকারা, আয়াত ১০২-এ হারুত ও মারুতের উল্লেখ রয়েছে। তবে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তাই ব্যাখ্যা জানতে আমরা যেতে বাধ্য হই ইসলামী তাফসির ও ইহুদী-মিশ্র কাহিনির দিকে। বলে রাখা ভালো, এই কাহিনি কোরআনে নেই, আবার সহীহ হাদীসেও নেই। তবে, কিছু দুর্বল হাদীসে পাওয়া যায়। যা সমস্যাযুক্ত। ইবনে কাসিরে আছে, ইহুদী কিতাবে আছে। কিছু খ্রিষ্ট কিতাবেও পাওয়া যায়। সবকিছুর সংমিশ্রণ করা হলো। এই বর্ণনা নিয়ে আমি নিজেই সন্দিহান। তাই এটাকে ওভাবে বিশ্বাস না করাটাই শ্রেয়। আমি এ বিষয়ে সঠিক তথ্য খুঁজে পাইনি। সূরা বাকারাহতে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। এজন্য এই গল্পকে উপকথা বা রূপকথার গল্পই বলা যেতে পারে। এই বিষয়টা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও, এটা আনার কারণ হলো, বর্তমান গুপ্ত সংঘ, শয়তান উপাসকদের কল্পিত ধারণা বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করা।

ইবনে কাসির (রহ.)-এর তাফসির অনুসারে

আদম (আ.) ও তার সন্তানরা যখন পৃথিবীতে পাপ করতে লাগল, ফেরেশতারা তখন আল্লাহর দরবারে 'অসন্তোষ' প্রকাশ করেন। তারা বলেন, "আমরা হলে তো এত পাপ করতাম না।"

আল্লাহ তখন বলেন, "আচ্ছা, তোমাদের মধ্য থেকে দুজনকে আমি পৃথিবীতে পাঠাই। তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সঞ্চার করব। দেখব তারা কতটা সংযম রাখতে পারে।"

এই পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন হারুত ও মারুত। তারা পৃথিবীতে এসে ন্যায়বিচার করতে থাকেন। কিন্তু একদিন তাদের সামনে আসে এক রহস্যময় নারী– জোহরা (কখনো বলা হয় সে ছিল এক অপ্সরা বা পার্সিক দেবী)। সে তাদের প্রলোভন দেয়– ব্যভিচার, মদ্যপান ও শিরকের। প্রথমে তারা অস্বীকার করে। পরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

জোহরা, ফেরেশতা ও শুকতারা

তারা ফেরেশতা। স্বর্গীয় সত্তা। পবিত্র, নিষ্পাপ, ঈশ্বরের সরাসরি আদেশপ্রাপ্ত। কিন্তু সেই ফেরেশতা দুইজন যখন মানুষরূপে পৃথিবীতে নামেন, তারা ভুল করে ফেলেন।

নাম তাদের হারুত ও মারুত। স্থান: ব্যাবিলন, ইতিহাসের প্রাচীনতম এবং জাদুবিদ্যায় অভিষিক্ত এক নগর। যুগটি ছিল ইদ্রিস (আ.)-এর সময়কার। মানুষ তখন ঈশ্বরের নির্দেশের বাইরে পা বাড়াতে শুরু করেছে। ফেরেশতারা তখন উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, "এই মানুষ নামের সৃষ্টিটা কত অপূর্ণ! এরা পাপ করে, সীমা লঙ্ঘন করে, ঈশ্বরের অবাধ্য হয়। আমাদের জায়গায় থাকলে আমরা কখনও এমন করতাম না।"

ঈশ্বর তখন বলেন, "তবে ভালো, আমি তোমাদের মধ্য থেকে দুজনকে পাঠাচ্ছি পৃথিবীতে, তবে মানবীয় প্রবৃত্তি-সহ। দেখা যাক, তোমরা কী করো!"

নির্বাচিত হলেন হারুত ও মারুত। পৃথিবীতে নেমে তারা ন্যায়বিচার করতে লাগলেন। বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষ তাদের কাছে আসত, তারা ফয়সালা দিতেন। তবে, প্রতি সন্ধ্যায় তারা ইসমে আজম (ঈশ্বরের গোপন পবিত্র নাম) উচ্চারণ করে ফিরে যেতেন আকাশে। এভাবেই দিন চলছিল.... যতক্ষণ না এক নারী প্রবেশ করল তাদের জীবনে।

জোহরা ছিল অতিপ্রাকৃত সুন্দরী, স্বর্গীয়রূপে মণ্ডিত। কেউ বলে তার নাম জোহরা, কেউ যাহরা, আর পার্সিক ঐতিহ্যে সে আনাহীদ। জোহরা তার স্বামীর নামে বিচার দিতে আসে, হারুত-মারুত তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়। জোহরার সাথে ব্যভিচারের ইচ্ছে প্রকাশ করে। জোহরা রাজি হয় না। বলে, "তোমরা আমার দেব-দেবীকে মানলে আমি রাজি হব।" [তাফসিরে ইবনে কাসিরের (তাফসির পাবলিকেশন কমিটি প্রকাশনী, ড. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত) বাংলা অনুবাদ প্রথম খণ্ডের ৩৩৮ নং পৃষ্ঠায় এটা উল্লেখ আছে]।

হারুত-মারুত রাজি হয় না এই প্রস্তাবে। শিরক করতে পারবে না বলে দেয়।

জোহরা বলে, "আমি চাই তোমরা আমার ইচ্ছা পূরণ করো। আর তার আগে প্রমাণ দাও– তোমরা আমায় সত্যিই চাও।"

এরপর জোহরা বলে, "এই শিশুটিকে হত্যা করো।"

তারা তাও প্রত্যাখ্যান করে।

সে আবার আসে মদ নিয়ে। বলে, "এটা তো ছোট পাপ। এটা তো করতেই পারো। নাও মদ পান করো।"

তারা ভাবে, এ-তো সামান্যই। তারা সেই নেশাযুক্ত মদ পান করে ফেলে... কিন্তু এরপর ঘটে বিপর্যয়!

মদের নেশায় তারা নিজেরাই হারিয়ে ফেলেন নিয়ন্ত্রণ। জাদু দেবতাদের প্রণিপাত, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তারা সেই শিশুটিকেও হত্যা করে, ব্যভিচারও ঘটে যায় জোহরার সাথে। হুঁশ ফিরতেই তারা অনুতপ্ত। ঈশ্বর তাদের সামনে পছন্দের সুযোগ দেন– এই দুনিয়ায় শাস্তি গ্রহণ করবে, না কি পরকালে? তারা দুনিয়াকেই বেছে নেয়।

ফলে তাদের শাস্তি হয়– ব্যাবিলনের এক অন্ধকার কূপে কেয়ামত পর্যন্ত উলটো ঝুলিয়ে রাখা।

এই কাহিনির অন্য এক বর্ণনায়, জোহরা ফেরেশতাদের মুগ্ধতা কাজে লাগিয়ে চায়, তারা যেন তাকে ইসমে আজম শিক্ষা দেয়। তারা তাকে শেখায়, কীভাবে উচ্চারণ করে আকাশে যাওয়া যায়। সে উঠে যায়... কিন্তু ভুলে যায় কীভাবে ফিরে আসতে হয়। সে আর ফিরে আসে না। তার শরীর রূপান্তরিত হয় এক উজ্জ্বল গ্রহে– শুকতারা। আরবিতে, যাকে ডাকা হয় 'আন-নাজমুছ-যোহরা'।

বিশেষ সতর্কতা

এই কাহিনিগুলো সরাসরি কোরআনে বিস্তারিত নেই। ইসলামী তাফসির (বিশেষত ইবনে কাসির) ও ইসরায়েলী কাহিনি থেকে এসব এসেছে বলে মনে করা হয়। সহীহ হাদিস নয়– ইসরায়েলী রেওয়ায়েত, যা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী "না মানা, না অস্বীকার" করা আমাদের জন্য অনুমোদিত। তাই সেভাবেই গ্রহণ করবেন। এই কাহিনি অবতারণার বিশেষ কারণ আছে। অপ্রয়োজনীয় হলে সংযোজন করতাম না। কেন প্রয়োজন? তা সামনে গেলেই জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

এই কাহিনির নানা সংস্করণ আছে ইহুদী মিদ্রাশ, তালমুদ এবং পার্সিক ধর্মবিশ্বাস-এ। কিন্তু কোরআন এইসব কাহিনিকে একমাত্র পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে। এবং এক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা জানিয়ে দেয়:

"তারা বলত, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কুফরি করো না।"[১]

আল-কালবির বিবরণে দেখা যায়, আসলে তিনজন ফেরেশতাকে বাছাই করা হয়েছিল। তারা ছিলেন ফেরেশতা আয, আযাবি এবং আযাইল। এর মাঝে যখন আযাইল নিজের মাঝে কামনা অনুভব করেন তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে তুলে নিতে বলেন, তাকে তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু বাকি দুজন কামনা চরিতার্থ করেন, তখন আল্লাহ তাদের নাম পরিবর্তন করে হারুত ও মারুত করে দেন যথাক্রমে।

কাতাদার ভাষ্যে জানা যায়, একমাস লেগেছিল ফেরেশতা দুজনের অবাধ্য হতে। আর অন্য এক বিবরণে শোনা যায়, জোহরা আসলে যেন-তেন মহিলা ছিলেন না, পারস্যের রানি ছিলেন। আরেক ইহুদী বিবরণে জানা যায়, ফেরেশতা দুজনের আগের নাম ছিল শামহাজাই এবং আযাইল। আর জোহরার নাম সেখানে এস্থার। ইহুদী মিদ্রাশের অন্য বিবরণে এ-ও জানা যায়, এস্থার বা জোহরা আসলে ব্যভিচারে জড়িত হয়নি, তার ইচ্ছে ছিল কেবল স্রষ্টার পবিত্র নাম জানা, যেন সে স্রষ্টার নৈকট্য পেতে পারে। সে নাম জপ করবার পর যখন জোহরা স্বর্গারোহণ করল, তখন স্রষ্টা নিজে খুশি হয়ে তাকে কিমাহ্ নক্ষত্রমালায় স্থান দেন।

তৎকালীন আরবে জোহরার শুকতারা হয়ে যাবার কাহিনি প্রচলিত ছিল। হারুত-মারুতের ঘটনা বংশের পর বংশ ধরে চলে আসে। যাদের হাতে ছিল জাদুর মতো অলৌকিক ক্ষমতা, একটা সময় পর যে তাদেরকে পুজো শুরু করে দিবে তখনকার মানুষ, সে কী আর বলতে! সত্যি সত্যি এক সময় তারা উপাস্যে পরিণত হন; না, এটা কোনো ইহুদী, খ্রিষ্টীয় বা ইসলামীক বই থেকে বলা হচ্ছে না, খোদ ইতিহাস থেকে বলা হচ্ছে।

যেমন: আর্মেনিয়াতে হারুত আর মারুত নামের দুই মূর্তির পূজা করা হতো। তারা ছিল আমিনাবেগ এবং আরারাত পর্বতের দেবী আসপারদারামলতের (Aspandaramlt) দুই উপদেবতা। ইরানেও (অর্থাৎ, পারস্যে) এই দেবীর পূজা হতো। আর্মেনিয়ানরা তাকে দ্রাক্ষাক্ষেতের দেবী মানলেও ইরানে অর্থাৎ পারস্যের জরাথুষ্ট্রর ধর্মে আসপারদারামলত আসলে একেবারে পৃথিবীর আত্মা। হোরোত আর

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১০২

মোরোত (হারুত-মারুত) তার দুই সহকারী। তারা বাতাস আর বৃষ্টি আনত বলে বিশ্বাস করা হতো। আরারাত পর্বতের চূড়ায় তাদের বাস। মজার ব্যাপার, আরও ঘাঁটলে আমরা জানতে পারি, জোহরার হিব্রু নাম ইস্থার। যাকে ব্যাবিলন আর সিরিয়ায় কামের দেবী এবং জন্মের দেবী হিসেবে উপাসনা করা হতো। গিলগামেশ আর ইস্থারের এক করুণ প্রেম-কাহিনি আমরা সেখানে পাই, তবে সেটা ভিন্ন আলাপ, এটা এখানে বলার দরকার নেই।

জরাথুষ্ট্রর পার্সিক ধর্মে আমরা আভেস্তা ভাষায় 'হাওরভাতাত' (Haurvatat) নাম পাই, যার সাথে পানি, উন্নতি আর স্বাস্থ্যের সম্পর্ক ছিল। হাওরভাতাত নারী না পুরুষ সে বিষয়ে আছে বিতর্ক। তবে, তার সাথে গ্রিক ধনের দেবতা প্লুটাসের মিল পাওয়া যায়। আবার আরেকটি নাম পাওয়া যায় যেটা হলো 'আমেরাতাত' (Ameretat)। আমেরাতাতের সাথে জড়িত ছিল ইহকাল আর পরকালের আয়ু আর সমৃদ্ধি।

প্রশ্ন আসতে পারে, একটা বিষয়ে আলোকপাত করার পর্যায়ে কেন এই দুটি নাম আসলো? ইতিহাস এখানেই শেষ না। ইসলাম আবির্ভাবের প্রায় ৬০০ বছর আগে থেকে ইরানে বা পারস্যের একটি অঞ্চলে সগদিয়ান ভাষায় কথা বলা হতো, বর্তমানে সেটা উজবেকিস্তান আর তাজিকিস্তান, সমরকন্দ যার রাজধানী। সে ভাষায় আমরা দেখতে পাই, হাওরভাতাত আর আমেরাতাত এর উচ্চারণ হারুত আর মারুত। হতে কি পারে না তারা একই? হারুত-মারুতের নাম শুধু এ ভাষায় না, ইরানের নানা উপভাষাতেও প্রচলিত হয়ে যায়। এমনকি তারা এক জাতের ফুলের নামও রাখে হারুত-মারুত।

আবু দাউদ শরীফের ৪৯০ নং হাদীসে এসেছে, একবার আলী (রা.) বাবেলের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আসরের নামাজের সময় হয়ে গেলেও তিনি সেখানে নামাজ পড়লেন না। একেবারে বাবেল (ব্যাবিলন) সীমান্ত পার হয়ে যাবার পর নামাজ পড়লেন। এরপর বললেন, "রাসূল (সা.) আমাকে কবরস্থানে নামাজ পড়তে মানা করেছেন, আর বাবেলের ভূমিতে নামাজ পড়তে মানা করেছেন। কারণ; বাবেল অভিশপ্ত ভূমি (সেই কুফরি বা জাদু চর্চার কারণে)।"

তবে, 'ফলেন অ্যাঞ্জেল' ধারণা কিংবা ফেরেশতার অবাধ্যতার ধারণা ইসলামে অনুপস্থিত থাকায় এসব ইহুদী উপকথা মিথ্যা বলে মেনে নেন আধুনিককালের ইসলামী আলেমগণ। ইমাম কুরতুবিরও তাই মতামত। কারণ; কোরআন বলছে,

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে।” (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ৬) “তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে।[১]

ইমাম তাবারি আর ইবনে জারির মনে করেন, হারুত-মারুত আসলে ফেরেশতা ছিলেন না, মানুষই ছিলেন, তাদেরকে ফেরেশতা মনে করা হতো। বর্তমানে ইসলামে যে ফতোয়া এ বিষয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা সৌদি ফতোয়া কাউন্সিলের শেখ সালিহ আল ফাওজানের, “হারুত ও মারুত ফেরেশতাই ছিলেন, কিন্তু তারা কখনোই অবাধ্যতা করেননি। তাদের আল্লাহ কেবল পাঠিয়েছিলেন মানুষের পরীক্ষা নেবার জন্য। তারা যে জাদুবিদ্যা শেখাবার কথা বলতেন, সাথে সতর্কবাণীও দিতেন। আল্লাহর হক বান্দাগণ সে সতর্কবাণী মেনে জাদু শিখবে না, কিন্তু নাফরমানি যারা করতে চায় তারা শিখবে। এটা ছিল ছিল সে পরীক্ষা। আর কিছুই নয়।”

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) আকাশে শুকতারা দেখলেই প্রচলিত ইহুদী কাহিনিটি স্মরণ করে অভিশাপ দিতেন বলে ইবনে কাসিরের তাফসিরে উল্লেখ আছে। ইসলামে সরাসরি হারুত আর মারুত নিয়ে কিছু উল্লেখ না থাকলেও ইহুদী উপকথার মিশেল সহস্রাব্দেরও বেশি সময় জুড়ে কাহিনির যোগান দিয়ে এসেছে মুসলিম বিশ্বে।

এতে স্পষ্ট হয় যে, হারুত-মারুত মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা ছিলেন না বা ফেরেশতা হলেও কখনোই অবাধ্যতা করেননি। তারা আল্লাহর আদেশ পালনকারী ছিলেন এবং মানুষের পরীক্ষা নিতে পাঠানো হয়েছিল। ইসলামী প্রধান মুফাচ্ছিরগণ যেমন: ইমাম কুরতুবি, তাবারি, ইবনে জারির ও আধুনিক আলেমগণ এই ইহুদী কাহিনির অতিরঞ্জিত দিকগুলো থেকে আলাদা মত পোষণ করেছেন। সৌদি ফতোয়া কাউন্সিলের শেখ সালিহ আল ফাওজানের মত অনুযায়ী, হারুত-মারুতের জাদুবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া ও সতর্কতা দেওয়ার মধ্যেই মানুষের পরীক্ষা নিহিত ছিল। যারা ইচ্ছা করত, তারা শিখত, আর যারা না চেয়েছিল তারা বিরত থাকত। এছাড়া, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.)-এর আকাশে শুকতারা দেখলে ইহুদী কাহিনির স্মরণ করায় মুসলিম সমাজে হারুত-মারুত সংক্রান্ত লোকশ্রুতি আজও প্রচলিত। তথা, এটা বাস্তবতার চেয়ে বেশি শ্রুতিকার্কশ্য লোকশ্রুতি হিসেবে ছড়িয়ে গেছে।

---

১. সূরা আম্বিয়া,আয়াত ২৭

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া তথা ব্যাবিলন সভ্যতা ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিশ্বসভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আখেমেনিড সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কিরোস মহান (সিরাস II) থেকে শুরু করে এই অঞ্চল বিভিন্ন সময় ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

প্রায় ৩৭০০ বছর পূর্বে ব্যাবিলনের উন্নত নগর ও সভ্যতার কথা মেশানো আছে প্রাচীন বিভিন্ন উৎসে, বিশেষ করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ব্যাবিলনীয় গণিত ফলক ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে। ব্যাবিলনে ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক জ্ঞান ছিল এবং তারা বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথ নির্ণয় করত। আখেমেনিড সাম্রাজ্যের অধীনে ব্যাবিলন গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক কেন্দ্র ছিল। কিরোস মহান তার সাম্রাজ্যের মাধ্যমে একটি বহুজাতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা ধারা, পারস্য, মিডিয়া, ব্যাবিলন-সহ বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি মানবিক নীতিতে কাজ করে তাদের তাদের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দেন এবং তাদের নিজস্ব ধর্মাবলম্বন ও পুনর্নির্মাণে উৎসাহ দেন।

ইহুদী ধর্মীয়গ্রন্থ ও বিভিন্ন তাফসিরে হারুত-মারুত নামে দুই ফেরেশতা বা মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ব্যাবিলনে জাদুবিদ্যা শেখানোর দায়ে পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পার্সিক ও আর্মেনিয়ীয় পৌরাণিক কাহিনিতেও হারুত-মারুত নামের দেবদূত বা দেবতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা বৃষ্টি ও বাতাসের দাতা হিসেবে গণ্য ছিল।